প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

৬/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, শিক্ষক সমবায় প্রতিষ্ঠান হইতে
শ্রীহৃষীকেশ বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৮৬।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
রোড, কলিকাতা-৪, শ্রীসুরেন্দ্র প্রেসের পক্ষ হইতে
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সর্বজনবরেণ্য মনীষী

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

মহোদয়ের করকমলে সশ্রদ্ধ নিবেদন

। পরিচয় ।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় এম. এ প্রণীত "রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ" নামে গ্রন্থখানি দেখবার সুযোগ পেলাম। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিত্যনূতন বই প্রকাশিত হচ্ছে, বিশেষত এ বছরটায়। সে-সব গ্রন্থের অধিকাংশই ছাত্রবন্ধু, অর্থাৎ পরীক্ষা-বৈতরণী পার করাবার খেয়া-নৌকা মাত্র। আর এক শ্রেণীর বই লিখিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য বুঝে ওঠা সহজ নয়, না আছে তাতে চিন্তা বা অধ্যয়নের পরিচয় বা না আছে বিশেষ কিছু বক্তব্যের চিহ্ন। সুখময়বাবুর বই এ দুই শ্রেণীর কোনটার অন্তর্গত নয়। চিন্তার ধীরতা আর অধ্যয়নের গভীরতা দুই-ই আছে বইখানায়—আর সেই জন্যই লেখকের বক্তব্যও প্রকট হতে পেরেছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো' বন্ধটি বোধকরি এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কেন না এই দুইজন সাহিত্যিকের মধ্যে ল থাকা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত বিষয়টি আলোচিত হয় নি। লেখক এ দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বিষয়টির বিশদতর আলোচনা পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। সমালোচনা-গ্রন্থের সমালোচনা লেখা এ রচনার উদ্দেশ্য নয়—বইখানার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে এই পরিচয়-লিপি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

॥ গ্রন্থকারের নিবেদন ॥

এই বইটির মধ্যে যে প্রবন্ধগুলি আছে, তাদের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন কতকগুলি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের নিয়ে ইতিপূর্বে হয় কোন আলোচনা হয় নি, অথবা হলেও সে বিষয়ে আরও অনেক বলবার কথা আছে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বিসর্জন', 'রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো', 'লিপিকা' ও 'পঞ্চভূত' —এই চারটি প্রবন্ধ এই বছরেই লেখা। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি আগে বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছিল—কিন্তু বর্তমান বইয়ে স্থান দেবার আগে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার-সাধন করা হয়েছে।

প্রবন্ধগুলির আয়তনের অসমতা সকলেরই চোখে পড়বে। 'পঞ্চভূত' সংক্রান্ত প্রবন্ধটির আয়তন ৬৪ পৃষ্ঠা, আবার 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি মাত্র ৫ পৃষ্ঠাতেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমার নিজস্ব বক্তব্য যতটুকু আছে, ঠিক ততটুকুই এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি। সেই বক্তব্যের নিবেদন যে আয়তনের মধ্যে শেষ হয়েছে, প্রবন্ধেরও সেইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনেছি। তার ফলে কতকগুলি প্রবন্ধ বৃহদায়তন হয়েছে, আবার কতকগুলি প্রবন্ধ আয়তনে ছোট হয়ে পড়েছে। ছোট প্রবন্ধগুলিকে বড় করতে হলে হয় ভাষাকে ফেনিয়ে তুলতে হ'ত, না হয় পূর্ববর্তী সমালোচকদের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে পৃষ্ঠাগুলি ভর্তি করতে হ'ত। দুটোর কোনটাই করা আমার কাছে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় নি।

এই বইয়ের নাম দিয়েছি "রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ"। এখানে "নব" শব্দের অর্থ "নয়"। এই বইয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের উপরে লেখা নয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, তাই এর এইরকম নাম। কিন্তু "নব রাগ" কথাটিকে "নতুন রং" অর্থে গ্রহণ করলেও এ বইয়ের নামের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে। কোন একটি বিশেষ সাহিত্যকে বিভিন্ন সমালোচকেরা বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখেন এবং তাঁদের সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গী বিভিন্ন রকমের হয়। ফলে প্রতি সমালোচনার মধ্য দিয়েই ঐ সাহিত্যে এমন একটি

রং লাগে, যা ইতিপূর্বে তার মধ্যে দেখা যায় নি।* রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আমার সমালোচনাও তার ব্যতিক্রম নয়, তার নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক্ না কেন। সুতরাং এ দিক দিয়ে বিচার করলেও "রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ" নামটি অনুমোদন করা যায় বলে আমি মনে করি।

এই বইয়ের মধ্যে 'বিসর্জন' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি আছে, তার অবলম্বন বলা বাহুল্য 'বিসর্জন'-এর বর্তমান-প্রচলিত সংস্করণ, যে সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। কিন্তু 'বিসর্জন'-এর প্রথম সংস্করণের (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) সঙ্গে এই সংস্করণের কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম সংস্করণে 'রাজর্ষি'র হাসি ও কেদারেশ্বর এই দুটি চরিত্রকে রাখা হয়েছিল। অপর্ণার অন্ধ পিতা ঐ সংস্করণের 'বিসর্জনে'র অন্যতম চরিত্র। বর্তমান সংস্করণে গুণবতীর চরিত্রটিকে যেভাবে দেখতে পাই, প্রথম সংস্করণে চরিত্রটি তার তুলনায় আরও অদ্ভুত প্রকৃতির। তাতে দেখি গুণবতী একবার হাসি ও ধ্রুবকে হিংসা করেন আবার পরক্ষণেই সেজন্যে তিনি আত্মগ্লানি অনুভব করেন। শুধু তাই নয়, গুণবতীই চাঁদপাল ও নক্ষত্ররায়কে গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে অনুরোধ জানান! প্রথম সংস্করণে অপর্ণার হৃদয়বিক্ষোভ আর একটু বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে চাঁদপাল ও নয়নরায়ের বিরোধেরও বিশদ বর্ণনা পাই। চাঁদপালের চরিত্রটি প্রথম সংস্করণে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে; তার মধ্যে তার কুটিলতা পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। 'বিসর্জন'-এর আধুনিক সংস্করণে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন চরিত্রের দীর্ঘ ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি জায়গায় পরিবর্জন ও পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। মোটের উপর 'বিসর্জন'-এর বর্তমান-প্রচলিত সংস্করণকে আমরা প্রথম সংস্করণের সংক্ষিপ্ত, সংহত ও উন্নত রূপ বলতে পারি। তবে প্রথম সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণের মূল সুর অভিন্ন। আমরা এই বইয়ে 'বিসর্জন' নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করে তার যে সমস্ত প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছি, সেগুলি উভয় সংস্করণ সম্বন্ধেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

এই বইয়ে 'শারদোৎসব' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি আছে, তার সঙ্গে অন্যান্য প্রবন্ধগুলির পার্থক্য সকলেই অনুভব করতে পারবেন। এই প্রবন্ধে আমি ইচ্ছা করেই ভাষাকে

অন্যান্য প্রবন্ধগুলির তুলনায় হাল্কা করেছি এবং বক্তব্যকে যতদূর সম্ভব সহজভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। তার কারণ, 'শারদোৎসব' নাটিকাটি যাদের দ্বারা অভিনীত হবার জন্য রচিত হয়েছে, তারা যাতে আমার এই প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারে, সেই দিকে আমার লক্ষ্য ছিল।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহোদয় এই বইটির একটি "পরিচয়" লিখে দিয়ে আমায় গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর ঋণ আমি কোন দিনই শোধ করতে পারব না।

উদ্যমী প্রকাশক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বারিক এই বইটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন বলেই এত শীঘ্র এর প্রকাশ সম্ভব হ'ল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত ভট্টাচার্যের আগ্রহ ও উৎসাহ এই বইয়ের প্রকাশের জন্য অনেকখানি দায়ী। শ্রীসুরেন্দ্র প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত কমল বন্দ্যোপাধ্যায় সুষ্ঠুভাবে বইটির ছাপার কাজ পরিচালনা করেছেন এবং যাতে কোন ছাপার ভুল না থাকে, সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আমার কয়েকজন ভূতপূর্ব ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী এই বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রেস-কপি তৈরী করে দিয়ে বা পরামর্শ দিয়ে অথবা অন্য কোন ভাবে সাহায্য করেছেন, এঁদের নাম—শ্রীমান অনঙ্গমোহন রুদ্র, শ্রীমতী ইলা বসু, শ্রীমতী তান ওয়েন, শ্রীমতী নবনীতা মজুমদার, শ্রীমান পরেশনাথ কর্মকার, শ্রীমতী বুলবুল রায়চৌধুরী এবং শ্রীমতী রীতা ধর। এঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী রইলাম।

ছাপার ব্যাপারে যাতে কোন প্রমাদ না থাকে, তার জন্য আমার এবং শ্রীসুরেন্দ্র প্রেসের কর্ণধার ও কর্মীদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও এই বইতে কয়েকটি ছাপার ভুল রয়ে গিয়েছে। তবে সেগুলি খুবই সুস্পষ্ট। "লেখনী" যে ছাপার ভুলে "লেখণী" হয়েছে (পৃঃ ২৫) অথবা "উজ্জ্বলতর" হয়েছে "উজ্জলতর" (পৃঃ ৮৬), তা যে-কেউই ধরতে পারবেন। সব ভুলগুলিই এই জাতীয়, এগুলি শুদ্ধিপত্র দিয়ে দেখিয়ে দিলে পাঠকদের সহজ বুদ্ধির উপর আস্থার অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। তাই শুদ্ধি-পত্র দিলাম না। তবে এইখানে একটা প্রয়োজনীয় সংশোধন সেরে নিচ্ছি। ৩১ পৃষ্ঠার ৫ম ছত্রে "রানীর" শব্দটির আগে (') চিহ্ন ছাপা হয়েছে, সে জায়গায় (") চিহ্ন হবে; তেমনি ঐ পৃষ্ঠার ১৪শ ছত্রে "করছ ?' "-র পরে (") চিহ্ন হবে। অর্থাৎ ৫ম ছত্রের

"রানীর" থেকে ১৪শ ছত্রের "করছ ?' " পর্যন্ত সমস্তটাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি—'বিসর্জন'-এর বর্তমান-প্রচলিত সংস্করণের পরিশিষ্ট থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর মধ্যে এই বইখানি প্রকাশিত হ'ল, এটি আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। বহু গুণী ব্যক্তি এই বছরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, গুণী না হয়েও আজ আমি তাঁদের পাশে দাঁড়ালাম, কারণ তীর্থস্থানে গেলে বিত্তহীন লোকও পরমধনীর পাশে দাঁড়াবার অধিকার পায়।

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিসর্জন

"রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। এংলোইণ্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হ'ল না, ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদাপাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয় কী বেদন। বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন। বাপ কোনো মতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম গল্প পাওয়া গেল।"

স্বপ্নের সূত্র ধরে এক রাত্রে যে কাহিনীর প্রেরণ এসেছিল, তাকে ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পটভূমিকায় স্থাপিত করে 'রাজর্ষি' উপন্যাস লেখা হয়েছিল। আবার এই 'রাজর্ষি' উপন্যাসেরই কাহিনীকে ভেঙে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিসর্জন।

'রাজর্ষি' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হলেও 'বিসর্জন'কে ঠিক 'রাজর্ষি'র নাট্যরূপ বলা যায় না। 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের রচনা আর 'বিসর্জন' তার কয়েক বছর পরের রচনা, তাই 'রাজর্ষি'র তুলনায় 'বিসর্জনে স্বভাবতই পরিণততর প্রতিভার চিহ্ন দেখা যায়। 'রাজর্ষি'তে তরল উচ্ছ্বাস এবং অবাস্তব উপাদানের মাত্রাধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু 'বিসর্জনে' উচ্ছ্বাস শমিত হয়েছে, অনাবশ্যক উপাদানগুলি বর্জিত হয়েছে। 'রাজর্ষি'তে জয়সিংহের মৃত্যুর পরেও রঘুপতির ধর্মান্ধতা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নির্বাপিত হয়নি এবং নানা ধরণের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পরে রঘুপতির পরিবর্তন ও গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখিয়ে 'রাজর্ষি'র সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে, কিন্তু 'বিসর্জনে' জয়সিংহের আত্মসমর্পণের পরেই রঘুপতির পরিবর্তন দেখানো হয়েছে

ও সেখানেই নাটকটি শেষ হয়েছে। 'রাজর্ষি'র হাসি, কেদারেশ্বর, বিল্বন, সুজা প্রভৃতি চরিত্রের সাক্ষাৎ 'বিসর্জনে' পাওয়া যায় না, ধ্রুব র ভূমিকা 'রাজর্ষি'র তুলনায় 'বিসর্জনে' একান্ত গৌণ। তেমনি 'বিসর্জনে'র গুণবতী ও অপর্ণা এই দুটি প্রধান চরিত্র 'রাজর্ষি'তে নেই। 'বিসর্জনে'র নয়নরায়ও নতুন সৃষ্টি, 'রাজর্ষি'তে নয়নরায় নামে যে গৌণ চরিত্রটি আছে, তার সঙ্গে এ'র সামান্যমাত্র মিল আছে।

'রাজর্ষি' উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য দেবীর মন্দিরে পশুবলি দেওয়ার বিরোধী হয়েছেন হাসির মৃত্যু দেখে, বলি বন্ধের আদেশ দেওয়ার পরও তাঁর মনে মাঝে মাঝে দ্বিধা বা সংশয়ের নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু 'বিসর্জনে' গোবিন্দমাণিক্য ছাগ-শিশুর জন্য অপর্ণার বিলাপ শুনে জীববলিকে অন্যায় মনে করেছেন এবং একবার বলি বন্ধের আদেশ দেবার পরে তাঁর মনে মুহূর্তকালের জন্যও এ সম্বন্ধে কোন সংশয় দেখা দেয়নি। অবশ্য 'রাজর্ষি'তে গোবিন্দমাণিক্য যে কারণের জন্য মন্দিরে বলি বন্ধ করলেন, তা 'বিসর্জনে' প্রদর্শিত কারণের তুলনায় মনে গভীরতর রেখাপাত করে। 'রাজর্ষি ও 'বিসর্জন' উভয় গ্রন্থেই সংস্কার ও প্রেমের সংঘাত দেখানো হয়েছে, কিন্তু 'বিসর্জনে' সে সংঘাত 'রাজর্ষি'র তুলনায় অনেক স্পষ্টতর ও তীব্রতর। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডির আভাস থাকলেও সে ট্র্যাজেডি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু 'বিসর্জনে' প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রের ট্র্যাজেডি সুস্পষ্ট, সুপরিণত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে।

'রাজর্ষি' উপন্যাসে প্রকৃতির বর্ণনা একটি প্রধান স্থান জুড়ে আছে। এই সমস্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং সমগ্র উপন্যাসটি একটি অপরূপ মাধুর্য লাভ করেছে। এই উপন্যাসটির মধ্যে প্রকৃতিও যেন একটি জীবন্ত সত্তা এবং উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের, বিশেষভাবে জয়সিংহের হৃদয়ের কথা প্রকৃতির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। এর চতুর্থ পরিচ্ছেদে "নববর্ষার ঘোরঘটা"র সঙ্গে জয়সিংহের হৃদয়ের আনন্দ একাকার হয়ে গিয়েছে এবং পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ষার উন্মত্ত লীলার সঙ্গে জয়সিংহের হৃদয়ের হাহাকার পরিপূর্ণভাবে মিশে গিয়েছে। কিন্তু 'বিসর্জন' নাটক, তাতে প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়ার অবকাশ নেই। তাই 'বিসর্জনে' প্রকৃতির স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। অবশ্য জয়সিংহের সংলাপে মাঝে মাঝে প্রকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তা 'রাজর্ষি'র প্রকৃতি-বর্ণনার কাছে দাঁড়াতে পারে না। প্রকৃতি-

বর্ণনা 'রাজর্ষি'কে যে মাধুর্য দান করেছিল, 'বিসর্জনে' তার অনুরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে অপর্ণা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু 'রাজর্ষি'র সঙ্গে 'বিসর্জনে'র প্রধান পার্থক্য অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়ে। 'রাজর্ষি' তার সমস্ত দোষত্রুটি, অপূর্ণতা ও অপরিণতি সত্ত্বেও একখানি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পেরেছে। এর মধ্যে পাই ত্রিপুরার বিশিষ্ট পরিবেশ, ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যচ্যুতি ও ভাগ্যবিপর্যয়ের বিস্তৃত কাহিনী, ত্রিপুরার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথাপদ্ধতির খুঁটিনাটি বিবরণ, "জুমিয়া" প্রভৃতি লোকদের পরিচয়। এ সমস্ত মিলে 'রাজর্ষি' উপন্যাসে যে রস সৃষ্টি করেছে, তাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুসারে "ঐতিহাসিক রস" নাম দেওয়া যেতে পারে। 'রাজর্ষি'র একটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণভাবে এবং অন্যান্য পরিচ্ছেদের স্থানে স্থানে ইতিহাসের সারসংকলন করা হয়েছে এবং ইতিহাসগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উপন্যাস শেষ করা হয়েছে। কিন্তু 'বিসর্জনে'র মধ্যে একমাত্র গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায়ের নাম এবং 'মোগল' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ছাড়া ইতিহাসের প্রায় কিছুই নেই; এর মধ্যে ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টাই করা হয়নি এবং ঐতিহাসিক রসের বিন্দুবাষ্পও 'বিসর্জনে' পাওয়া যায় না। 'রাজর্ষি'তে যে সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে, তা একটি বিশেষ যুগের একটি বিশেষ দেশ ও একজন বিশেষ রাজার সমস্যা, কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকের বিষয়ীভূত সমস্যা কোন বিশেষ যুগ, দেশ বা পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা মানবসাধারণের চিরন্তন সমস্যা। তাই দুটি গ্রন্থের গোত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ কী? বিসর্জন কোন্ শ্রেণীর নাটক এবং তার মূল বৈশিষ্ট্যই বা কী? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 'বিসর্জন' নাটকের রচনার ইতিহাসটি পর্যালোচনা করা দরকার। প্রথমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘরোয়া'তে এ সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করছি,

"তখন বর্ষাকাল, রবিকাকা আছেন পরগনায়। দাদা অরুদা আমরা কয়জনে একটা কী নাটক হয়ে গেছে, আর-একটা নাটক করব তার আয়োজন করছি। 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট'এর (অবনীন্দ্রনাথ ভুলবশত 'রাজর্ষি'র জায়গায় 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' বলেছেন) বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাটুকু নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক

করব। ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, আমরা সব তাকিয়া বুকে নিয়ে এই-সব ঠিক করছি —এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, দেখি কী হচ্ছে। খাতাটা নিয়ে নিলেন, দেখে বললেন, না, এ চলবে না—আমি নিয়ে যাচ্ছি খাতাটা, শিলাইদহে বসে লিখে আনব, তোমরা এখন আর-কিছু কোরো না। যাক আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। এর কিছুদিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন, আট-দশ দিন বাদে ফিরে এলেন, 'বিসর্জন' নাটক তৈরি।"

'শিলাইদহে' যে অবস্থার মধ্যে 'বিসর্জন' রচিত হয়েছিল, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই শোনা যাক্,

"চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ.
তারি' পরে বালকেব দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা — সারাদিন করে খেলা
উভচর মানবশাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক ঝক।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ মাঝে—
বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি,
রিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু পা দুলাইয়া।

বিসর্জন

পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট-অশথের।,
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা—
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি,
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর—
সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর।

পূর্বপ্রান্তে বনশিরে সূর্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারি দিকে পাখির কূজন।
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যুষে মধুমাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুম কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে।
সেই ভোরবেলা আমি মানসকুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখি-গান কানে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন—
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্যধন।
আদি কবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করেছে বীজন,
ওই মায়াচিত্রবৎ তরুলতা ছায়াপথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁসে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক, বর্তমান আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
'আজ' 'কাল' দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি পড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন করে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য-বরিষন।
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডি-বিরচন,
কেবলি নূতনে আশ, সৌন্দর্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিনরাত—
সে সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।"

এই বর্ণনা পড়ে বোঝা যায়, যে পরিবেশের মধ্যে বসে কবি 'বিসর্জন' লিখেছিলেন, সেখানে কালের গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কবির চোখের সামনে ছিল একদিকে পল্লীবাসীর শান্ত নিস্তরঙ্গ চিত্রময় জীবনযাত্রা, অপরদিকে প্রভাত-প্রকৃতির অফুরন্ত মধুরিমা—যা বর্তমানেরও নয়, অতীতকালেরও নয়, চিরকালের সামগ্রী। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রচিত হওয়ার ফলেই 'বিসর্জন' নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটা স্থান পায় নি, তার বদলে তার মধ্যে গীতিবস প্রাধান্য পেয়েছে এবং একটি সর্বকালীন সত্য রূপায়িত হয়েছে। 'বিসর্জন' ঐতিহাসিক নাটক নয়, কাব্যধর্মী নাটক।

* * *

'বিসর্জন' নাটকের মূল ভাবটি কী, তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম হল জয়যুক্ত।"

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ সমালোচকও যে নিজের রচনার মর্ম উদ্‌ঘাটনে সব সময় সফল হন না, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বোধ হয় তার একটি দৃষ্টান্ত। 'বিসর্জনে' প্রেম আর প্রতাপের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে বলে একেবারেই মনে হয় না। প্রতাপ রঘুপতির তুলনায় গোবিন্দমাণিক্যেরই বরং বেশী ছিল এবং তিনি মন্দিরে পশুবলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন নিজের প্রতাপেরই জোরে। আসলে 'বিসর্জনে' প্রেম ও সংস্কারের মধ্যে সংঘাত দেখানো হয়েছে। সংস্কারের ধ্বজা বহন করেছেন রঘুপতি ও গুণবতী—আর প্রেমের আদর্শকে তুলে ধরেছেন গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণা। সারা নাটকটিতে এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে এবং এই দুই পক্ষের মাঝখানে রয়েছে জয়সিংহ ; তার মধ্যে প্রেমও আছে, সংস্কারও আছে ; তাই এই সংঘর্ষের ফলে তারই অন্তরমন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। 'বিসর্জন' নাটকের এই মূল বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার শেষ দিকে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "একদল লোক বাহ্য শক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন করে রাখতে চায়, অন্য দল বলছে, প্রেমই সবচেয়ে বড়ো জিনিস। জয়সিংহ এই দোটানার মাঝখানে পড়ল এবং কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা করে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।"

'বিসর্জন' নাটকে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণামে প্রেম যে একেবারে জয়যুক্ত হয়েছে, তাও বলা যায় না। এইখানেই 'বিসর্জনে'র বাস্তবধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব জীবনে ন্যায় ও অন্যায়ের যুদ্ধে ন্যায় সব সময় জয়ী হয় না। জীবন নানারকম জটিল উপাদানে গঠিত বলে এখানে কোন কিছুই সোজা পথে আগাগোড়া এগিয়ে যেতে পারে না, কোন না কোন জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বাঁক ঘুরে অন্য দিকে চলে যায়। তাই এখানে রূপকথার মত ন্যায়ের অবিমিশ্র জয়লাভ সব সময় সম্ভব হয় না।

'বিসর্জন' নাটকেও তা সম্ভব হয় নি। সেখানে 'প্রেমকে জয়যুক্ত' করতে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের জয়ের গৌরবে মিশে গেছে পরাজয়ের গ্লানিমা, সৃষ্টি হয়েছে ট্র্যাজেডি। আর যাঁরা সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাঁদের পরাজয়ও আমাদেব মনকে আশ্বস্ত করে তোলে না, তার বদলে তাঁদের ব্যর্থতা আমাদের মনে বেদনার গাঢ় ছায়াই ঘনিয়ে তোলে, তার মধ্যেও আমরা দেখি ট্র্যাজেডি। এখন এই বিষয়টি সম্বন্ধেই আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

এ সম্বন্ধে প্রথম বিচার্য বিষয় এই, ট্র্যাজেডি কাকে বলে? একসময় সেই নাটককেই ট্র্যাজেডি বলা হত, যার পরিসমাপ্তি ঘটত একটি বা একাধিক প্রধান চরিত্রের মৃত্যুতে। এর পবে কেবলমাত্র মৃত্যু নয়, বিচ্ছেদের মধ্যে কোন নাটকের অবসান ঘটলে তাকেও ট্র্যাজেডি বলা হত। কিন্তু বর্তমান কালে ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আগেকার সে ধারণা একেবারে পালটে গেছে। বর্তমান যুগের রসজ্ঞ সমালোচকদের মতে কোন চবিত্রেব মধ্যে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম বেদনা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কেবলমাত্র তাকেই ট্র্যাজেডি বলা যেতে পারে।

অ্যারিস্টট্ল্ বলেছেন যে ট্র্যাজেডি উদ্বোধিত করে মানুষের মনের দুটি বৃত্তিকে— একটি করুণা, অপরটি ভয়, কোন চরিত্রের ট্র্যাজেডি দেখলে আমাদের মনে তার প্রতি করুণার সঞ্চার হয়, সেই সঙ্গে ভয়ও হয়, নিজেদের অদৃষ্টে অনুরূপ পরিণতি ঘটতে পারে ভেবে। এই করুণা ও ভয় আমাদের ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলে, সেই সঙ্গে ট্র্যাজেডির বেদনা আমাদের নিজেদের মনের বেদনাকেও খানিকটা লাঘব করে। তাই ট্র্যাজেডির আবেদন আমাদের কাছে এত গভীর।

সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে শিখেছে যে বিশ্বসৃষ্টিতে মানুষের স্থান ততটুকুই, যতটুকু সমুদ্রের বেলাভূমিতে একটি বালুকণার স্থান। তাছাড়া মানুষের জীবন একটা অন্ধ জড়শক্তির খেয়ালে পরিচালিত হয়, তার ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকার এই খেয়ালের কাছে স্রোতের সামনে খড়কুটোর মত ভেসে যায়। ট্র্যাজেডি মানবজীবনের এই তুচ্ছতা ও অসহায়তা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। ট্র্যাজেডির মধ্যে অনেক সময় একটা দ্বন্দ্ব থাকে। মানুষ তার উদ্যম ও পৌরুষ নিয়ে নিজের পথ নিজেই করে নিতে চেষ্টা করে, সে যেতে চায় একপথে, কিন্তু বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা অন্ধ

জড়শক্তি তাকে নিয়ে যায় অন্য পথে। একে বলা যায় বহির্দ্বন্দ্ব। আর একরকমের দ্বন্দ্ব বাধে মানুষের নিজেরই মনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে। একে বলা যায় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই সমস্ত দ্বন্দ্বের ফলে যখন মানবাত্মার পরাজয় ঘটে, তখনই সৃষ্টি হয় ট্র্যাজেডি। আবার কখনও কখনও এই পরাজয় দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আসে না, সে আসে একটা আকস্মিক আঘাতের মধ্য দিয়ে। তাতেও ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই আকস্মিক আঘাতেব পিছনেও একটি কার্যকারণপরম্পরার শৃঙ্খলা থাকা চাই, না থাকলে তা বিশ্বাসযোগ্য হয় না; সেক্ষেত্রে বেদনা লঘু হয়ে যায়, ফলে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয় না।

মানবাত্মার এই পরাজয় নানা মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কখনও সে আত্মপ্রকাশ করে মৃত্যুর রূপে, আবার কখনও বা বিচ্ছেদ, বঞ্চনা, আশাভঙ্গ প্রভৃতিব মূর্তিতে, যখন মনে হয় বেঁচে থাকা সত্ত্বেও জীবনে এমন একটা অতলস্পর্শ শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যা কিছুতেই পূরণ হবার নয়। আবার কোন কোন সময় এই পরাজয় একটি চরিত্রের মূল ভিত্তিই নড়িয়ে দিয়ে যায়, বহু দিন ধরে তিল তিল করে সে জীবনের যে মূল্যবোধ (value-sense) গড়ে তুলেছিল, তাই এর ফলে আকস্মিক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, ট্র্যাজেডিব সূক্ষ্মতম রূপ প্রকাশ পায় এরই মধ্যে।

ট্র্যাজেডির প্রথম সূচনা গ্রীক নাটকের মধ্যে। সেই সময় থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত ট্র্যাজেডিব পরিকল্পনাব অনেক ক্রমবিকাশ হয়েছে এবং তার রূপও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রকৃতি নিতান্তই সরল। সেখানে ট্র্যাজেডি সংঘটিত করে দৈবশক্তি, অদৃষ্টেব বা দেবতাদের অন্ধ খেয়ালে একটি লোকের জীবনে ট্র্যাজেডির করাল অভিশাপ নেমে আসে।

শেক্‌স্‌পীয়রের যুগে ট্র্যাজেডি অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল রূপ লাভ করল। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে দেখি কোন চরিত্রের ট্র্যাজেডি আসছে দৈবশক্তির খেয়াল থেকে নয়, তার নিজেরই অন্তর্নিহিত ক্রটি থেকে। শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্ট ট্র্যাজিক্‌ চরিত্রগুলি নানাগুণে ভূষিত হলেও তাদের মধ্যে এমন কোন না কোন একটা দুর্বলতা থাকে, যা অনুকূল পরিবেশ পেয়ে বর্ধিত হতে থাকে এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় ট্র্যাজেডি। ম্যাকবেথের উচ্চাভিলাষ, হ্যামলেটের ভাবুকতা এবং লীয়রের পিতৃস্নেহ তাঁদের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং এরই ফলে তাঁদের জীবন ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হয়েছে।

এর দুই শতাব্দী পরে বিখ্যাত নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক শোপেনহাউয়্যার ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন। শোপেনহাউয়্যার শেক্‌স্‌পীয়রের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দেখান যে কোন চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থাকলেই যে শুধু ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়, তা নয়, কোনরকম দুর্বলতা না থাকলেও ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হতে পারে, কারণ বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেই একটা ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়ে গেছে, তারই ফলে যে কোন লোকের জীবনে যে কোন সময়ে ট্র্যাজেডি আসতে পারে, যেমন একটি নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে নদী পার হবার সময় সাঁকোর দোষে যে-কোন লোক জলে পড়ে যেতে পারে, তা সে দুর্বল বা সবল যা'ই হোক না কেন। শোপেনহাউয়্যার তাঁর নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টি অনুযায়ী ট্র্যাজেডির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেরও এক অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন যে সত্যকার ট্র্যাজেডি আমাদের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি করবে যে পৃথিবীটা বাস করার যোগ্য নয় এবং জীবনের কোন সার্থকতা নেই।

আধুনিক যুগে ট্র্যাজেডির নতুনতর রূপ পাই ইব্‌সেনের নাটকের মধ্যে। ইবসেনের নাটকে দেখি, কোন ব্যক্তির অসাধারণত্বই তার জীবনে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করছে, যখন সে সেই অসাধারণত্বকে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না, তখন তার চারপাশের নিতান্ত সাধারণ লোকেরা তার প্রতি প্রতিকূল ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং ছলে বলে কৌশলে তার পতন ঘটায়। এ ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির কারণ ঐ ব্যক্তির **exaggeration of self** বা আত্মার অতিরেক।

'বিসর্জন' নাটকের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রেই ট্র্যাজেডি আছে এবং এক এক জনের ট্র্যাজেডি এক এক ধরণের।

সাধারণত নাটকের উপসংহারেই ট্র্যাজেডি স্ফুট হয়। কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকের সূচনাই হয়েছে একটি ট্র্যাজেডি দিয়ে। সে ট্র্যাজেডি রাণী গুণবতীর ট্র্যাজেডি। নাটকের প্রথম দৃশ্যের সুরুতেই গুণবতী বলছেন,

> মার কাছে কী করেছি দোষ! ভিখারি যে
> সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
> তারে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে

সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা ল'য়ে, বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি !
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে ?

যারা সন্তান চায় না, তারাও সন্তান পায় ; অথচ তিনি মহারাণী, অসীম ঐশ্বর্য তাঁর, তাঁর সন্তান নেই। সন্তান-কামনায় তিনি দেবীর কাছে পূজা দেবার সংকল্প করেন। এরপর তিনি মন্দিরে বলির পশু পাঠান। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট তাঁর, সে পশু ফিরে এল। কারণ গোবিন্দমাণিক্য আদেশ দিয়েছেন যে মন্দিরে আর বলি হবে না। যে অদৃষ্ট তাঁকে সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছে, সেই অদৃষ্টই আবার তাঁকে সন্তান-কামনায় দেবীর মন্দিরে পূজা দেওয়া থেকেও বঞ্চিত করল। কত লোকে অবলীলাক্রমে মন্দিরে পশু বলি দিয়ে আসে, কিন্তু রাণী হয়ে তিনি আজ তা দিতে পারলেন না। ক্ষুব্ধ ও কাতর হয়ে রাণী গোবিন্দমাণিক্যকে অনুরোধ করলেন আদেশ প্রত্যাহার করে নেবার জন্য, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য যুক্তি দেখিয়ে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার রাণীর পরাজয় হল। তিনি এতদিন জানতেন তাঁর স্বামী চিরদিন তাঁর কথার বাধ্য,

আজ তাঁর সে সব ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তিনি দ্বিতীয়বার মন্দিরে যে পূজা পাঠালেন, তাও ফিরে এল।

তখন রাণীর সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ল রাজার একান্ত প্রিয় বালক ধ্রুবের উপর। কারণ তাঁর নিজের সন্তানরা রাজার কাছে যে ভালবাসা পেত, ধ্রুব তাদের আসবার আগে সেই ভালবাসা লাভ করেছে। রোষে ক্ষিপ্তা হয়ে গুণবতী প্রায় পিশাচিনীর পর্যায়ে নেমে গেলেন। তিনি নক্ষত্ররায়কে ডেকে বললেন ধ্রুবকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তাঁরই নামে বলি দিতে। এতে গুণবতীর দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে, ধ্রুবও মরবে আর যে পূজা তিনি এতদিন ধরে দিতে পারছেন না, সেই পূজাও দেওয়া হবে। নক্ষত্ররায় তাঁর কথায় সম্মত হলেন। কিন্তু অদৃষ্ট এবারও গুণবতীর ইচ্ছায় বাদ সাধল। ধ্রুবকে বলি দেবার আগেই রাজা ও তাঁর লোকেরা মন্দিরে গিয়ে তাতে বাধা দিয়ে নক্ষত্ররায় ও রঘুপতিকে বন্দী করলেন।

গুণবতীর পরাজয় এখন প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁকে আর একবার শেষ সুযোগ দিল, যখন গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসন ত্যাগ করলেন। গুণবতী এখন রাণী থেকে সাধারণ একজন নারীর পর্যায়ে নেমে এসেছেন, কিন্তু তবু তাঁর অন্তরে উল্লাস। কারণ গোবিন্দমাণিক্য এখন আর রাজা নেই, সুতরাং মন্দিরে বলি দেওয়ারও আর কোন বাধা নেই। গুণবতীর আজ্ঞা পালনের জন্য এখন কেউ নেই, কিন্তু তিনি তাতে নিরস্ত হলেন না, নিজের আভরণরাজির বিনিময়ে তিনি পূজার উপকরণ সংগ্রহ করলেন। নিজে পূজা নিয়ে মশাল হাতে বাজনা বাজিয়ে মন্দিরে গেলেন।

কিন্তু এবারও তাঁর পূজা দেওয়া হল না। অদৃষ্ট আবার তাঁকে হতাশ করল। মন্দিরে গিয়ে গুণবতী দেখলেন মন্দিরে দেবীই নেই, রঘুপতি তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন গোমতীর জলে।

. বারবার গুণবতীর এই আশাভঙ্গ ও পরাজয় ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করেছে। এই ট্র্যাজেডি এসেছে গুণবতীর অদৃষ্টের প্রতিকূলতা থেকে। এর মধ্যে গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

ট্র্যাজেডি রয়েছে রঘুপতির মধ্যেও। কিন্তু সে ট্র্যাজেডি স্বতন্ত্র ধরণের। রঘুপতির ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড এবং অটল। তাঁর সবচেয়ে প্রবল প্রবৃত্তি তাঁর ধর্মসংস্কার। দেবী তাঁর কাছে শুধু প্রতিমা নন, জীবন্ত সত্য। দেবীর পুরোহিত হিসাবে দেবীকে সন্তুষ্ট

করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে তিনি জ্ঞান করতেন, তাই দেবীর পূজা ও বলিতে কোনরকম ত্রুটি হতে দিতেন না।

যে রঘুপতির ধর্মসংস্কারে আঘাত দিত, সেই হয়ে উঠত তাঁর দুই চক্ষের বিষ। স্বয়ং রাজার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। রাজা মন্দিরে বলি বন্ধ করার আদেশ দেওয়ায় রঘুপতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে অভিসম্পাত দিলেন। রাজার আদেশ অমান্য করে বলি দেওয়ার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু রাজা তাঁর রাজশক্তি দিয়ে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। তখন রাজার প্রতি রঘুপতির মনে বৈরানল জ্বলে উঠল ; তিনি রাজাকে পৃথিবী থেকে সরাবার জন্য নক্ষত্ররায়কে মিথ্যা করে বললেন যে দেবী রাজরক্ত চান এবং নক্ষত্ররায় তা এনে দিলে তিনি তাকেই রাজা করবেন। কিন্তু নক্ষত্ররায়ের ভীরুতা ও দুর্বলতার জন্য তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হল না। এরপর রঘুপতি ছলে বলে কৌশলে রাজার প্রতি প্রজাদের মনকে বিমুখ করবার চেষ্টা করেছেন, রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে দেবীর কাছে বলি দিতে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হয় নি। এই সমস্ত ব্যর্থতা কিন্তু তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারে নি, বরং তিনি নব উদ্যমে আবার বারবার রাজার বিরুদ্ধে নূতন নূতন অভিযান সুরু করেছেন। এই সমস্ত বিফলতা তাঁর সুদৃঢ় ধর্মসংস্কারের ভিত্তিকেও এতটুকু টলাতে পারে নি। তাঁর এই সংস্কার এতই অটল যে এর জন্য তিনি নানারকম অন্যায় কথা বলেছেন এবং গর্হিত কাজ করেছেন। জয়সিংহ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে যে দেবী এক ভাইকে দিয়ে অপর ভাইকে হত্যা করাতে চান, এ কী রকম ব্যাপার,—তখন রঘুপতি বলেছেন, "পাপপুণ্য তুমি কিবা জানো!" জয়সিংহ বলেছে, "শিখেছি তোমারি কাছে।" তখন রঘুপতি অম্লান বদনে বলেছেন,

> তবে এস বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
> পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
> আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
> এ জগৎ মহা হত্যাশালা।

জয়সিংহ যখন দেবী প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে দেবীকে বলেছে,

> মানবভাষায়, বল্ শীঘ্র সত্যই কি
> রাজরক্ত চাই?

তখন রঘুপতি বিনা দ্বিধায় প্রতিমার পিছন থেকে উত্তর দিয়েছেন, "চাই"। আবার অজ্ঞ জনসাধারণকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্য তিনি নিজেই প্রতিমাকে পিছন ফিরিয়ে রেখে তাদের বুঝিয়েছেন যে বলি বন্ধ করায় দেবী বিমুখ হয়েছেন।

কিন্তু রঘুপতির চরিত্রে এক জায়গায় একটুখানি ফাটল ছিল। জয়সিংহকে তিনি প্রাণমন দিয়ে ভালবাসতেন। তাকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছিলেন। তাই তাকে তিনি ছাড়তে পারতেন না। পাছে অপর্ণা জয়সিংহকে নিয়ে যায় এই ভেবে তিনি অপর্ণাকে দেখলেই দূর দূর করতেন। জয়সিংহের কোন অমঙ্গল তিনি হতে দিতে পারতেন না। তার জন্যই তিনি নক্ষত্ররায়কে রাজরক্ত আনতে বলেছিলেন, জয়সিংহকে প্রথমে সে ভার দেননি, কারণ পাছে তাব কোন বিপদ ঘটে। কিন্তু জয়সিংহ রঘুপতির ছলনা ও গর্হিত আচরণ এবং অপর্ণার প্রতি দুর্ব্যবহার দেখে তাঁর প্রতি ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল এবং দূরে সরে যেতে লাগল। রঘুপতি বুঝতে পারলেন যে সে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু কেন, তা তিনি বুঝতে পারেন না। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন,

> জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
> এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে।

এইখানেই রঘুপতির ট্র্যাজেডির সুরু। ট্র্যাজেডি গভীরতব হয় যখন রাজার কাছে নির্বাসন দণ্ড লাভের পরে তিনি দুদিন সময় চেয়ে নিয়ে জয়সিংহকে রাজরক্ত আনবার জন্য নতজানু হয়ে অনুনয়-বিনয় করেন এবং জয়সিংহ তার এই উত্তব দেয়,

> রাজরক্ত চাহে
> দেবী, তাই তারে এনে দিব।

এই উত্তর শুনে রঘুপতি সখেদে নিজের মনে বলেন,

> দেবী চাহে, তাই বলে দিস। আমি
> কেহ নই। হায়, অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
> কী করেছে? শিশুকাল হতে দেবী তোবে
> প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে
> করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন?

মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা ? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে ? হায়, কলিকাল ! থাক্ !

কিন্তু রঘুপতির ট্র্যাজেডি এক মুহূর্তে চরমে পৌঁছে গেল, যখন জয়সিংহ আত্মবলি দিল। রঘুপতির হিসাবে ভুল হয়ে গেল। তিনি গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণ নেবার জন্যে কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের বদলে প্রাণ গেল তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় জয়সিংহের। এ আঘাত তিনি সহ্য করবেন কেমন করে ? তাঁর চরিত্রের নিশ্ছিদ্র ধর্ম-সংস্কারের এক কোণে যে স্নেহের কিশলয়টি মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল, তাই এখন মহীরুহের আকার ধারণ করে ধর্মসংস্কারকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিল। রঘুপতি এখন তাঁর অন্তরে জয়সিংহ ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না, স্বয়ং দেবীকেও না। দেবীকে তিনি বললেন জয়সিংহকে ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু পাষাণী প্রতিমা কোন সাড়াই দিল না। তখন রঘুপতি উপলব্ধি করলেন যে দেবী নেই। এই উপলব্ধি লাভ করে রঘুপতি দ্বিধাহীন চিত্তে দেবীপ্রতিমাকে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করলেন। রঘুপতি শুধু দেবীকেই বিসর্জন দিলেন না, সেই সঙ্গে বিসর্জন দিলেন তাঁর আদর্শকে, যে আদর্শের সেবা তিনি এতদিন করে আসছিলেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। এর থেকে বোঝা যায়, জয়সিংহের মৃত্যু রঘুপতির জীবনের মূল্যবোধকেই পরিবর্তিত করে দিয়ে গেছে। তার ফলে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে। রঘুপতির এই ট্র্যাজেডির সঙ্গে শেক্স্পীয়রের নাটকের ট্র্যাজেডির মিল আছে। শেক্স্পীয়রের নাটকের চরিত্রের মত রঘুপতিরও ট্র্যাজেডি এসেছে তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থেকে—সে দুর্বলতা জয়সিংহের প্রতি ভালোবাসা।

জয়সিংহের মধ্যে যে ট্র্যাজেডি আছে, তা আরো জটিল। জয়সিংহ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু শৈশব থেকেই সে মাতৃপিতৃহীন, অনাথ। রঘুপতি তাকে কৃপা করে মানুষ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে জয়সিংহ দু'জনকে আপনার বলে জানে—একজন দেবী চণ্ডী, অপরজন তার গুরু রঘুপতি। দেবীর প্রতি তার অটল বিশ্বাস, তিনি তার কাছে বাস্তব। দেবীর কাছে যে বলি দেওয়া হয়, তার নিষ্ঠুরতা জয়সিংহ উপলব্ধি করলেও তাকে সে অপরিহার্য বলে মনে করত, কারণ সে জানত দেবী এই বলি গ্রহণ করেন। আর রঘুপতি জয়সিংহকে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছেন,

তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি শুধু জয়সিংহের গুরু নন, সেই সঙ্গে পিতা ও সখা। কিন্তু ক্রমে জয়সিংহের জীবনে আরও দু'জনের আবির্ভাব ঘটল। একজন গোবিন্দ-মাণিক্য, যাঁকে সে দূর থেকে দেখে নিজের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করত, যিনি মহৎ, উদার. বিশ্বপ্রেমিক, আর একজন অপর্ণা, যে প্রেমের প্রতিমূর্তি। যেদিন জয়সিংহ প্রথম অপর্ণার সাক্ষাৎ পেল, একটি সামান্য ছাগশিশুর জন্য তার হৃদয়ঢালা ভালবাসার পরিচয় পেল, এবং নিজেও তার সেই প্রেম-ভরা হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করল, সেদিন জয়সিংহের জীবনে একটি নতুন দিক খুলে গেল। সে উপলব্ধি করল প্রেমের মহিমা।

কিন্তু এই সময় থেকেই জয়সিংহের জীবনে দেখা দিল সঙ্কট। একদিকে দেবী ও রঘুপতির প্রভাব, অপরদিকে গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণাব প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দুই শক্তি জয়সিংহকে দুই দিক হতে আকর্ষণ করতে লাগল।" দেবী ও রঘুপতির প্রভাব জয়সিংহকে শেখায় যে দেবী-পূজায় জীব-বলিদান কর্তব্য। গোবিন্দমাণিক্য আব অপর্ণার প্রভাব তার ঠিক বিপরীত শিক্ষা দেয়—বলে যে ধর্মের নামে জীবহিংসা মহাপাপ, বিশ্বজননী কখনও সন্তানের প্রাণ গ্রহণ কবতে পারেন না। "একদিকে অপর্ণা তাকে মন্দিব ত্যাগ করতে বলছে, অপর দিকে রঘুপতি তাকে মন্দিরের সীমানায় ধরে রাখতে চায়।" দুই পরস্পরবিরোধী প্রভাব জয়সিংহের মনে এক দ্বৈধেব সৃষ্টি করে। কখনও সে প্রতিমাকে উদ্দেশ করে বলে,

আজন্ম পূজিনু তোবে, তবু তোব মায়া
বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীব।

আবার কখনও সে বলে,

এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

এবং প্রাণপণে সে চেষ্টা করে গোবিন্দমাণিক্যের আদেশ অমান্য করে দেবীর পূজা পশুবলির মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ করতে।

কিন্তু জীব-বলির ঔচিত্য সম্বন্ধে সংশয় জাগা সত্ত্বেও তার মনে দেবীর প্রতি বিশ্বাস এখনও অটল। গুরুর প্রতি বিশ্বাস কিন্তু অতটা অটল রইল না, তাতে একটু একটু

করে চিড় ধরতে লাগল। প্রথম চিড় ধরল যখন সে দেখল তার গুরু নক্ষত্ররায়কে দেবীর আজ্ঞার দোহাই দিয়ে তার ভাই গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণ নিতে উৎসাহিত করছেন। গুরুকে জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করে কেন এই পাপ কাজ করতে তিনি বলছেন। গুরু দেবীর অভিপ্রায়ের দোহাই দিয়ে এবং "এ জগৎ মহা হত্যাশালা" বলে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে এ কাজ পাপ নয়। গুরুর এই কথায় তাঁর প্রতি জয়সিংহের শ্রদ্ধা ও আস্থা কতকটা টলে যায়। সে সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে। এরপর রঘুপতি যখন অপর্ণাকে মন্দির থেকে দূর করে দিতে বলেন, তখন জয়সিংহ তাঁর প্রতি সমস্ত ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে, সে তাঁকে বলে,

থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।

সেইসঙ্গে আর একদিক থেকেও জয়সিংহের মনে পরিবর্তন আসতে থাকে। এতদিন সে যা জানত, এখন তার বিপরীত কথা শুনে পৃথিবীর সমস্ত কিছু তার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকে, তাব মনে হয় কোন্‌টা সত্য? কোন্ পথে চলব? সে বলে,

চিন্তার সীমানা নাই কোথা—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন; চারি দিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়।

জীবনটা তার কাছে গোলকধাঁধার মত লাগে। সে জীবনের প্রতি ক্রমশই আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। তাই অপর্ণাকে দেখে তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা যায়, তাকে সঙ্গে নিয়ে সব ফেলে চলে যেতে।

এরপর জয়সিংহের মনের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রঘুপতির একাধিক হীন আচরণের ফলে তাঁর প্রতি জয়সিংহের শেষ শ্রদ্ধাটুকুও মুছে যায়। তিনি যখন দেবী-প্রতিমার পিছন থেকে জয়সিংহের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, (রাজরক্ত) "চাই", তখন জয়সিংহ গুরুকে মন থেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে। সেই সঙ্গে দেবীর প্রতিও তার বিশ্বাস টলে যায়। সে নিজেই বলে,

এ কী হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু—বিশ্বমাঝে
কিছু রহিল না আর!

এরপর যখন রঘুপতি নিজেই দেবী-প্রতিমার মুখ ফিরিয়ে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে দেবী বিমুখ হয়েছেন, তখন জয়সিংহ মর্মাহত হয়। অপর্ণার কৌশলে রঘুপতির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে জয়সিংহ রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করে, "সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ?" রঘুপতি অম্লানবদনে স্বীকারোক্তি করেন এবং জয়সিংহকে বলেন,

মূর্খদের কেমনে বুঝাব! চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
... ...
সত্য কোথা আছে—কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে
ফাটিয়া পড়েছে, সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'। সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজ-অন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে
মরে খেটে খেটে।

গুরুর এই কথা জয়সিংহের চোখ পরিপূর্ণভাবে খুলে দিল। সে বুঝল সবই মিথ্যা। সবই যখন মিথ্যা, তখন দেবীও সত্য নন, তিনিও মিথ্যা। সে বলল,

যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে—সবই
মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

শিশুকাল থেকে যে দেবীকে সে ধ্যান-জ্ঞান করেছে, সেই দেবী মিথ্যা—একথা উপলব্ধি করার ফলে জয়সিংহ শুধু জীবনের পুরাতন মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলে নি, সে জীবনের প্রতি সমস্ত আকর্ষণই হারিয়ে ফেলেছে। তাই জয়সিংহকে বলতে শুনি,

এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ। সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য,
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য-মাঝে।

এইখানেই জয়সিংহের ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর জয়সিংহের করুণ আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি তার আকর্ষণের অভাবই প্রমাণিত হয়। যে জীবনকে তার এতটুকুও ভাল লাগে না, সেই জীবন দিয়ে যদি ভ্রাতৃহত্যার মত মহাপাতককে নিবারণ করা যায়, দেবীর নামে মানুষের রক্ততৃষ্ণা মেটানো যায়, জয়সিংহ কেন জীবন দেবে না? আমাদের পুরোনো, ব্যবহারের অযোগ্য কাপড় ভিখারীর কোন কাজে লাগলে আমরা যেমন তা দিতে কুণ্ঠিত হই না, জয়সিংহও তেমনি অন্যদের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজের জীবন বলি দিতে কুণ্ঠিত হল না। জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে জয়সিংহ-চরিত্র একটা আনুষ্ঠানিক পরিণতি লাভ করেছে, কিন্তু তার ট্র্যাজেডির চরম পরিণতি এর আগেই ঘটে গেছে।

শোপেনহাউয়্যার ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন, তার সঙ্গে জয়সিংহের এই ট্র্যাজেডির মিল আছে। যা কিছু জয়সিংহ পরম বিশ্বাসে অবলম্বন করেছে, তাকেই সে শেষ পর্যন্ত হারিয়েছে। সে গুরুকে অবলম্বন করেছে, কিন্তু গুরুকে প্রতারক বলে জানবার পর তাঁকে সে মন থেকে হারিয়ে ফেলেছে। দেবীকে অবলম্বন করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জেনেছে দেবী নেই। প্রেমকে অবলম্বন করেছে, কিন্তু শেষ অবধি সে জেনেছে প্রেম ক্ষণভঙ্গুর, যার ফলে ভাই ভাইকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করে। শেষ পর্যন্ত সে জেনেছে জীবন মিথ্যা। জয়সিংহের এই উপলব্ধির মধ্যে শোপেনহাউয়্যারেরই উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়, "Life is not worth living." জয়সিংহের এই ট্র্যাজেডি আমাদের মনেও এই উপলব্ধি সৃষ্টি করে যে পৃথিবী বাসযোগ্য নয় এবং জীবনের মধ্যে কোন সারবস্তু নেই।

এবারে, গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে যে ট্র্যাজেডি রয়েছে, তার সম্বন্ধে আলোচনা

করতে হবে। গোবিন্দমাণিক্য মানুষ হিসাবে বা রাজা হিসাবে, দুই দিক্ দিয়েই আদর্শস্থানীয়। তিনি ভদ্র, মহৎ, উদার, কর্তব্যনিষ্ঠ। তাঁর ব্যক্তিত্ব লৌহের মত কঠিন। শত অনুনয়, বাধা বা ভীতিপ্রদর্শন তাঁকে তাঁর সংকল্প বা আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ। প্রজাদের তিনি সন্তানের মত ভালবাসেন। রাণী গুণবতীর রূঢ় ব্যবহার ও প্রতিকূল আচরণ সত্ত্বেও তাঁর জন্য তিনি প্রেমের ভাণ্ডার উন্মুক্তই রেখেছেন। ভাই নক্ষত্ররায়ের জন্যও তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। তাই নক্ষত্ররায়কে তার অপরাধের জন্য প্রাপ্য শাস্তি দেবার সময় তাঁর হৃদয় মুচড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর অন্তরের প্রেম শুধুমাত্র আত্মীয়দের বা প্রজাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বচরাচরে তা পরিব্যাপ্ত। তাই সামান্য ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার বিলাপ শুনে গোবিন্দমাণিক্য বেদনা অনুভব করেন, তিনি সেই বালিকাব কণ্ঠে বিশ্বজননীর এই বাণী শুনতে পান যে তাঁর নাম করে তাঁরই সন্তানকে বধ করার মত অন্যায় আর কিছু নেই। গোবিন্দমাণিক্য তাই দেবীর মন্দিরে পশুবলি বন্ধ করার আদেশ দেন।

কিন্তু এই মহৎ রাজার মহৎ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হবার সময় পদে পদে বাধার সম্মুখীন হল। রাজার আদেশ শুনে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি সর্বপ্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং সেই আদেশ অমান্য করার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। প্রবীণ মন্ত্রী সংশয় প্রকাশ করলেন। একান্ত বিশ্বাসী সেনাপতি নয়নরায় রাজার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করতে অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এইভাবে গোবিন্দমাণিক্যের মহৎ সঙ্কল্প তাঁর জীবনে অশান্তি ডেকে আনল।

কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য যাঁদের সবচেয়ে ভালবাসতেন, তাঁদেরই কাছ থেকে পেলেন রূঢ়তম আঘাত। তাঁর রাণী গুণবতী তাঁর বিরোধিতা করে মন্দিরে বলি পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করতে লাগলেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ব্যবহার কঠোর হয়ে উঠল। কিন্তু তার চেয়েও বড় আঘাত গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে এল যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁর প্রিয়তম ভাই নক্ষত্ররায় তাঁর প্রাণনাশের জন্য রঘুপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। গোবিন্দমাণিক্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন প্রেম দিয়ে হিংসার রক্তলেখা মুছে দিতে। কিন্তু সাফল্য বা শান্তি তিনি লাভ করতে পারলেন না। তাঁর সবচেয়ে প্রধান শত্রু রঘুপতি। রঘুপতি বারবার তাঁর নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মন্দিরে বলি দেবার

চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করে তোলবার চেষ্টা করেন এবং তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বালক ধ্রুবকে বধ করতে উদ্যত হন।

এ সব ব্যাপার সত্ত্বেও গোবিন্দমাণিক্য পরাজয় স্বীকার করেন নি। কিন্তু শেষে তাঁর প্রজারাও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। প্রজাদের আহ্বানে এবং বিশ্বাসঘাতক চাঁদপালের সাহায্যে মোগল সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করল, তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁর নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত ভ্রাতা নক্ষত্ররায়। গোবিন্দমাণিক্যের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করলেন না। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন তুচ্ছ রাজ্যের জন্যে? তা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি বিনা যুদ্ধে রাজ্য ত্যাগ করলেন।

বিশ্বপ্রাণীর কল্যাণে উদ্‌বুদ্ধ এই মহৎ রাজা হিংসার রক্তস্রোত বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি শুধু পেলেন বাধা, লাঞ্ছনা, পরাজয়। তাঁর আত্মীয়েরা, পাত্রমিত্রেরা, পুরোহিত, প্রজাবর্গ সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল, যার ফলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যই ছেড়ে দিতে হল। শুধু কি তাই? তাঁর সিংহাসন ত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণার পরে তাঁর রাজধানী আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে, বিজয়-তোরণ তুলে আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। গোবিন্দমাণিক্য প্রজাদের যে সব কল্যাণ সাধন করেছিলেন, তাদের কথা কারও মনে পড়ল না। মর্মাহত গোবিন্দমাণিক্য বললেন,

এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে
রাজধানী-বহির্দ্বারে বিজয়তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহুসম! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসিনি—ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা-ছিনু—কারো কি করি নি
উপকার? কোনো অবিচার করি নাই
দূর? কোনো অত্যাচার করিনি শাসন?
ধিক্ ধিক্ নির্বাসিত রাজা!

এই সুযোগ্য রাজার মহৎ প্রচেষ্টার পরিণতি ঘটল পরাজয় ও নির্মম আঘাতের মধ্য দিয়ে। এই পরিণতিই গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে ট্র্যাজেডি স্থষ্টি করেছে।

গোবিন্দমাণিক্যের ট্র্যাজেডির মূল কারণ তাঁর আত্মার অতিরেক বা exaggeration of self। তিনি মহৎ ও অসাধারণ, কিন্তু তাঁর চারপাশের লোকেরা ছিল অত্যন্ত সাধারণ, সংস্কারে আচ্ছন্ন, সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। গোবিন্দমাণিক্য তাদের প্রকৃতির সঙ্গে নিজের অসাধারণত্বের সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেন নি। তাই তারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর পতন ঘটাল। গোবিন্দমাণিক্যের এই ট্র্যাজেডির সঙ্গে ইব্‌সেনের নাটকের ট্র্যাজেডির ঘনিষ্ঠ মিল আছে।

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, ট্র্যাজেডির স্থষ্টি থেকে স্থরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকরণ গড়ে উঠেছে, তাদের প্রায় সবগুলিরই নিদর্শন 'বিসর্জন' নাটকে পাওয়া যায়। অন্য কোন বাংলা নাটক এই বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ।

সংঘাতই নাটকের প্রাণ। সেই সংঘাতের নিদর্শন 'বিসর্জন' নাটকে খুব বেশী পাওয়া যায়। নাটকের সংঘাত তিন রকমের হতে পারে—বাইরের ঘটনার সঙ্গে মানবচরিত্রের সংঘাত, মানবচরিত্রের সঙ্গে মানবচরিত্রের সংঘাত এবং মানবচরিত্রেরই ভিতরের সংঘাত বা অন্তর্দ্বন্দ্ব। রঘুপতি, গুণবতী ও গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে আমরা দেখি বাইরের শক্তির সঙ্গে মানবচরিত্রের সংঘাত। মানবচরিত্রের সঙ্গে মানবচরিত্রের সংঘাতও এই নাটকে দেখানো হয়েছে। একদিকে গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণা এবং অপর দিকে রঘুপতি ও গুণবতীর মধ্যে এই সংঘাত বেধেছে। প্রথম দলের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস প্রেম, দ্বিতীয় দলের কাছে সবচেয়ে বড় বস্তু সংস্কার। এই দুই দলের সংঘাতের মাঝখানে পড়ে জয়সিংহ জর্জরিত হয়েছে। দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির আকর্ষণে সে দিশাহারা হয়েছে। জয়সিংহের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই তৃতীয় ধরণের সংঘাত বা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কোন কোন সময় তার মনে হয় হিংসা কখনও ধর্ম হতে পারে না, আবার কোন কোন সময় মনে হয় গুরু তাকে যা শিখিয়েছেন তাই সত্য;

তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা !

'বিসর্জন' নাটকের সংঘাতগুলি অত্যন্ত জীবন্ত বলে নাটকটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

এই নাটকের চরিত্রগুলিও অত্যান্ত জীবন্ত। এদের পরিকল্পনা যেমন অভিনব, তেমনি জটিল। গোবিন্দমাণিক্য একদিকে কুসুমের মত মৃদু, তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সত্য প্রেম , কিন্তু সেই গোবিন্দমাণিক্যই আবার কর্তব্যের অনুরোধে কুলিশের মত কঠোর হয়ে ওঠেন। রঘুপতির মত দুর্জয় ব্যক্তিত্ব সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত বললে অত্যুক্তি হয় না। গুণবতী একদিকে সন্তানের জন্য লালায়িতা, "আপনার প্রাণের ভিতরে আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ" অনুভব করার জন্য তিনি ব্যাকুলা, কিন্তু অপরদিকে তাঁবই অপরের প্রাণের জন্য কোন মমতা নেই, শত শত পশুকে, এমন কি মানবশিশু ধ্রুবকেও তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলি দিতে পাঠান এবং না দিতে পেরে ক্ষুব্ধ হন। আর একটি জটিল চরিত্র জয়সিংহ। জয়সিংহেব বয়স কত, তা নাটক পড়ে সঠিক ভাবে অনুমান করা যায় না। কখনও তাকে মনে হয় কিশোর, কখনও মনে হয় যুবক। কখনও তার মধ্যে শিশুসুলভ সরলতা ও যুক্তিহীন বিশ্বাসের পরিচয় পাই, আবাব কখনও বা তার সংলাপে জটিল দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ দেখি। জয়সিংহ এক রহস্যময় বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছে, তার চরিত্রও রহস্যময়। এই সমস্ত চরিত্রের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। নাটকের আর দুটি বিশিষ্ট চরিত্র—অপর্ণা ও নক্ষত্ররায় সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা দরকার। অপর্ণা মূর্তিমতী প্রেম। তার ভালবাসা কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সকলের জন্যই সে প্রেমের ভাণ্ডার উন্মুক্ত। একটি নিরীহ ছাগশিশুকে সে নিজের সন্তানের আসনে বসিয়েছিল, তার জন্য সে তার হৃদয়ের প্রেম উজাড় করে দিয়েছিল। নিষ্ঠুর ঘাতক তার সেই "স্নেহের পুত্তলি"কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তখনও অপর্ণার প্রেম এতটুকুও ম্লান

হল না। সে প্রেম বর্ষিত হল জয়সিংহের উপরে। জয়সিংহ হয়ে উঠল তার প্রাণাধিক, তাই তো সে জয়সিংহকে বলে,

জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি।

জয়সিংহের কাছে অপর্ণার কত কথা বলবার আছে, কিন্তু সে তা বলতে পারে না। অন্যের অপমান সে অনায়াসে সহ্য করতে পারে, কিন্তু জয়সিংহের প্রত্যাখ্যান তার বুকে রূঢ় হয়ে বাজে, তার "ভেঙে পড়ে প্রাণ"। পাছে জয়সিংহ চলে যায়, এই তার সবসময় ভয়। কিন্তু তবু জয়সিংহ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেল। কিন্তু অপর্ণার প্রেম তো গেল না। সে প্রেম এখন গিয়ে পড়ল রঘুপতির উপর। তার প্রেমের স্পর্শ পেয়ে রঘুপতি উপলব্ধি করলেন,

পাষাণ ভাঙিয়া গেল—জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী!

এই নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র নক্ষত্ররায়। নক্ষত্ররায় দুর্বলপ্রকৃতি এবং স্বল্পবুদ্ধি লোক। তার কথাবার্তা ঠিক ভাঁড়ের মত। রাজা হবার লোভ তার আছে, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার সাহস তার নেই, সেইসঙ্গে তার মন থেকে ভ্রাতৃ-স্নেহও একেবারে নির্বাসিত হয় নি। একদিকে লোভ, অপরদিকে স্নেহ ও ভয়, এই দুই-এর মাঝখানে পড়ে নক্ষত্ররায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। তার এই দ্বিধাগ্রস্ত দোলায়িত ভাবটি বেশ ফুটেছে। নক্ষত্ররায়ের মেরুদণ্ডহীনতার জন্যই রঘুপতি ও গুণবতী নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন এবং মোগলেরা তাকে সামনে খাড়া করে গোবিন্দমাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে।

'বিসর্জন' নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও বেশ জীবন্তভাবে ফুটেছে। বিচক্ষণ মন্ত্রী, বিশ্বাসী অথচ ধর্মসংস্কারমগ্ন সেনাপতি নয়নরায়, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন চাঁদপাল—এঁদের চরিত্র তো ফুটেছেই, অন্যান্য ছোটখাট চরিত্রগুলি, যারা নাটকে একবার দেখা দিয়েছে, তারাও নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখে গেছে। এই নাটকের একাধিক দৃশ্যে জনতার অবতারণা করা হয়েছে। জনতার

কথাবার্তা ও আচরণ খুবই সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে যে লঘু রস সৃষ্ট হয়েছে, তা এই নাটকের সংঘাতের তীব্র উত্তেজনাকে অনেকখানি প্রশমিত করে প্রয়োজনীয় dramatic relief দিয়েছে।

এই নাটকের মধ্যে লিরিকের উপাদান খুব বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা নাটক রচনার সময়েই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি নাটকের উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন,

রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।"

নাটকে লিরিক-উপাদান কেন প্রাধান্য লাভ করেছে, তা উৎসর্গ-পত্র পড়লেই বোঝা যায়। এই নাটক রচনার সময়ে চার পাশের পরিবেশ কবির মনকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করেছিল, তাই তাঁর লেখণীও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় বায়ু-স্রোতে ভেসে আসা "গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর", "চারিদিকে পাখির কূজন", দূরে শিবের মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, কুসুমকুঞ্জে মৌমাছির গুঞ্জন, "তরুশিরে রাঙা রবি", মৃদুমন্দ সমীরণ, "মায়াচিত্রবৎ তরুলতা ছায়া-পথ", "চাঁদের অমিয়", তারাদের ভাষা এই সমস্তই এই সময়ে কবির মনকে ভরে রেখেছিল, তাঁর মনের মধ্যে তাই এই সময় লিরিকের সুরই অহরহ মূর্ছিত হত। তাঁর নাটকের মধ্যেও তা স্বতই আত্মপ্রকাশ করেছে।

এখন প্রশ্ন এই, 'বিসর্জন নাটকে লিরিক-ধর্মিতার বাহুল্য থাকায় তাকে নাটক বলতে "ক্রিটিক"দের আপত্তি হবার কারণ কী? তার কারণ, লিরিক বা গীতিকবিতার সঙ্গে নাটকের কয়েকটি বিষয়ে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। নাটক একান্তভাবে তন্ময় বা objective রচনা, কিন্তু লিরিক মন্ময় বা subjective রচনা। নাটকে নাট্যকারের নিজের মনের কথা অভিব্যক্তি লাভ করে না, সেখানে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে লোপ করে ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে নাটকের বক্তব্যকে প্রকাশ করেন; কিন্তু লিরিকে রচয়িতার মনের একান্ত নিজস্ব ভাব ও ভাবনাটুকুই রূপ পরিগ্রহ করে। দ্বিতীয়ত, লিরিকের মধ্যে একটি মাত্র সুর মূর্ছিত হয়, সে সুরটি একান্তই মৃদু। কিন্তু

নাটকে নানারকম সুরের সমাবেশ হয়, কোন সুর মৃদু, কোন সুর চড়া, কোন সুর লঘু, কোন সুর গভীর ; এই সমস্ত সুরের সমন্বয়সাধনের মধ্যেই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তৃতীয়ত, নিবিড় সংহতি ও দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন নাটকের বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে অবান্তর প্রসঙ্গ, অহেতুক উচ্ছ্বাস বা ঢিলাঢালা ধরণের ভাব স্থান পেলে নাটকের আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয় ; নাটকের চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাসংস্থাপন সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা সংযম থাকা চাই এবং নাটকের গঠনে একটা কাঠিন্য থাকা দরকার ; কিন্তু লিরিকের মধ্যে অনেকখানি উচ্ছ্বাস ও আত্মগত কল্পনা থাকে। তাই তরলতা ও শিথিলতাই লিরিকের রূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাটকের সঙ্গে লিরিকের এই মূলগত পার্থক্যের জন্য কোন নাটকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে লিরিক-উপাদান স্থান পেলে সে নাটক কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে পড়ে।

এখন, 'বিসর্জন' নাটকের লিরিক উপাদান মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে কিনা, সেই প্রশ্নটিই বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই নাটকের লিরিক-উপাদানের অধিকাংশই জয়সিংহ ও অপর্ণা—এই দুটি চরিত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। জয়সিংহের বহু উক্তিতে আত্মকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাস স্ফূর্ত হয়েছে। যেমন,

> কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
> বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
> নাহি আসে, দশ দিক জেগে ওঠে যদি
> দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
> সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
> বলে?

অথবা

> ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
> চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
> ভিখারিণী সখী মোর।—কে বলিল এই
> সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
> যেমন করেই যাই, দিবা-অবসানে
> পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে,

আচার-বিচার তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুলভ্রান্তি ভয় দুঃখসুখ,
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার!

এইসব উক্তি একান্তভাবে লিরিক-ধর্মী। যে তন্ময়তা বা objectivity নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা এই সমস্ত দীর্ঘ লিরিক-ধর্মী সংলাপের আধিক্যে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। নাটকের মধ্যে নাট্যকার সাধারণত নিজেকে আড়ালে রাখেন। কিন্তু জয়সিংহের এই সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই নিজের মনের ভাবনারাজি প্রকাশ লাভ করেছে। এই সমস্ত উক্তি যে জয়সিংহের বেনামীতে কবির নিজেরই কথা, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না। এর ফলেও নাটকের মূল ধর্ম কিছু পরিমাণে খর্ব হয়েছে।

অপর্ণার চরিত্রটিই একান্তভাবে লিরিক্যাল। অপর্ণার সঙ্গে বাস্তব জীবনের প্রায় কোন সম্পর্কই নেই। কবির কল্পনা যেন অপর্ণার মূর্তি ধরে নাটকে দেখা দিয়েছে। অপর্ণা প্রেম এবং গানের জীবন্ত বিগ্রহ। মনে হয়, কবিরা যুগে যুগে যে প্রেমের স্বপ্ন দেখেছেন, যে প্রেম একান্তভাবে মধুর, যার সুষমায় জগতের সমস্ত কাব্য রামধনু-রঙে রঙীন হয়ে ওঠে অথচ যে প্রেম বাস্তব জগতের কোথাও নেই, তাই রূপ ধরেছে অপর্ণার মধ্যে। ফলে অপর্ণা পরিপূর্ণভাবে একটি লিরিক-প্রতিমায় পরিণত হয়েছে।

জয়সিংহ ও অপর্ণার চরিত্র ছাড়া নাটকের অন্যত্র লিরিক-উপাদান খুব বেশী নেই, নাটকের গানগুলির মধ্যে এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে কিছু লিরিক-উপাদানের নিদর্শন মেলে।

'বিসর্জনে' যে সমস্ত লিরিক-উপাদান রয়েছে, সেগুলি নাটকটিকে খুব বেশী দুর্বল

করতে পারেনি। কারণ 'বিসর্জনে' লিরিক-উপাদানের তুলনায় সংঘাতের পরিমাণ অনেক বেশী। সংঘাত-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এর নাট্যরস জমে উঠেছে। সে সংঘাত খুবই তীব্র ধরণের। নাটকের লিরিক-উপাদানগুলি বরং সংঘাতের তীব্রতাকে স্থানে স্থানে প্রশমিত করে একান্ত প্রয়োজনীয় dramatic relief দিয়েছে। জয়সিংহের লিরিক্যাল উক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে তার ট্র্যাজেডিকে পরিস্ফুট করে তুলেছে ; এইখানেই তাদের সার্থকতা। তবে এই জাতীয় উক্তি স্থানে স্থানে খুব দীর্ঘ হওয়ায় নাট্যরস কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে 'বিসর্জন' নাটকের অন্যান্য দোষ সম্বন্ধেও আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, নাটকের সর্বশেষ দৃশ্যের শেষাংশটি নাটকটির উৎকর্ষ খানিকটা খর্ব করেছে। এর আগে আমরা আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে রঘুপতি, গুণবতী ও গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রের পরিণতিতে প্রকৃত ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষ দৃশ্যের শেষাংশে দেখি রঘুপতি অপর্ণাকে বলছেন,

জননী, জননী, জননী আমার !
পিতা ! এ তো নহে ভৎ´সনার নাম ! পিতা !
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা বলে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে। আহা, ডাক্ আরবার !

এবং

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !
জননী অমৃতময়ী !

তারপর, রাণী গুণবতী রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে বলছেন,

আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা।

এবং গোবিন্দমাণিক্য রাণীকে বলেছেন,

গেছে পাপ ! দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে !

রঘুপতির কাছে জীবনের অবলম্বন ছিল দেবী, গুণবতীর কাছে জীবনের অবলম্বন ছিল মা হওয়ার আশা এবং গোবিন্দমাণিক্যের কাছে জীবনের অবলম্বন ছিল রাজা হিসাবে তাঁর কর্তব্য। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনজনেই জীবনের এই অবলম্বনকে নিঃশেষে হারিয়েছেন, তারই ফলে তাঁদের চরিত্রে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উপরে রঘুপতি, গুণবতী ও গোবিন্দমাণিক্যের যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত করলাম, তার থেকে মনে হয়, সব হারানোর পরেও তাঁরা কিছু কিছু পেলেন ; রঘুপতি পেলেন অপর্ণাকে, রাজা পেলেন রাণীকে, রাণী পেলেন রাজাকে। এর ফলে ট্র্যাজেডির তীব্র বেদনা খানিকটা লঘু হয়ে গিয়েছে। 'বিসর্জন'এর এই একটি প্রধান ত্রুটি। তাছাড়া এঁদের এই পাওয়া, এটি নিতান্তই আকস্মিকভাবে দেখানো হয়েছে ; নাটকে সব ব্যাপারেরই পরিণতি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুনির্দিষ্ট process বা কার্যকারণপরম্পরার মধ্য দিয়ে আসা চাই। আলোচ্য ক্ষেত্রে এই সর্তটি পালিত হয়নি। রঘুপতির অপর্ণাকে পাওয়ার পিছনে কোন পূর্বপ্রস্তুতি নেই। রাণী ও রাজার ব্যাপারেও তা নেই ; তাঁদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হবার কথা অবশ্য নাটকে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা কোন সময়েই নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে নি। গোবিন্দমাণিক্যের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা রাণীর সঙ্গে মনান্তর নয়, রাজার কর্তব্য পালনে তাঁর যে বাধা আসছিল, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে তাঁকে যে সংগ্রাম করতে হচ্ছিল, তা'ই তাঁর প্রধান সমস্যা। এই সংগ্রামে তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছেন, পরাজয়ে তাঁর ক্ষোভ ও মর্মদাহ প্রকৃত ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করেছে, রাণীকে ফিরে পেয়ে তাঁর এই জ্বালা শান্ত হবার কথা নয়। সুতরাং শেষ দৃশ্যের শেষাংশটি নানা দিক দিয়েই ত্রুটিপূর্ণ। কার্যকারণপরম্পরার মধ্য দিয়ে আসে নি বলে এটিকে নাটকের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে হয়। রঘুপতির গোমতী নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন এবং গুণবতীর পূজা দিতে এসে দেবীকে দেখতে না পেয়ে নিরাশ হওয়া দেখাবার পরেই নাটকের যবনিকা-পতন হলে সব দিক দিয়ে সুষ্ঠু হত বলে মনে হয়।

আর এক দিক দিয়ে শেষ দৃশ্যের শেষ অংশে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এতে দেখি,

রঘুপতি গোমতীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন, একথা শুনে গুণবতী এবং গোবিন্দমাণিক্যের মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হল না, উপরন্তু গোবিন্দমাণিক্য বললেন, "গেছে পাপ"। কিন্তু গুণবতী ধর্মপ্রাণা নারী; গোবিন্দমাণিক্যের মনেও প্রতিমার দেবীত্বে বিশ্বাস ইতিপূর্বে কোন সময়ের জন্যই বিচলিত হয় নি, তিনি বারবার প্রতিমার চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাই তাঁদের এরকম আচরণ, বিশেষত গোবিন্দমাণিক্যের মুখে এই জাতীয় বিসদৃশ উক্তি মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। রঘুপতি চরম আঘাতের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রতিমা দেবী নয়, কিন্তু গোবিন্দ-মাণিক্য ও গুণবতী তো এরকম কোন আঘাত বা উপলব্ধি লাভ করেন নি। সুতরাং প্রতিমা বিসর্জনের সংবাদে তাঁদের ক্ষুব্ধ না হওয়া এবং গোবিন্দমাণিক্যের পক্ষে "গেছে পাপ" বলা অত্যন্ত খাপছাড়া লাগে। 'বিসর্জন' নাটকের অন্যান্য অংশে যে বাস্তববোধ ও সঙ্গতিবোধেব নিদর্শন পাওয়া যায়, শেষ দৃশ্যের শেষাংশে তার অভাব দেখা যায়। এই অংশটি অত্যন্ত রোমান্টিক, মূল নাটকের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক নেই এবং মূল নাটকের গুণগুলিকে এই অংশটি কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে।

ট্র্যাজেডির এক প্রধান শত্রু মেলোড্রামা। ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামা দুয়েরই পরিণতি করুণ, কিন্তু তাদের প্রকৃতিতে আমূল পার্থক্য রয়েছে। ট্র্যাজেডির মূলে থাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বেদনা, কিন্তু মেলোড্রামার উপজীব্য স্থূল বেদনা। ট্র্যাজেডির পরিণতি আসে সুব্যবস্থিত ও শিল্পসম্মত কার্যকারণপরম্পরার মধ্য দিয়ে, কিন্তু মেলোড্রামার পরিণতি আসে নিতান্ত. আকস্মিকভাবে। ট্র্যাজেডি পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের মনকে বিশুদ্ধ ও অনির্বচনীয় রসধারায় অভিসিঞ্চিত করে, কিন্তু মেলোড্রামা তাঁদেব মনে চমৎকৃতি উৎপাদন করে একটা নিতান্ত সুলভ ধরণের অগভীর করুণরস সৃষ্টি করে। এইজন্য কোন ট্র্যাজেডির মধ্যে যদি মেলোড্রামার ধর্ম প্রবেশ করে, তবে তা আর বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি থাকে না। 'বিসর্জন' যে প্রায় বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নাটকের পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে যে কিছু পরিমাণে মেলোড্রামার উপাদান প্রবেশ করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে জয়সিংহের উন্মত্তভাবে মন্দিরে প্রবেশ, দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান, তারপর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া—এ সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত আকস্মিক ও চমকপ্রদ ধরণের, এর জন্যে আমাদের মনকে প্রস্তুত

করে তোলা হয়নি। জয়সিংহের এই আকস্মিক আত্মহত্যার ঠিক পরেই অপর্ণার মন্দিরে প্রবেশ ও মূর্ছিত হয়ে পড়া এবং রঘুপতির "ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে" বলে চীৎকার—এর মধ্যেও রয়েছে সেই অতি-নাটকীয় ভাব। এই দৃশ্যটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে মেলোড্রামা-ধর্মী হয়ে পড়ায় 'বিসর্জনে'র ট্র্যাজেডির সূক্ষ্মতা সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

আরও কয়েকটি বিষয়ে এই নাটকে অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। এই নাটকে দেখি, রাণী গুণবতী নক্ষত্ররায়কে শিশু ধ্রুবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন এবং তাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন। একজন নারীর এরকম পৈশাচিক মনোভাব আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক লাগে। গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে বধের চেষ্টা করার জন্য রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়কে শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু গুণবতীকে তিনি কিছু বলেন নি; তিনি গুণবতীর এই গর্হিত অপরাধের কথা জানতে পারলেন না, এ ব্যাপার খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। তারপর, নাটকের প্রথম অংশে যে চাঁদপাল গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে এবং বিশ্বস্তভাবে কর্তব্যপালন করেছে, শেষ অংশে দেখানো হয়েছে সেই চাঁদপালই বিশ্বাসঘাতকতা করে মোগলদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করেছে; কিন্তু চাঁদপালের এই বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব-প্রস্তুতিহীন ও আকস্মিক, তার চরিত্র থেকে আগে এর কোন আভাসই পাওয়া যায় নি; তাই একেও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে জয়সিংহের রাজাকে হত্যা করতে আসা, প্রতিমার কাছে "মানবভাষায়, বল শীঘ্র—সত্যই কি রাজরক্ত চাই?" বলা, "চাই" শুনে বিশ্বাস করা, অতঃপর রাজাকে হত্যা করতে যাওয়া এবং রাজার কাছে রঘুপতির প্রতারণার কথা শুনে ছুরি ফেলে দিয়ে "ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা!" বলে চীৎকার করে ওঠা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে যেমন জয়সিংহের সরল বিশ্বাস মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে, তেমনি প্রকৃত কথা জানবার পর তার আচরণও খুব সুসমঞ্জস হয় নি। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে আর একটি ত্রুটি আছে, সেটি লেখকের অসাবধানতা বা মুদ্রাকর-প্রমাদের দরুণ ঘটেছে; ঐ দৃশ্যের শীর্ষে লেখা আছে,

"প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য ও নয়নরায়"

কিন্তু নয়নরায়ের এই দৃশ্যে কোন কথা বা কাজ নেই। উপরন্তু এই দৃশ্যে গোবিন্দমাণিক্য ও গুণবতীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ আলাপ দেখতে পাই, তা নয়নরায়ের সামনে হতে পারে না। সুতরাং নয়নরায়ের এই দৃশ্যে উপস্থিত থাকবার কথা নয়। নয়নরায় যে উপস্থিত ছিলেনও না, তা বোঝা যায় দৃশ্যের প্রথম অংশে গোবিন্দমাণিক্যের একক উক্তি এবং শেষ অংশে "ওরে কে আছিস ?—কেহ নাই ?" উক্তি থেকে। তবুও অনাবশ্যকভাবে দৃশ্যের শীর্ষকে নয়নরায়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

'বিসর্জন' নাটকের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। এখন আর কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করব। প্রথমে 'বিসর্জন' নাটকের নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে, তার বিচার করব। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, " 'বিসর্জন' এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে হয়েছে ? আমরা দেখতে পাই যে, নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু, এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর-এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।"

কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য আরও গভীর ও ব্যাপক। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র যে সমস্ত সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, তার ফলে তাদের জীবনে এক জটিল সঙ্কট ও ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে ; এই সঙ্কটের পরিণতি ঘটেছে তাদের পরাজয় বরণের মধ্যে এবং চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকারের সময় প্রত্যেককেই বিসর্জন দিতে হয়েছে তার জীবনের প্রধান অবলম্বনকে। এই সংঘাত ও সংকটের ফলে জয়সিংহ জীবনের প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে এবং তারই পরিণামে সে বিসর্জন দিয়েছে নিজের প্রাণ। গোবিন্দমাণিক্য রাজার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রীতি পদে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, পেয়েছেন নিষ্ঠুর আঘাত, তাতে তাঁর মন ভেঙ্গে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে। গুণবতী নিজের অন্তরের কামনা পূর্ণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বারবার তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়েছেন এবং তার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত অন্তরের সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়েছেন। জয়সিংহের আত্মবিসর্জন রঘুপতির মনে যে ভূমিকম্পের মত দুর্বার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তার ফলে তাঁর সারাজীবনের ধ্যানজ্ঞানতপস্যা দেবীর প্রতি সমস্ত ভক্তি ও বিশ্বাস মন থেকে মুছে

গিয়েছে, তিনি দেবীকে হৃদয় থেকে তখনই বিসর্জন দিয়েছেন, পরে তাঁর গোমতী-জলে দেবীপ্রতিমা বিসর্জন একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই রকম নানা ধরণের "বিসর্জন"-এর মধ্য দিয়ে এই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাই এর নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক।

এরপর আর একটি প্রশ্নের বিচার করতে হবে। সেটি এই, 'বিসর্জন' নাটকের নায়ক কে?

কোন্ চরিত্রকে নাটকের নায়ক বলা উচিত, সে সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্য-শাস্ত্রের নির্দেশ ঠিক এক নয়। অবশ্য নাটকের প্রধান চরিত্রই যে নাটকের নায়ক-পদবাচ্য, এ সম্বন্ধে দুই নাট্যশাস্ত্রই একমত। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের মতে ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত এই চার প্রকৃতির ব্যক্তিরাই কেবলমাত্র নাটকের নায়ক হতে পারেন এবং নাটকের নায়ককে সর্বগুণযুক্ত ও সর্বদোষশূন্য হতে হবে। কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে কোনও ধরণের লোককেই, এমন কি দুর্বৃত্তকেও নাটকের নায়ক হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় নি। নাটকের নায়ক সর্বগুণান্বিত ও সর্বদোষশূন্য হবে, এরকম কল্পনা পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রের মূল নীতিবই বিরোধী, কারণ ঐ নাট্যশাস্ত্রের একটি বড় কথা এই যে নাটকের চরিত্রকে স্বাভাবিক মানুষের মত হতে হবে, স্বাভাবিক মানুষ যেমন অবিমিশ্র দোষে বা অবিমিশ্র গুণে গঠিত হয় না, তার দোষ ও গুণ দুইই থাকে, তেমনি নাটকের চরিত্রের মধ্যেও দোষ আর গুণের সমাবেশ দেখাতে হবে। একথা অন্য চরিত্র সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য, নাটকের নায়ক সম্বন্ধে তার চেয়ে আরও বেশী প্রযোজ্য। অবশ্য প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশের 'সর্বগুণ' অর্থে যদি 'সর্ব নাটকীয় গুণ' এবং 'সর্ব দোষ' অর্থে 'সর্ব নাটকীয় দোষ' ধরি, তাহলে এই নির্দেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশের সামঞ্জস্য করা যায়, তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, যে যে গুণ থাকলে নাটকের চরিত্র জীবন্ত হয়—যথা স্বাভাবিকতা, নানা প্রবৃত্তির সমাবেশ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি —সে সমস্ত নাটকের নায়ক-চরিত্রে থাকা চাই, এবং যে সমস্ত দোষ থাকলে নাটকের চরিত্র দুর্বল হয়—যেমন উচ্ছ্বাস, আড়ষ্টতা, কৃত্রিমতা প্রভৃতি—সেগুলি নায়ক-চরিত্রে একেবারেই থাকবে না। পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রের মতে নাটকের নায়ক শুধু নাটকের প্রধান চরিত্র হবেন না, তাঁকে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে হবে। তিনি নাটকের প্রধান ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাঁকে অবলম্বন করেই নাটকের অন্যান্য

চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, . যেমন ভাবে সূর্যের আলোয় সৌরজগতের গ্রহগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে।

পূর্ব ও পশ্চিমের নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশের এই মূলগত পার্থক্যের কারণ, দুই দেশের নাটক মূলত ভিন্ন প্রকৃতির। সংস্কৃত নাটক বিশেষভাবে কাব্যধর্মী আর ইউরোপীয় নাটক বিশেষভাবে গতিধর্মী। সংস্কৃত নাটকের প্রাণ কাব্যসৌন্দর্য, কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকের প্রাণ ক্রিয়া বা action। পাশ্চাত্য নাটকের মধ্যে দেখি বিদ্যুতের মত গতিশীল সৌন্দর্য আর প্রাচ্য নাটকে দেখি পদ্মফুলের মত স্থির সৌন্দর্য।

'বিসর্জন' নাটকে আমরা এই দুই ধরণের সৌন্দর্যেরই সমন্বয় দেখতে পাই। তবে নাটকটির ভিতরের দুর্বার গতি ও সংঘাত তার অন্যান্য গুণকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তাই 'বিসর্জন' নাটকের নায়ক কে, সে প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে পাশ্চাত্য নাট্য-শাস্ত্রেরই সূত্র অবলম্বন করে।

এই সূত্র অনুসরণ করলে আমরা দেখি, গোবিন্দমাণিক্যের নাটকের নায়ক বলে অভিহিত হবার কিছু দাবী রয়েছে। কারণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব সমগ্র নাটকটিকে আচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে। সংস্কার ও প্রেম—এই দুই পক্ষের সংঘাতই নাটকটির প্রাণ। সেই সংঘাতের সূচনা করেছেন গোবিন্দমাণিক্য, দেবীর মন্দিরে বলি বন্ধের আদেশ দিয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি নাটকের ঘটনাবলীকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণও করেছেন। তাঁরই বিভিন্ন কার্যের ফলে নাটকের বিভিন্ন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তিনি বলি বন্ধের আদেশ দেওয়াতে রঘুপতি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন, তিনি মন্দিরে উপস্থিত হয়ে বলি বন্ধ করায় রঘুপতির মনে জাতক্রোধ সৃষ্টি হল এবং অন্য অনেকেও তাঁর বিরোধী হয়ে উঠল। শেষে গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়কে শাস্তি দেওয়ায় নাটকের চরম সঙ্কট—জয়সিংহের আত্মবিসর্জন ও তাঁর নিজের রাজ্যচ্যুতি —উপস্থিত হল। গোবিন্দমাণিক্যের ট্র্যাজেডি যখন চরম পরিণতি লাভ করল, তারপরে নাটকও আর এগোল না, সেইখানেই শেষ হয়ে গেল। প্রাচ্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দেশও গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে অনেকখানি প্রযোজ্য, তিনি ধীরোদাত্ত প্রকৃতির ও প্রায় সর্বগুণযুক্ত। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে গোবিন্দমাণিক্যকে নাটকের নায়ক বলার প্রবণতা আসতে পারে।

কিন্তু এই ব্যাপারে জয়সিংহের দাবীও কম নয়। কারণ নাটকের নায়ক চরিত্রের

মধ্যে একটা ক্রমবিকাশও আমরা আশা করি। নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নায়ক-চরিত্র শতদলের মত পাপ্‌ড়ি মেলে ফুটে উঠতে থাকে। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে বিশেষ কোন ক্রমবিকাশ দেখা যায় না, তাঁর চরিত্র নাটকের প্রথমে যা ছিল, শেষেও প্রায় তা'ই রয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে জয়সিংহ চরিত্রে ক্রমবিকাশ দেখা যায়। নাটক যতই অগ্রসর হয়েছে, জয়সিংহের চরিত্র ততই নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উন্মীলিত হয়ে উঠেছে। প্রথমে সে ছিল গুরুভক্তিপরায়ণ ও সংস্কারমগ্ন, পরে অপর্ণা ও গোবিন্দমাণিক্যের সংস্পর্শে এসে সে জানল প্রেম কাকে বলে, তারপর মানুষের হিংস্রতা, নীচতা ও স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সে অবহিত হল এবং গুরুর প্রতি তার ভক্তিও চলে গেল। তারপরে তার সংস্কারের ভিত্তিমূলই উৎপাটিত হয়ে গেল, সে জানল দেবী নেই। শেষে জয়সিংহ জীবনের প্রতি সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল এবং নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করল। সুতরাং জয়সিংহের চরিত্রে এই দিক দিয়ে নায়কোচিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, জয়সিংহের চরিত্রে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে ; কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তা নেই, তিনি একবার যখন বুঝেছেন যে দেবীর কাছে জীবনবলি দেওয়া পাপ, তখনই তা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে আর কোন দ্বন্দ্ব বা সংশয় তাঁর মনে দেখা দেয়নি। কাজেই জয়সিংহ চরিত্র কোন কোন দিক্ দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের তুলনায় বেশী নাটকীয় গুণে মণ্ডিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। জয়সিংহের আরও দু'দিক দিয়ে নায়কপদবাচ্য হবার দাবী রয়েছে ; প্রথমত, তার আত্মবিসর্জনই 'বিসর্জন' নাটকের সর্বপ্রধান ঘটনা এবং এই ঘটনাটিতেই নাটকের climax বা চরম মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে , দ্বিতীয়ত, এই নাটকে একটি প্রেম-কাহিনী আছে এবং তা অপরিস্ফুট হলেও নাটকের প্রাণরসকে ধারণ করে আছে ; এই প্রেম-কাহিনীর নায়ক জয়সিংহ। সুতরাং জয়সিংহকে যদি কেউ 'বিসর্জনে'র নায়ক বলতে চান, তবে তা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু জয়সিংহের চরিত্রে নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে রঘুপতির দাবীকেও উপেক্ষা করা চলে না। কারণ এই নাটকের সবচেয়ে জীবন্ত ও শক্তিশালী চরিত্র রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহ তাঁর তুলনায় নিষ্প্রভ। জয়সিংহের মত রঘুপতির চরিত্রেও আগুন্ত একটা ক্রমবিকাশ দেখা যায়। নাটক যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই তাঁর রোষ, তেজ, সংকল্পের দৃঢ়তা, ছলে বলে কৌশলে

উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার নীতি প্রভৃতি গুণগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছে। নাটকের সুরুতে যে রঘুপতি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, নাটকের শেষে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। রঘুপতির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নাটক সমাপ্ত হয়েছে। রঘুপতিকে 'বিসর্জন' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রও বলা যায়। কারণ এই নাটকে দুটি ধারা আছে—গোবিন্দ-মাণিক্য-ধারা ও জয়সিংহ-ধারা; দুটি ধারাতেই রঘুপতির বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তিনিই দুটি ধারার সংযোগ রক্ষা করেছেন। তাই রঘুপতিকেও নাটকের নায়ক বলার প্রবৃত্তি হওয়া অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রঘুপতির দাবীর বিপক্ষে একটা কথা বলা যায় যে, তিনি গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহের তুলনায় নাটকের ঘটনা কম নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

আমাদের আলোচনার ফলে দেখা গেল যে 'বিসর্জন' নাটকের তিনটি চরিত্রেই নায়কত্বের কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু সমস্ত লক্ষণ কোন চরিত্রের মধ্যেই নেই। এইজন্য, এদের কাউকেই নাটকের নাটক বলা যায় না। সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, 'বিসর্জন' নাটকের কোন নায়ক নেই। আসলে, এরকম কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে, প্রত্যেক নাটকেরই একজন করে নায়ক থাকতে হবে। আধুনিক যুগের বহু নাটকেই কোন নায়ক থাকে না, বার্নার্ড শ'র অনেক নাটকে কোন নায়ক নেই। নাটকের নায়ক জিনিসটাই যেন আধুনিক কালের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায় না। নাটকের নায়ক যেন রাজার মত; রাজা যেমন তাঁর রাজ্যে সর্বেশ্বর এবং অন্য লোকরা তাঁর অনুগত, নাটকেও তেমনি নায়ক-চরিত্রই সর্বপ্রধান এবং অন্য চরিত্রগুলি গৌণ, তারা নায়ক-চরিত্রকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক যুগে পৃথিবীতে রাজতন্ত্র প্রায় বিলুপ্ত, তার জায়গায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সেই রকম, প্রাচীন যুগের প্রত্যেক নাটকে যেমন একজন নায়ক থাকা অপরিহার্য ছিল, আধুনিক যুগের নাটকে তা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয় না। 'বিসর্জন' আজ থেকে সাত দশকেরও কয়েক বছর আগে রচিত, কিন্তু তার মধ্যে আধুনিক নাটকের এই বৈশিষ্ট্যটি আছে, এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়।

'বিসর্জন' নাটকের বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের পরিশিষ্টে "শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন'-অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কথিত" যে ব্যাখ্যাটি মুদ্রিত হয়েছে, তার কিছু কিছু

অংশ ইতিপূর্বেই আমরা উদ্ধৃত করেছি এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন এই ব্যাখ্যাটি সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলব। এই ব্যাখ্যার মধ্যে নতুন এবং সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয় যথেষ্টই মেলে। কিন্তু এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন কোন কোন কথা বলেছেন, যার সমর্থন 'বিসর্জন' নাটকে পাওয়া যায় না। যেমন, এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'রানীর (গুণবতীর) মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে, তিনি জানছেন, ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হতে পারে যে তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে, আবার অপর পক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।'

তার পর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে, 'তুমি যদি এক দিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণেব আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালন পালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তাব জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও? বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণীহত্যায় খুশি হন? যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ ভিক্ষা তাঁব কাছে করছ?'

কিন্তু নাটকের প্রথম অঙ্কে অথবা অন্য কোন জায়গায় অপর্ণা গুণবতীকে কিছুই বোঝায়নি। সমগ্র নাটকের মধ্যে কোথাও অপর্ণার সঙ্গে গুণবতীব কোন আলাপ হয়নি এবং তারা পরস্পবের সম্বন্ধে কারও কাছে কোন কথা বলেনি বা শোনেনি, শেষ দৃশ্যের সর্বশেষ অংশ ছাড়া নাটকেব আব কোথাও তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়নি, ঐ সাক্ষাতের সময়ও তাদেব মধ্যে কোন কথা হয়নি এবং তার আগেই গুণবতী চবিত্রেব পরিণতি ঘটে গেছে। সুতরাং উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য বোঝা গেল না।

এই ব্যাখ্যারই শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রঘুপতি পণ্ডিত, বৃদ্ধ, সম্মানিত ও শক্তিশালী। আর অপর্ণা বালিকা, ভিখারিণী ও সমাজে অখ্যাত। কিন্তু, যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে।" এই উক্তিও সমর্থন করা যায় না, কারণ অপর্ণার চরিত্রের মধ্যে ক্রিয়া বা action এত অল্প যে তাকে রঘুপতির প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কখনই মনে হয় না। আর এই নাটকে কোন শক্তি যে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জয়ী হয়নি, তা আমরা আগেই আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এই ব্যাখ্যা পড়লে মনে হয়, বিসর্জনের স্রষ্টার মনে যে প্রেরণা কাজ করেছিল তাকে এই ব্যাখ্যার রচয়িতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নি; সময়ের ব্যবধানে মনের রূপান্তর ঘটে যাওয়ার জন্যই এরকম হয়েছে। এই ব্যাখ্যা দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে যে সমস্ত নতুন নতুন চিন্তা জাগ্রত হয়েছিল, সেগুলিকেই তিনি এর মধ্যে ব্যক্ত করেছেন; সব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা মূলের অপেক্ষা রাখেনি এবং বিসর্জন নাটকের আসল সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের অনেকখানিই এই সময়ে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

শারদোৎসব

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। বিভিন্ন ঋতুর আগমনে প্রকৃতি যে বিচিত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়, তাকে তিনি অজস্র ভঙ্গিতে তাঁর কবিতায়, গানে, কথাসাহিত্যে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্যেও তিনি প্রকৃতির উপর বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অচলায়তন' নাটকে গ্রীষ্ম ঋতু, 'শ্রাবণগাথা' ও 'শেষ বর্ষণ' নাটকে বর্ষা ঋতু, 'রক্তকরবী' নাটকে শীত ঋতু, এবং 'রাজা', 'রাজা ও রাণী', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটকে বসন্ত ঋতু তাদের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও অন্তর্নিহিত আবেদন নিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

'শারদোৎসব' নাটকে রবীন্দ্রনাথ শরৎ ঋতুর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁর এই রূপদানের মধ্যে একটি অভিনবত্ব আছে। তাঁর কাছে প্রকৃতি জড় পদার্থ নয়, একটি প্রাণবন্ত সত্তা, মানুষের অন্তরের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক, বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি মানুষের কাছে নতুন নতুন বাণী পাঠায়। 'শারদোৎসব' নাটকে রবীন্দ্রনাথ শরৎ ঋতুর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ ঋতুর বাণীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

শরৎ ঋতুর সৌন্দর্য নাটকটির মধ্যে যে ভাবে স্ফূর্ত হয়েছে, প্রথমে তার পরিচয় দেওয়া যাক। শরতের আগমনে পৃথিবীতে একটি অপূর্ব আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। শরতের নির্মল আকাশ, সোনালী রৌদ্র, ফুলে ফুলে ভরা ধরণী, কানায় কানায় ভরা নদী এই সমস্ত মিলে প্রকৃতিকে রাণীর সাজে সাজিয়ে তোলে। শারদোৎসব নাটকেও এই অফুরন্ত সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। মেঘের কোলে যখন রোদ হেসে উঠল তখন ছেলেরা খেলায় মেতে উঠল বেতসিনী নদীর তীরে। যেমন সুন্দর নদী, তেমনি সুন্দর নাম। এই যে সুন্দর শরতের মুক্ত আনন্দ উপভোগের বর্ণনা দিয়ে নাটকের সুরু হয়েছে, নাটকের অবশিষ্ট অংশেও সেই সুর অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছে।

শরৎ ঋতুর সুরটি একান্তভাবে ছুটির সুর। তাই দেখি নাটকের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে লেগেছে ছুটির নেশা। ছেলের দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বেতসিনী নদীর তীরে গিয়ে ছুটি উপভোগ করছে। ঠাকুরদাদা জীবনের কর্তব্য থেকে চিরদিনের মত ছুটি

নিয়েছেন। বিজয়াদিত্য তাঁর রাজকার্য থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। উপনন্দ পংক্তির পর পংক্তি লিখছে আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছে। রাজা সোমপাল রাজ্যের মধ্যে বসে থাকতে পারছেন না, তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে চান। লক্ষেশ্বরের ছেলে ধনপতিও বাপেব কাছে ছুটি চায়। এমন কি স্বয়ং লক্ষেশ্বরেরও শরতের দিনে ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছে না, সেও বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে পড়বার জন্মে ব্যগ্র।

কিন্তু 'শারদোৎসব' নাটকে শরতের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার অন্তরালে রয়ে গেছে শরৎ ঋতুর মূল তত্ত্বটুকু। শরতেব এই অফুরন্ত সৌন্দর্যের হেতু কী? এই হেতুই আবিষ্কার করেছেন এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সন্ন্যাসিরূপী রাজা বিজয়াদিত্য। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে এই সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে জগৎ বিধাতার কাছে তার আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বিধাতা পৃথিবীকে দিয়েছেন অফুরন্ত আনন্দ। সে ঋণ পৃথিবী কী করে শোধ করতে পারে? কী তার দেবার আছে? তাব আছে কেবলমাত্র সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যেরই ভাণ্ডার উজাড় কবে নিজেকে সাজিয়ে পৃথিবী এই শরৎ ঋতুকে নিজেকে ভগবানের কাছে নিবেদন করছে। কিন্তু এই টুকুতেই তার ঋণ শোধ হত না, যদি না এর পিছনে থাকত পৃথিবীব দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করার ইতিহাস। গ্রীষ্মের প্রখর দাহ এবং বর্ষার অবিরাম বষণে প্রকৃতি এই ক্লেশ সহ্য করে এবং এই কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েই সে বিধাতার ঋণ শোধ করতে পারে। এই কৃচ্ছ্রসাধন না থাকলে বিধাতার দানেব কাছে পৃথিবীর প্রতিদান একান্ত তুচ্ছ হয়ে যেত, তার ঋণ শোধ হত না।

এই ঋণশোধের তত্ত্বটিকে আরও পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে উপনন্দেব কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এই নাটকে আমরা দেখি যখন সব ছেলেরা ছুটির আনন্দে মত্ত, সেই সময় বালক উপনন্দ কঠোর পরিশ্রম করে তার প্রভুর ঋণ শোধ করছে। পৃথিবী যেমন ভগবানের কাছে ভালবাসার ঋণে আবদ্ধ, উপনন্দও তেমনি তার প্রভুর কাছে প্রেমের ঋণে বন্দী। প্রভু লক্ষেশ্বরের কাছে যে ঋণ করেছিলেন, উপনন্দ অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে তা শোধ করছে। এর মধ্য দিয়ে উপনন্দ আসলে প্রভুর প্রতি তার প্রেমের ঋণই শোধ করছে। এই ঋণশোধের পিছনে তার যে ত্যাগ রয়েছে, তা'ই শরৎ ঋতুর মাধুর্য, মহিমা ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে সার্থক ও উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে।

এই নাটকের ভাব ও ভাষা শরৎ ঋতুর বিশিষ্ট রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে কম সাহায্য করেনি। এই নাটকের সংলাপের মধ্যে কোথাও কোন গাম্ভীর্য নেই। সর্বত্রই একটা লঘু ও স্বচ্ছন্দ ভাব। এ যেন শরতের হাল্কা রূপটিরই সার্থক প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে ছেলের দলের ছেলেমানুষী বর্ণনার মধ্য দিয়েও শরতের লঘু রূপটিকেই আভাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে আগাগোড়াই একটা লঘু অথচ নির্মল হাস্যরসের স্পর্শ রয়েছে। লক্ষেশ্বরের কৃপণতা এবং তার বিভিন্ন হাস্যকর উক্তি, গ্রামের লোকদের সরলতা ও নির্বুদ্ধিতা, রাজা সোমপালের দিগ্বিজয়ের আগ্রহ ও শেষে ভয় পাওয়া—সমস্তই অনাবিল স্নিগ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। নাটকটির স্বচ্ছন্দ বর্ণনার মধ্যে এই শুভ্র হাস্যরসের স্পর্শ—এ যেন শরতের নির্মল আকাশে শুভ্র মেঘের সমাবেশ। ভাব ও ভাষা বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযোগী হওয়াতে এই নাটকটি এমন পরিপূর্ণভাবে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

এখন আমরা 'শারদোৎসব' নাটকের চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

নাটকের সঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার একটা মূলগত প্রভেদ আছে। অন্য শাখাগুলিতে লেখক তাঁর বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে বর্ণনার আশ্রয় নেন। কিন্তু নাটকে তাঁর সে সুযোগ থাকে না। নাটকে লেখককে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে হয় বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে। কাজেই চরিত্রগুলি হচ্ছে নাটকের রস সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। এই কারণেই কাব্য বা উপন্যাসের তুলনায় নাটকে চরিত্র সৃষ্টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চরিত্র সৃষ্টিতে সাফল্যের উপরে নাটকের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বৈচিত্র্যই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান উপাদান। নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হলে প্রথমে চরিত্রগুলিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু নাটকের চরিত্র সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রধান কথা এই যে তাকে জীবন্ত হতে হবে অর্থাৎ নাটকের চরিত্রকে এমনভাবে অঙ্কন করতে হবে, যাতে তাকে বাস্তব জগতের মানুষ বলে মনে হয়। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এই সমস্ত গুণ স্ফূর্ত হলে তবেই নাট্যকার চরিত্রসৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করেছেন বলা চলবে।

'শারদোৎসব' নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে কি না এখন তার বিচার করা দরকার। এই নাটকের চরিত্রগুলির ভিতরে প্রধান হচ্ছে ঠাকুরদাদা, বিজয়াদিত্য, উপনন্দ এবং লক্ষেশ্বর।* এদের মধ্যে ঠাকুরদাদা মুক্ত পুরুষ। তিনি জীবনের গুরুতর দিকটার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন। অনেকদিন তিনি সংসারের হিসাব-নিকাশ নিয়ে কাটিয়েছিলেন। এখন তার অসারতা বুঝতে পেরে তিনি তার পাঠ চুকিয়ে দিয়েছেন এবং বয়সের হিসাবে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের গরমিল করে তিনি ছেলের দলের সঙ্গে মিশে মুক্ত শরৎ-প্রকৃতির মাধুর্য উপভোগের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। ঠাকুরদাদার কাছে জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ আনন্দ এবং প্রকৃতির উন্মুক্ত মাধুর্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। তাঁর কথাবার্তাও হাল্কা ধরণের। সকলেরই তিনি ঠাকুরদাদা। এমন কি বিজয়াদিত্যের সঙ্গেও তাঁর এই একই সম্পর্ক। সকলের সঙ্গেই তাঁর রসিকতার সম্বন্ধ।

বিজয়াদিত্যেব চরিত্রের সঙ্গে ঠাকুরদাদার চরিত্রের কতকটা মিল আছে। বিজয়াদিত্যও মুক্ত পুরুষ। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের সম্ভোগকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলে মনে করেন। এই আনন্দের সন্ধানেই তিনি গুরুভার রাজকর্তব্যকে পিছনে ফেলে রেখে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে পথে বেরিয়ে পড়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ঠাকুরদাদা ও ছেলের দলের সঙ্গে মিশে এই আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন। বিজয়াদিত্য শুধু যে প্রকৃতিব রসিক তা নয়, তিনি বাক্যরসিকও। তাঁর অধিকাংশ কথারই ছুটি করে অর্থ আছে। একটি অর্থ সর্বসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট এবং আরেকটি গূঢ় অর্থ। এই হল বিজয়াদিত্যের চরিত্রের একদিক। কিন্তু তাঁর চরিত্রের আর একটা দিকও আছে। সেদিকটা ঠাকুরদাদার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। বিজয়াদিত্য কেবল আনন্দবাদী নন। তিনি দার্শনিক। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে জীবনে দুঃখ ও আনন্দ দুইই আছে। এই জন্যই ঠাকুরদাদা যখন গান করেন "আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান"—সে গান বিজয়াদিত্যের ভাল লাগে না। কারণ দুঃখকে বাদ দিয়ে কেবল আনন্দের কথা বললে জীবনের মাত্র একটা দিক দেখানো হয়। দুঃখ আছে বলেই তো আনন্দকে এত মধুর লাগে; আর দুঃখের মধ্যেই তো মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়। তাই বিজয়াদিত্য গান "তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।" তাই দেখি ঠাকুরদাদা যখন শরৎ

ঋতুর আনন্দরস আস্বাদনে বিভোর, তখন বিজয়াদিত্য তার মধ্য থেকে এক গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করছেন। বিজয়াদিত্যের মধ্যে আনন্দমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উভয়ের সুষ্ঠু সম্মিলন ঘটেছে।

উপনন্দের চরিত্র অত্যন্ত মধুর। তার কর্তব্যনিষ্ঠা অতুলনীয়। শরতের আবির্ভাবে যখন সকলেই আনন্দ উপভোগ করছে, সেই সময় সে একা কর্তব্যের অনুরোধে নিজেকে মুক্তি থেকে বঞ্চিত করে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তার প্রভুর ঋণশোধ করতে বসেছে। বয়স তার নিতান্তই অল্প—ছেলের দলের প্রায় সমানই। কিন্তু তার কথাবার্তার মধ্যে বালসুলভ মাধুর্য থাকলেও বালসুলভ চাপল্য এতটুকু নেই। তার মধ্যে প্রবীণ লোকের মত একটা গাম্ভীর্য দেখা যায়। অল্প বয়সেই কঠোর দুঃখের অভিজ্ঞতা তাকে বয়সের তুলনায় গম্ভীর করে তুলেছে এবং তার কথাবার্তায় একটা জ্ঞানের দীপ্তি এনে দিয়েছে। উপনন্দ নম্র ও বিনয়ী। কিন্তু সে তেজস্বী। লক্ষেশ্বরের ভীতিপ্রদর্শন ও কটূক্তি সে সহ্য করে না। লক্ষেশ্বর যখন সন্ন্যাসীকে হীন ভাষায় কটূক্তি করল, তখন উপনন্দ ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফণা উঁচু করে দাঁড়াল।

এই নাটকের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র হচ্ছে লক্ষেশ্বর। সে অন্য চরিত্রগুলির তুলনায় ভিন্ন ধরণের, এমনকি ভিন্ন জগতের লোক। অর্থ ছাড়া অন্য কিছুই সে চেনে না। জীবনের সহজ মুক্ত আনন্দের কোন দামই তার কাছে নেই। তাই "দিন" যে কী করে সুন্দর হতে পারে তা সে বুঝতে পারে না। তার দৃষ্টি একান্ত স্থূল। সন্ন্যাসী যখন লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম খোঁজবার কথা বলেছেন তখন সে তাঁর কথাকে আক্ষরিকভাবে সত্য বলে ভেবেছে 'এবং এই কাজে সে সন্ন্যাসীর অংশীদার হতে চেয়েছে। এই অতি স্থূল দৃষ্টির জন্যে লক্ষেশ্বরের কথাবার্তা একান্তই হাস্যকর হয়ে পড়েছে। এই নাটকে সে বিশেষ ভাবে হাস্যরসের উপাদান জুগিয়েছে। কিন্তু সত্যের খাতিরে এ কথাও বলতে হয় যে লক্ষেশ্বরই এই নাটকের একমাত্র বাস্তব চরিত্র। আর সমস্ত প্রধান চরিত্র আদর্শবাদের আলোকে উদ্ভাসিত। শেষ পর্যন্ত লক্ষেশ্বরের চরিত্রে কোন পরিবর্তন না দেখিয়ে নাট্যকার বাস্তবতার মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সোমপালের রাজ্যলোভ, ছেলের দলের ছেলেমানুষী এবং গ্রামের লোকদের মূর্খতার চিত্র যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, তার থেকে

নাট্যকারের চরিত্রসৃজন-নৈপুণ্যই প্রমাণিত হয়। মোটের উপর 'শারদোৎসব' নাটকের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলি বিচার করলে আমরা দেখতে পাই এগুলি বৈচিত্র্যে ভরপুর। চরিত্রের এই বৈচিত্র্যই নাটকখানিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

'শারদোৎসব' নাটক যে পরিপূর্ণভাবে সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠেছে, তার পিছনে এই নাটকের গানগুলিরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এখন আমরা এই গানগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

আদিকাল থেকেই নাটকে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাটক বিবৃতিধর্মী সাহিত্য নয়। তার মধ্যে লেখক আত্মপ্রকাশ করবার বা বর্ণনা দিয়ে নাটকের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার কোন সুযোগ পান না। নাটকের সঙ্গীতাংশ তাই পাঠক বা দর্শকদের চিত্তবিনোদন করা ছাড়াও আরও একটি বড় কাজ করে। নাটকের বক্তব্যের যে অংশ চরিত্রগুলির সংলাপের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয় না, তা গানগুলির মধ্য দিয়ে অনেকখানি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে এই সত্য আরও সার্থক ভাবে প্রযোজ্য। কারণ রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকার। তাই তিনি যখন নাটকের বক্তব্যকে স্ফূর্ত করে তোলার জন্য গানের আশ্রয় নেন তখন তাঁর প্রচেষ্টা অনায়াসেই সার্থকতা লাভ করে।

'শারদোৎসব' নাটকে অনেকগুলি গান আছে। ভাষায় ও ভাবে গানগুলির সৌন্দর্য অসামান্য। কিন্তু এই সৌন্দর্যই এদের সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। নাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে এদেরই মধ্য দিয়ে রূপ দিয়েছেন। নাটকের পটভূমিকা, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও বিভিন্ন চরিত্রের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য এই গানগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। গানগুলির প্রকৃত সার্থকতা এইখানেই।

শারদোৎসব নাটকের উদ্বোধনী সঙ্গীত "আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি"। এই গানের মধ্য দিয়ে শরতের মূল বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে। শরতের সৌন্দর্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার উন্মুক্ততা। বর্ষাকালে প্রকৃতি যে মেঘের বসন পরেছিল, শরতে সে তা ঘুচিয়ে ফেলে পরিপূর্ণ উন্মুক্ত সৌন্দর্য নিয়ে সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শরতের আনন্দ তাই উন্মুক্ত আনন্দ। সেই আনন্দে যোগ দেওয়ার জন্য কবি সকলকে ডাক দিয়েছেন। এর পরের দুটি গান "মেঘের

কোলে রোদ হেসেছে” ও “আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়” এই উন্মুক্ত আনন্দকেই আরও সহজ ও মধুর বর্ণনার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। এই দুটি গান ছেলের দলের মুখে দেওয়া হয়েছে, তাই এদের ভাষা এত সহজ ও অনাড়ম্বর। এর পরে আমরা ঠাকুরদাদার কণ্ঠে “আনন্দেরি সাগর থেকে” গানটি শুনতে পাই। এই গান সন্ন্যাসীর পছন্দ হল না। তিনি তাই গাইলেন “তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার”। দুটি গানেরই সৌন্দর্য অসাধারণ। জীবনের মুক্ত আনন্দের মধ্যে যে একটা স্বচ্ছন্দ বাঁধনহারা দুঃখভোলা ভাব রয়েছে, তা প্রথম গানটির মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আনন্দই জীবনের একমাত্র উপাদান নয়, সেই সঙ্গে দুঃখও আছে। জীবনে দুঃখেরও মূল্য আছে। দুঃখ আছে বলেই আনন্দ এত মধুর। সেইজন্যে দ্বিতীয় গানটিতে দুঃখের মহিমা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই দুটি গানের মধ্য দিয়ে ঠাকুরদাদা ও বিজয়াদিত্যের চরিত্রের পার্থক্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

নাটকের অবশিষ্ট গানগুলিব মধ্যে “আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ”, “লেগেছে অমল ধবল পালে” এবং “আমার নয়ন-ভুলানো এলে” এই তিনটি গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরতের অপার্থিব সৌন্দর্যেব মধ্য দিয়ে আমাদের মনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। আমাদের মনের নিভৃত প্রদেশে একটি আনন্দেব লোক রয়েছে, আমরা তার খবর জানি না। শরৎলক্ষ্মীর পদার্পণে সেই গোপন আনন্দলোকের দ্বার খুলে যায়। তখন আমাদের মন থেকে সমস্ত চিন্তা হতাশা বিষাদ দূর হয়ে সেই স্বর্গীয় আনন্দের বিভায় মন ঝলমল করতে থাকে। এই তিনটি গানেই শারদলক্ষ্মীর আগমনী গাওয়া হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে আনন্দলোকের দ্বাব উদ্‌ঘাটনেরও বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম গানটিতে রয়েছে ভবিষ্যতের কথা। তাতে শারদলক্ষ্মীর আগমনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁকে আবাহন জানানো হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, শারদলক্ষ্মী আসছেন সাগরের পার থেকে সুদূরের ধন নিয়ে। সেই ধন কী? আনন্দই সেই ধন। শরতের অরুণকিরণে সেই আনন্দের রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তৃতীয় গানটিতে বলা হয়েছে যে তিনি এসে গিয়েছেন। তাঁর আগমনে বনে বনে আলোছায়ার আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। বনদেবীর দ্বারে দ্বারে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছে এবং তাঁর নূপুরের ধ্বনি মনের মধ্যে পাষাণ-

গলানো সুধা ঢেলে দিয়েছে। আনন্দই সেই সুধা। এই গানটির মধ্যে দিয়ে কবি শরৎলক্ষ্মীর বন্দনা শেষ করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শারদোৎসব নাটকের গানগুলি শুধু নাটকের শোভা বৃদ্ধির জন্য রচিত হয়নি। নাটকের মূল বক্তব্যকে তারা অনেকখানি পরিস্ফুট করে তুলেছে। ফুল এবং তার সৌরভকে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি শারদোৎসব নাটকের গানগুলিকেও মূল নাটক থেকে পৃথক করা যায় না ; এগুলি তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সবশেষে 'শারদোৎসব' নাটক সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। শান্তিনিকেতন-বাসীদের জীবনে এই নাটক অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাইরের লোকদের কাছে 'শারদোৎসব' রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতই একটি নাটক, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের লোকদের কাছে এই নাটক এক অসামান্য, অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। এই স্ত্রীভূমিকা বর্জিত "নাটিকাটি বোলপুর-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়।" তারপর থেকে অধিকাংশ বছরেই শান্তিনিকেতনে শারদীয় অবকাশের ঠিক আগে এই নাটকটি অভিনীত হয়ে আসছে। এই নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র, তাদের প্রতিটি কথা শান্তিনিকেতনবাসীদের একান্ত পরিচিত, এমন কি কণ্ঠস্থ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই নাটকের অভিনয় দেখার পরে সকলে এই নাটকের গানগুলি বারবার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করে এক স্বর্গীয় রসের আস্বাদ পান এবং সেই রস তাঁদের সমগ্র শারদীয় অবকাশকে মধুময় করে তোলে। এই একটিমাত্র নাটক শান্তিনিকেতনের লোকদের জীবনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন রচনা এককভাবে তা করতে পারে নি। মেঘলা দিনের সকালে যখন শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা পড়া থেকে ছুটি পায়, তখন তারা দল বেঁধে 'শারদোৎসব' নাটকের গান গাইতে গাইতে বেড়াতে চলে যায় ; এই গানগুলির সুধা-ঢালা সুরের মূর্ছনা শান্তিনিকেতন ও তার আশপাশের আকাশবাতাসকে ভরে তোলে। বর্তমান প্রবন্ধে 'শারদোৎসব' নাটকের নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, কিন্তু একজন শান্তিনিকেতনবাসী হিসাবে আমি এই নাটক এবং এর গানগুলি থেকে বারবার যে অপার্থিব আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি, তা লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে

প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালা থেকে যে কবি অঞ্জলি পূর্ণ করে রূপরসমায়া আহরণ করেন, জীবনের ঋতুবৈচিত্র্যেও তাঁর কাব্যের পটভূমি বারবার রূপপরিবর্তন করে। কখনও প্রাণাবেগের পরিপূর্ণ প্রবাহে সৃষ্টিতে আসে আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গ, কোন সময় সংযমের রশ্মিতে সংহত হয়ে সেই আবেগ বিকীর্ণ করে একটি স্থির প্রশান্ত স্নিগ্ধ সুমোহন দীপ্তি, আবার কখনও বা আবেগ-উল্লাসের শেষ বিন্দুটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না, নিরাভরণ রিক্ত হৃদয়ের মরুবালুরাশি কাব্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়ে আদিগন্ত ধূসর করে তোলে। কখনও তাই কবির হাতে বাজতে দেখি সপ্তস্বরা বীণা, কখনও চারটি তারের তানপুরা, আবার কোন সময় বৈরাগীর একতারা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহে এর প্রতিটি ধারারই পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বারবার তাঁর কাব্যে এসেছে ঋতুপরিবর্তন। সেই সঙ্গে ভাবের দেহলী ও ভাষার নাটমন্দিরের শোভায় সজ্জায় দেখা দিয়েছে বিচিত্র রূপান্তর। তাঁর সুবিস্তৃত কবিজীবনের সমস্ত ঋতুভেদ, সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরা পূর্ণযতি লাভ করেছে তাঁর সর্বশেষ কাব্য তিনখানিতে। কবির পূর্বসৃষ্টির তুলনায় এই 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে' ত্রয়ীর মধ্যে ভাব, সুর ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলি অনন্যপূর্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এই কাব্যগুলি পরিণত বার্ধক্যের, মৃত্যুধৃত জীবনের শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জীবন ও মৃত্যু, ধ্বংস ও সৃষ্টির একটি গভীর দর্শন, নিবিড় প্রত্যয় এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছে। সেই প্রকাশও যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি বর্ণবিরল। ছন্দের মধ্যেও নেই সেই মঞ্জীরের শিঞ্জন। ভঙ্গীর তুলনায় বক্তব্য বিষয়ই তাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর ঐশ্বর্যযুগের কাব্যের বর্ণবৈভবের ইন্দ্রধনুচ্ছটা, ছন্দ ও ধ্বনির মুরজমূর্ছনার মাধুরীতে যাঁদের অন্তর মন পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তাঁরা এই সায়াহ্নের ক্লান্ত সুরের মৃদু আলাপ, পঙ্গু বাণীর খণ্ডিত আরতিকে সেই অনুপম কাব্যসুরধুনীর ধারার চরম পরিণতি বলে স্বীকার করতে স্বতই কুণ্ঠিত হবেন।

কিন্তু স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত বীক্ষণে তাঁদের আপত্তি সমর্থিত হয় না। কারণ বাণী ও ছন্দের মধ্যে আড়ম্বরের অভাব থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের কাব্যে কল্পনার দৈন্য আদৌ নেই, বরং এদের মধ্যে মহাকবির কল্পনার স্বাভাবিক সাবলীল স্ফূর্তি, প্রতিভার মৌলিকতা, অম্লান অটুট সৌন্দর্যবোধ এবং অন্তরনুপ্রবেশী স্বচ্ছ সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার সম্মিলনে অধিকতর ভাস্বররূপে পরিস্ফুট হয়েছে, জরার সর্বক্ষয়ী প্রভাব তাদের বিন্দুমাত্রও অভিভূত করতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, ভাবধারার দিক দিয়েও এই পর্বের সঙ্গে পূর্ববর্তী কাব্যধারার পরিপূর্ণ যোগ আছে। 'পূরবী'তে কবির কাব্যে যে আসন্ন বিদায়ের ম্লান গোধূলিচ্ছটা সংক্রামিত হয়েছে, তারই গাঢ় থেকে গাঢ়তর রাগে পরবর্তী কাব্যগুলি রঞ্জিত। 'প্রান্তিকে' মৃত্যুর সঙ্গে ক্ষণিক সম্মুখ-সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার প্রভাবে কবির মৃত্যু সম্বন্ধে মনোভাব একটি নতুনতর রূপ লাভ করেছে, কল্পনার বর্ণালী এবং সুরের লঘুতা থেকে মুক্ত হয়ে কবির মৃত্যুদর্শন স্থির নিঃসংশয় উপলব্ধি এবং স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট, জড়িমাহীন অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 'রোগশয্যা-আরোগ্য-জন্মদিনে' কাব্যমালার মধ্যে কবির দৃষ্টি অধিকতর স্বচ্ছ, প্রখর ও কুণ্ঠাবিমুক্ত হয়েছে, বার্ধক্য ও ব্যাধির প্রচণ্ড নিপীড়নের মধ্যে তিনি শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনেছেন, তাই মরণের সঙ্গে আর কোন অপরিচয়ের লেশ তাঁর মনের মধ্যে নেই। তাঁর কাব্যে তাই দেখি এক অভ্রান্ত উপলব্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি। শুধু যে তিনি সংশয়মুক্ত চিত্তে মৃত্যুর বরণডালা সাজিয়েছেন তাই নয়, তাঁর দিব্যদৃষ্টি পরপারের রহস্যরাজ্যেরও মর্মভেদ করে এক জ্যোতির্ময় সত্যোপলব্ধির সন্ধান লাভ করেছে, সেই উপলব্ধির প্রভা এই কাব্যত্রয়ীতে বিকীর্ণ হয়ে তাদের একটি অভিনব প্রশান্ত মহিমা দান করেছে। কবির এই অনির্বাচ্য লোকোত্তর উপলব্ধি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উপনিষদের ঋষিকে। ভাষা ও ছন্দের মধ্যে প্রসাধনকলার অভাব তাই এদের পক্ষে ত্রুটি হয় নি, বরং এর মধ্য দিয়েই নিরাবরণ ভাবের উপযুক্ত পরিচ্ছদে শিল্পরূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। বাণীবিন্যাসের পারিপাট্য এদের মধ্যে নেই বলে অনেকেই নিরাশ হন, কবিও এ সম্বন্ধে সঙ্কোচ ও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন,

> "মানবের সভাঙ্গনে
> সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।

তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে ;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপতালে।"

কিন্তু কবির এই আশঙ্কা অমূলক। তাঁর এই শিথিল সজ্জাহীন কাব্যকলাই এই কবিতামালাকে এমন একটি মহিমা দান করেছে, যা অতিভাষণের ঘনঘটা এবং ঐশ্বর্যময় উজ্জ্বল প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সম্ভব হত না। স্বচ্ছ সংক্ষিপ্ত ভাষা ও ক্ষীণ ছন্দঃস্পন্দ এই কবিতাগুলিকে একটি অপরূপ কৃশতা ও শান্ত দীপ্তি দিয়েছে, প্রত্যেকটি কবিতায় মন্ত্রের স্বল্পাক্ষর অর্থগর্ভতা ও নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তির পরিচয় ব্যঞ্জিত হয়েছে। তাই শুধু চিন্তাধারা নয়, প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়েও এরা উপনিষদের সমগোত্রীয়। ভাবের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর অঙ্গাঙ্গী মিলনই রবীন্দ্র-কাব্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য, এই শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলিতেও সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং এই কাব্যপর্যায় যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের স্বাভাবিক বিবর্তন ধারারই পরিণতি-চিহ্ন বহন করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মরণ সম্বন্ধে এই চিন্ময় দর্শনের অনির্বচনীয় প্রকাশের দ্যুতিতে তিনখানি কাব্যই ঝলমল করছে। এই দিক দিয়ে এদের ভাবধারার মধ্যে একটি সুগভীর ঐক্য রয়েছে। অবশ্য 'রোগশয্যায়'তে ব্যাধির অভিভব ও যন্ত্রণার পীড়ন, 'আরোগ্যে' সদ্য রোগমুক্তির সহজ স্বচ্ছন্দ অনুভূতি, 'জন্মদিনে'তে জন্ম-মৃত্যুর মিলন-মোহানায় বিহারের উদাত্ত উপলব্ধি প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু প্রভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ প্রভেদ একান্তই বহিরঙ্গ। তাদের মধ্যে সমগ্রভাবে একটি সুরই প্রধান হয়ে উঠেছে, তা কবির সুপ্রখর অধ্যাত্ম-অনুভূতি, বিশ্ব-সৌন্দর্যের অভিনব সতেজ উপলব্ধি, জীবনের কাছে বিদায় গ্রহণ ও মৃত্যুকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের স্থির, শান্ত, মোহাবেশহীন মহিমা। তাই এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সে বিচার খণ্ডিত ও অপূর্ণ হতে বাধ্য।

তাই দেখি পীড়ার বেদনার তীব্র উপলব্ধির সঙ্গে মানবাত্মার অপরাজেয় সহিষ্ণুতার যে জয়গান রোগশয্যায় করা হল,

"মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—

জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।"

সেই বিজয়েরই পূর্ণরূপ উদ্ভাসিত হল 'আরোগ্যে'র সুস্থ পরিবেশে,

"প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহদুর্গের শিখরে।"

দুই কবিতায় একই সত্যের দুটি দিক উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে আমাদের সামনে সত্যটি সম্পূর্ণভাবে ও সার্থকরূপে পরিস্ফুট হল।

সেইরকম 'আরোগ্যে'র ৩০ নং কবিতা ("ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রন্থি যং যায় স্খলি") এবং 'জন্মদিনে'র ২৭ নং কবিতা ("বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়") মিলিয়ে পড়লে আমরা সন্ধ্যার বহীরূপের সঙ্গে অধ্যাত্ম-গূঢ়ার্থতার সমন্বয়ের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাই।

শুধু পীড়নের মধ্যে নয়, আরামের মধ্যেও কবি বিশ্বসত্যের একটি নতুন রূপ কী অপরূপভাবে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছেন, তারও পরিচয় এই কাব্যমালার নানা স্থানে সমাকীর্ণ। কখনও তিনি সর্বদেহে শিরায় শিরায় রৌদ্রালোক সঞ্চরণের মধ্যে অপূর্ব পুলক-উত্তেজনা বোধ করেছেন, কখনও যাত্রাপথের অবসানে পূর্ণতার একটি প্রশান্ত পরিতৃপ্তি অনুভব করেছেন, কখনও বা প্রভাতের প্রণাম নিয়ে মৃত্যুর ললাটে জন্মলগ্নের আঁকা চন্দন-লেখা দর্শন করেছেন।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রাণলীলার সঙ্গে মানবাত্মার আত্মীয়তা, এক অবিচল সত্যের মধ্যে অফুরন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সংহরণ, অপরিমেয় কল্পব্যাপী উৎসবের অবসানে স্রষ্টার রহস্যাবগুণ্ঠিত দুরবগাহ মৌনতা কবি কত সহজে কী গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গেই না অনুভব করেছেন,

"বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।" (রোগশয্যায়)

এবং "দেখিলাম চাহি

শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে

নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।" (আরোগ্য)

শুধু উপলব্ধ সত্যের বাণীমূর্তি গড়ে তুলেই রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হন নি, মধুগন্ধী পৃথিবীর সমস্ত সত্তায় যে বিরাট চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি সমস্ত মানুষের মধ্যে অনির্বচনীয় অমৃত-রূপ প্রকাশ করেছে, তার উদ্দেশ্যেও তিনি প্রণতি নিবেদন করেছেন,

"সত্যের আনন্দ-রূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,

এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।" (আরোগ্য)

"খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার

ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম

দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি

মূল্য যার মৃত্যুর অতীত।" (জন্মদিনে)

কখনও কখনও কবির সংশয়ক্ষুব্ধতার চকিত বিচ্ছুরণ ঘটেছে। বিধবার সিঁথির মত একটি ক্ষীণ শ্বেত রেখা এপারের সঙ্গে ওপারের ব্যবধান রচনা করেছে অনুভব করে তাঁর মনে বেদনাবোধ জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই বিমল সত্যের অমৃতধারা সমস্ত অনিশ্চয়তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, পরিস্নাত কাব্যে নিখিলবিশ্বব্যাপ্ত আনন্দ-শতদলের সৌরভ সঞ্চারিত হয়েছে।

কালান্তর

রুদ্রের চোখে যে বহ্নি থাকে, তা জ্বলে ওঠে শুধু প্রলয়ের মুহূর্তে। অন্য সব সময়ে তিনি সৌম্য, শান্ত, সদাশিব। মহাকবিদের ধরনও অনেকটা তাই। তাঁদের যে লেখনী রসিকচিত্তকে কাব্যমন্দাকিনীর অমৃতধারায় অভিষিক্ত করে, তা'ই আবার কোন এক বিশেষ লগ্নে মেতে ওঠে দাহের নেশায়, তখন তার অগ্ন্যুদ্গারে পাঠকের শান্ত মন উত্তপ্ত হয়ে ফেটে ভেঙে পড়তে চায়।

রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি পড়লে এই কথাই মনে হয়। 'এই প্রবন্ধগুলি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের এক বিশেষ লগ্নে লেখা। এই সময়ে ইংরেজ শাসনের সমস্ত দোষক্রটি,—বাইরের চাকচিক্যে ভরা আবরণের অন্তরালে তার গলিত কুষ্ঠের মত দূষিত রূপটা প্রকট হয়ে পড়েছে। তার কৃত্রিম গরিমা সম্বন্ধে লোকের মনে আর কোন মোহ তখন নেই। দেশবাসী স্বাধীনতা চায়, কিন্তু স্বাধীনতা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। এদিকে সমাজে ঘুণ ধরেছে। অবুদ্ধি, কুসংস্কার ও বিভেদ মিলে তাকে জরাজীর্ণ করে ফেলেছে; স্বাধীনতার আগমন অনিশ্চিত, কিন্তু তার চাইতেও অনিশ্চিত দেশের ভবিষ্যৎ। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা এই নাভিশ্বাসগ্রস্ত সমাজের কোন সমস্যা দূর করতে পারবে কিনা, এ প্রশ্নও তখন এ দেশের চিন্তাশীল লোকদের মনে জাগছে। এই সংকটক্ষণের ঘূর্ণাবর্ত কবির মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তারই কিছু পরিচয় আমরা পাই এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে।

কিন্তু এ কী প্রকাশভঙ্গী! 'রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে যে মৃদু, পুষ্পিত, কাব্যময় ভাষা দেখা যায়, এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তার খুব অল্পই নিদর্শন মেলে। এদের ভাষা গম্ভীর, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, প্রত্যক্ষ। সোজাসুজি তা আমাদের মনে আঘাত করে। শুধু তাই নয়, সে আঘাত নির্মম। আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি গ্লানি তিনি যে ভাষায় ও যে ভঙ্গীতে উদ্ঘাটন করেছেন, তার মধ্যে কোন সঙ্কোচ বা চক্ষু-লজ্জা নেই। তাকে অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেই। 'কালান্তরে' রবীন্দ্রনাথের বাণী ন্যায়দণ্ডের বিধানের মতই অমোঘ ও নিষ্ঠুর।

প্রবন্ধসাহিত্যকে আমরা ব্যক্তিগত ও বস্তুগত—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে থাকি।

বস্তুগত প্রবন্ধে বিষয়বস্তুই প্রাধান্যলাভ করে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব কল্পনা, চিন্তা, ভাবনা এবং বলবার ভঙ্গী মুখ্য হয়ে ওঠে। 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলিকে আমরা "বস্তুগত প্রবন্ধ" আখ্যায় চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু এদের মধ্যে প্রতিফলিত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটি এতই মৌলিক এবং রচনাভঙ্গীটি এতই স্বকীয় যে, তাতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধেরও খানিকটা রেশ অনুভব না করে পারা যায় না। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বস্তুকে উপলক্ষ করে লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আর একটি কথা। সাহিত্যেব বাণী তিন রকম হয—প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত ও কান্তাসম্মিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির বাণী অধিকাংশ স্থলেই কান্তাসম্মিত, কখনও বা সুহৃৎসম্মিত। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যেব মধ্যে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'ব অন্তর্গত রচনাগুলিতে কান্তাসম্মিত বাণী শুনতে পাই, 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'রাজাপ্রজা' প্রভৃতি গ্রন্থেব প্রবন্ধ-গুলিতে পাই সুহৃৎসম্মিত বাণী। কিন্তু কবির প্রভুসম্মিত কণ্ঠস্বর 'কালান্তর' গ্রন্থেই বোধহয় প্রথম শোনা গেল। সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার চরম স্তরে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে দেশে যে আসন লাভ করেছিলেন, তাকে বলা যায় জাতির অভিভাবকের আসন। বিমুগ্ধ জাতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধায় তাঁকে এই আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। এই আসন থেকে কবি জীবনের অপরাহ্নে জাতিকে যে কথা শুনিয়েছেন, তার মধ্যে নিবেদনের মৃদু সুর নেই, আছে কর্তৃত্বের দৃঢ কঠিন সুর। তাকে শুনতেই হবে, না শুনে উপায় নেই।

এখন 'কালান্তবে'র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ লাভ করেছে, সেগুলিকে সংক্ষেপে একত্র সমাহরণের চেষ্টা করব।

আগেই বলেছি, ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসের একটি সঙ্কটক্ষণ 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির পটভূমি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগুলিতে দেখিয়েছেন যে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে পূর্বদেশের দুর্বল জাতিগুলির উপর পশ্চিমের প্রধান জাতিগুলির শোষণ ও অত্যাচারের ফলে। 'কালান্তরে'র বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি এই শোষণ ও অত্যাচারের নগ্ন রূপটি তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণের মধ্যে ইউরোপের প্রতি বিদ্বেষ কোথাও নেই। ইউরোপের মহত্ত্বকে তিনি পরিপূর্ণভাবেই স্বীকার করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "ঈর্ষার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। তার স্থান-

সন্নিবেশ, তার জলবায়ু, তার জাতিসমবায়, এমনভাবে ঘটিয়াছে যে, সহজেই তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্য এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আর-এক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। একদিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে তাহাদের উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন দাবির কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না; অপরদিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনায় পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে একে বিশ্বের গূঢ়-রহস্যসকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে, তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়—তাহা বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।" (স্বাধিকারপ্রমত্তঃ)

ইউরোপের কাছ থেকেই যে আমরা মানবতার মর্যাদা বুঝতে শিখেছি, তাও রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণ বিধির সার্বভৌমিকতা ও শাশ্বত অপরিবর্তনীয় ন্যায় অন্যায়ের আদর্শও ইউরোপই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ইউরোপ যে নিজের সমালোচনা সহ্য করে, তার থেকে তার উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু লোভ যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন আদর্শ ডুবে যায়। তখন চলে নির্লজ্জ শোষণ। ইউরোপও এখন এই শোষণে মেতে উঠেছে। এই শোষণেরই নির্লজ্জ মূর্তি আজ আত্মপ্রকাশ করেছে চীনে, ভারতবর্ষে, আফ্রিকায়। ইউরোপ তার নিজেরই আদর্শ এত সহজে বিসর্জন দিয়েছে কেন? দিয়েছে অপর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ নেই বলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ড-গুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে-ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। যেখানে শক্ত

পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে, সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবলপক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।" (বাতায়নিকের পত্র)

তাহলে দুবলের বাঁচার উপায় কী? "তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।" অপমানকে মাথা পেতে নিলে চলবে না, অপমানিতকে আজ উঠে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে নিজের সম্মান দাবী করতে হবে।

কিন্তু দাবী করার পথেও যে বিঘ্ন অগাধ। আমাদের নিজেদের মধ্যেও যে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, পীড়ন পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। ইউরোপ আমাদের মর্যাদা দিচ্ছে না বলে একদিকে আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি, অন্যদিকে আমরাই আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোককে মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। তবে ইউরোপকে দোষ দিই কোন্ মুখে? আর তারা যদি আমাদের দাবী পূরণ করে আমাদের মর্যাদা দেয়-ই, তাহলে কি আমাদের নিজেদের কলঙ্ক অধিকতর লজ্জা পাবে না?

তাছাড়া আমাদের মধ্যে আরো অজস্র ত্রুটি রয়েছে। জাতির মধ্যে ঐক্য নেই। ভেদ আছে নানাদিক দিয়ে—হিন্দু ও মুসলমানে ভেদ, প্রদেশে ও প্রদেশে ভেদ, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে ভেদ, ধনী ও দরিদ্রে ভেদ, মস্তিষ্কজীবী ও কায়জীবীতে ভেদ। ভেদ যতটা উৎকট, তার চেয়েও উৎকট ভেদবুদ্ধি। এই ফাটলধরা নড়বড়ে সমাজ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলেও সে স্বাধীনতা স্থায়ী বা কল্যাণপ্রসূ হবে না; প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে প্রভূত পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং বিনা ত্যাগে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তা ফাঁকা স্বাধীনতা, এই সমস্ত কথাই রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে বারবার জোর দিয়ে বলেছেন।

আমাদের এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির কারণনির্দেশ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, আমাদের সমাজের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত ঐক্যের কতখানি অভাব ঘটেছে। এ সমাজ গতিহীন, অনড়, অটল। সংস্কারের নাগপাশ বন্ধনে সে আবদ্ধ। আত্মকর্তৃত্বে তার আস্থা নেই, তার যত বিশ্বাস দৈবের উপরে। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ও

'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে কবি আমাদের জাতির চিত্তে সংস্কার ও দৈবের প্রভাব যে কত গভীর তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

এছাড়াও এ সমাজের আরো বহু দুর্বলতা আছে। আছে তার মজ্জাগত শূদ্রধর্ম, যে ধর্ম শুধু দাসত্ব করতে শেখায় না, দাসত্বের অত্যাচার সহ্য করতে শেখায় না, প্রভুর স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের উপর অত্যাচার করতেও শেখায়। আছে পুঞ্জীভূত অশিক্ষার গ্লানি। আছে জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের তিক্ততা, আছে নারীর অনগ্রসরতারূপ অভিশাপ। কোন সমস্যাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি, প্রত্যেকটি সমস্যা নিয়েই তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্যে শুধু মননশীলতার নয়, তথ্যনিষ্ঠারও অভাব নেই।

কিন্তু কেবলমাত্র সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, তার সমাধানের বিভিন্ন উপায়ও তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে বারবার করে নির্দেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কেবলমাত্র শিক্ষার প্রসারই ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি বিরাট অভিশাপকে দূর করে দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতার জন্য সমস্ত দেশকেই প্রস্তুত হতে হবে। ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণিবিশেষের উদ্যম এজন্য পর্যাপ্ত নয়। এইজন্যে বঙ্গ-ভঙ্গের সময় যে সব দেশপ্রেমিক যুবক সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের আত্মবিসর্জন বিফল হয়েছে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মত বৃহৎ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল সর্বসাধারণের প্রস্তুতির অভাবে। সুতরাং সবচেয়ে আগে জনগণকেই সর্বাঙ্গীণভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়।" বাইরের থেকে কোন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে নয়, জ্ঞানের আলোকে সকলের চিত্তকে আলোকিত করে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সকলকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। চরকা কাটার মত তুচ্ছ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের দ্বারা যে দেশের মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, একথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু একথাও সত্যি যে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোন আশার বাণী শোনাতে পারেন নি। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টির বলে উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের এই অজস্র ফাটল ও গ্লানি দিন দিন বাড়বে বই কমবে না এবং এরই মাঝখানে

জাতি একদিন স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু বাইরের থেকে পাওয়া এই স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের দুঃখ কমাবে না, বরং বাড়িয়েই তুলবে। যদিও একথা তিনি স্পষ্ট-ভাবে কোথাও বলেন নি, তবু 'কালান্তর' গ্রন্থের কয়েক জায়গায় তিনি কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে তাঁর এই উপলব্ধির ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। দুই জায়গায় তিনি যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করছি।

"তাই এই কথা বলি, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে।" (স্বাধিকারপ্রমত্তঃ)

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?" (সভ্যতার সঙ্কট)

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় কবির এই ভবিষ্যৎ-বাণী ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছে।

'কালান্তর' গ্রন্থের রচনাভঙ্গীর ঐশ্বর্য সত্যিই অসামান্য। কবি তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সমস্ত উপমা-রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন, সেগুলি মৌলিকতা ও মনস্বিতার আলোকে দীপ্ত। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' এবং 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এই দুই প্রবন্ধে এর সবচেয়ে চমৎকার নিদর্শন মেলে। রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে সরস উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও একটি বিশেষ সত্যকে প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই গ্রন্থের আরেকটি প্রশংসনীয় বিষয় কবির স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী। এই-খানেই রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধের সঙ্গে 'কালান্তরে'র প্রবন্ধাবলীর পার্থক্য। প্রথমোক্ত প্রবন্ধগুলি লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ নিজেই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্য নেতাদের সঙ্গে মতভেদ, কবিজীবনের আহ্বান, শিক্ষায়তন সংগঠনের সঙ্কল্প প্রভৃতি কারণের জন্য এই শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে আসেন। 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলি এর পরে লেখা। এই সময় দেশের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণের

সঙ্গে তাঁর একটি ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছিল। তারই ফলে এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি নির্লিপ্ত objective দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থ হিসাবে 'কালান্তর' একেবারে ত্রুটিহীন নয়। এর প্রধান দোষ, অধিকাংশ প্রবন্ধে একই কথা বিভিন্ন ভাবে ও ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়েছে। কতকগুলি যুক্তি খুব প্রাঞ্জল নয়, কতকগুলির পিছনে উপযুক্ত তথ্যের সমর্থন নেই। কোন কোন প্রবন্ধে কবি আলোচনাপ্রসঙ্গে মূল বিষয় থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গৌণ একটি বিষয়ের মধ্যে চলে গিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ "শূদ্রধর্ম" প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবন্ধটির প্রথম অংশ পড়ে মনে হয়, কবি শূদ্রধর্মের গ্লানি ও অবমাননার দিকটি পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার একটি গৌণ দিক্—প্রভুর প্রয়োজনে পরকে অত্যাচার করার কুৎসিত রূপটুকু মাত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গ্রন্থের কয়েক-জায়গায় পরস্পরবিরোধী উক্তিরও নিদর্শন পেয়েছি। যেমন 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা ক'রে পোষণ করে, তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থই নেই।" স্বাধীনতা লাভের আগে তার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এই কথাই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু তিনিই আবার 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, "মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে, তার পরে সুযোগ পাইবে, এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোন জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই।...আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধারণায় দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই।"

কিন্তু এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি 'কালান্তর' গ্রন্থের গুরুত্ব ও গরিমা খর্ব করতে পারে নি। এর মধ্যে শতভগ্ন জাতিকে উদ্দেশ করে যুগাধিপতি কবি যে বাণী শুনিয়েছেন, তা জীমূতমন্দ্রের মতই উদাত্ত ও গম্ভীর। সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবেও তার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে।

জাভা-যাত্রীর পত্র

ভ্রমণের মধ্য দিয়ে মানুষেব অন্তর-প্রাণ একটি বিস্তাব লাভ করে, অপরিচয়ের কুহেলিকা বিদূরিত হয়ে দূব ও পরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে তার মন বাঁধা পড়ে। সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য দেশে ভ্রমণ করেছেন। যে দেশেই তিনি গিয়েছেন তার সমাজ, রীতি নীতি, জীবনযাত্রা ও ভাবধারাকে তিনি দু চোখ ভরে দেখে হৃদয়ের মধ্যে বরণ কবেছেন। সাধারণ মানুষেরও অবাধ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে অনেকখানি মানস-প্রসাব সম্ভব হয়, বিশ্বাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বিশ্বকবিব মধ্যে তা একান্ত সহজ ও স্বাভাবিকরূপে এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছে।

এই কাবণে আমবা যখন তাঁর জাভা বা যবদ্বীপে ভ্রমণের সময়ে লেখা পত্রগুলি পড়ি তখন আমবা তাঁকে সেই দ্বীপেব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতাব এবং দ্বীপবাসীর জীবন ও বীতি-নীতির ঘনিষ্ঠ আন্তবিক পরিচয় লাভ কবতে দেখে বিস্ময় বোধ করি না। কিন্তু এই দ্বীপে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে আর একটি বস্তু বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর আগে তিনি কখনও ঐ দেশে যান নি। এইজন্য সেখানকাব সব কিছুব মধ্যেই তিনি নতুনত্বের স্বাদ পাবেন —এটাই পরম স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি এমনভাবে জাভাকে দেখেছেন যেন তার সঙ্গে তাঁর বহুদিনেব পরিচয়, সে দেশের জীবন-যাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম—কিছুই তাঁর অপরিচিত নয়। অত্যন্ত অভ্যস্ত অনায়াস ভঙ্গীতে তিনি ঐ দ্বীপকে ও দ্বীপ-বাসীদের দর্শন করেছেন এবং উত্তরোত্তর তাঁর মনে অজ্ঞাতকে জানার অভিনব উপলব্ধিব পরিবর্তে এমন একটি অপরূপ চেতনার সঞ্চার হয়েছে, নিকট স্বজনের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের আনন্দের সঙ্গেই যার তুলনা চলে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ভ্রমণ-বিবরণের তুলনায় 'জাভা-যাত্রীর পত্রে'র স্বাতন্ত্র্য এখানেই।

জাভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় তদাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ জাভার সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। দিগ্বিজয়ী ভারত কোন্ সুদূর অতীতে সাত-সমুদ্র অতিক্রম করে এই দ্বীপে পদার্পণ করেছিল। কিন্তু সেদিন সে উদ্ধত

রাজশক্তির সর্বগ্রাসী শোষণের তৃষ্ণা নিয়ে যায় নি, এই দ্বীপকে সে নিজের কৃষ্টি ও কলা দু হাতে দান করে তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে বিজড়িত হয়েছিল। সেদিন থেকে যবদ্বীপের চারুশিল্প ও স্থাপত্যশিল্পে ফুটে উঠল ভারতীয় ছন্দ, তার নৃত্য, গীত, অভিনয় এবং অন্যান্য ললিতকলায় সংক্রামিত হল ভারতীয় আদর্শ; ভারতের মহাকাব্য থেকে মর্মরস আহরণ করে যবদ্বীপের সংস্কৃতি-লতিকা মঞ্জরিত হয়ে উঠল। বহু শতাব্দীর ব্যবধানেও যবদ্বীপের সভ্যতা ও শিল্প-কলার অঙ্গন থেকে ভারতের চরণরেখা সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। কিন্তু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। ভারত আজ বহিঃশক্তির পর বহিঃশক্তির আক্রমণ, নানা সভ্যতার সংঘাত এবং রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে; ভারতীয় সভ্যতাও নানা হরণ-পূরণের ফলে সম্পূর্ণ নতুন কলেবর লাভ করেছে। কিন্তু মহাসাগর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র যবদ্বীপে বহির্বিশ্বের পরিবর্তন-পরম্পরার হাওয়া তেমন ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয় নি। তাই যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলেও ভারতের সেই আদি দানকে আজও সে সযত্নে বুকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। একটি পরিপূর্ণ বৃহৎ জলপাত্রের জল কালক্রমে নিঃশেষ হবার পরও যদি সেই পাত্র থেকে আগেকার উপ্‌চে-পড়া জল আর একটি ছোট পাত্রে সঞ্চিত হয়ে থাকে তা হলে যেমন হয়, বর্তমান কালের যবদ্বীপে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মন চিরদিনই প্রাচীন ভারতের মায়ায় আবিষ্ট হয়ে ছিল। ইতিহাস, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে তিনি ভারতের অতীত যুগের যে আলেখ্য লাভ করেছিলেন তার রসে তিনি এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর সাহিত্যে তার প্রভাব বিশেষ ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। 'মানসী'র 'মেঘদূত', 'কল্পনা'র অধিকাংশ কবিতা, 'ক্ষণিকা'র কয়েকটি কবিতা, 'কাহিনী'র নাট্য-কবিতাগুলি এবং 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তিনি সেই রসকে নিজের আলোকসামান্য শক্তি দিয়ে নতুন করে সৃজন করেছেন; এক অপূর্ব স্বপ্ন-মাধুরীর বর্ণ-সমারোহ নিয়ে প্রাচীন ভারত, প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের নর নারী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহিত্যে নবজন্ম লাভ করেছে। অতীত যুগের স্মৃতি-রোমন্থনে রবীন্দ্র-মানস এতখানি তন্ময় ছিল বলেই তিনি যখন দেখলেন যবদ্বীপে সেইদিনের ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন চারিদিকে

বিরাজমান, তখন স্বতই তাঁর চিত্ত একটি সুনিবিড় আশ্বাস ও তৃপ্তি লাভ করল। তাঁর পূর্ণ সন্তোষের পরিচয় 'জাভা-যাত্রীর পত্রে'র নানা স্থানে পরিকীর্ণ।

যবদ্বীপের ভূমিতে পদার্পণ করবার আগেও কবি এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যাত্রারম্ভের সময় একটি পত্রে তিনি লিখছেন, "ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল মানুষের সাথে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষেব সেই সবত্র-প্রবেশের ইতিহাসেব চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার কবে নি।"

যবদ্বীপ পরিক্রমায় কবির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতের সেই চিরনবীন চিরসজীব বাণীকে তিনি এই দ্বীপের সংস্কৃতি ও জীবন-ছন্দের মধ্যে অবিকৃত রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন।

কবির অভিজ্ঞতার প্রথম অতর্কিত সূচনা দেখি গিয়ানয়ার রাজবাড়ীতে। ভোজসভায় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে 'শার্দুল-বিক্রীড়িত' ছন্দের নাম শুনে সেখানকার রাজা তার পুনরাবৃত্তি করে ও শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক প্রভৃতি নাম বলে কবিকে বিস্ময়াবিষ্ট করলেন। কতকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব ছন্দের নামও কবি তাঁর মুখে শুনলেন, অথচ রাজা মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভের মত সুপরিচিত ছন্দের নাম করলেন না। রবীন্দ্রনাথ তখন সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন, কালক্রমে নব্য সভ্যতার উন্মেষের ফলে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার অনেকখানি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার এক ভগ্নাংশ এদেশের স্থানীয় কৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়ে এখনও বর্তমান আছে।

এই লুপ্তাবশিষ্ট অংশের মধ্য থেকেও কবি তাঁর দূরদৃষ্টি ও পুনর্গঠনশক্তির বলে সেকালের ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণতর আভাস লাভ করলেন। তিনি দেখলেন যবদ্বীপের হিন্দুধর্ম প্রধানত শৈব; "দুর্গা আছেন, কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই।" দেবীর কাছে জীব-বলি দ্বীপবাসীর কাছে অজ্ঞাত। এর থেকে কবি হৃদয়ঙ্গম করলেন, "তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ-শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।"

যবদ্বীপে ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের যে সংস্করণ প্রচলিত আছে,

আমাদের পরিচিত সংস্করণের তুলনায় তার অনেক অংশই স্বতন্ত্র, সেখানকার রামায়ণে রাম-সীতা ভ্রাতা-ভগ্নী ; অথচ তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। জনৈক ওলন্দাজ পণ্ডিত কবির কাছে অভিমত প্রকাশ করেন যে এই কাহিনীই প্রাচীন। এই মতকে কবিও সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। রামায়ণ-কাহিনীর যে অপূর্ব রূপক-ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, এই আখ্যান তাকে সুষ্ঠুভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

বালীদ্বীপে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পূর্ণতর ও ব্যাপকতর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করলেন। বালী ভ্রমণের সময়কার একটি পত্রে তিনি লিখছেন, "হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কী রকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই ; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে ; তার ভঙ্গিটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের।"

সবিস্ময়ে কবি দেখলেন অন্ত্যেষ্টি সংকারে ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গী করে মন্ত্রপাঠ করে, অথচ এদের কণ্ঠে উপবীত নেই। তারা 'গায়ত্রী' শব্দ জানে, অথচ মন্ত্র জানে না। মোটরে যেতে যেতে সমুদ্র দর্শন করে স্থানীয় রাজা হঠাৎ বললেন, "সমুদ্র" ; তারপর ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের অন্যান্য সংস্কৃত নাম এবং অনেকগুলি ভারতীয় নদী ও পর্বতের নাম বললেন। রাজার মুখে সুপ্রাচীন ভারতীয় ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি ভক্তিপ্লুত সুরে ধ্বনিত হতে দেখে কবি বিস্ময় বোধ করলেন, সেই সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন যে "সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে, ব্যক্ত করবার জন্যে, কিরকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল।" রাজার কণ্ঠে "সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্ত-আকাশ" আবৃত্তি শুনে কবি নতুন জ্ঞানের প্রভাবে অধুনা-নির্বাসিত প্রাচীন ভারতের বিশ্ব-বৃত্তান্ত-কল্পনার স্মৃতি অনুভব করলেন। রাজপুরীতে প্রবেশ করে কবি বুদ্ধ, শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পূজারী ব্রাহ্মণ-চতুষ্টয়ের মাঙ্গল্য মন্ত্রপাঠ শুনলেন. মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের পুঁথি দেখলেন এবং কাগজের একটি পুঁথি থেকে বিকৃত সংস্কৃত শ্লোকের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করলেন, খণ্ডিত মহাভারতের পরিবর্তিত কাহিনী শুনে অন্তরে কৌতূহল বোধ করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধিও সক্রিয় ছিল।

রাজার আবৃত্ত নদী-নামমালার মধ্যে সিন্ধু-শতদ্রু-ব্রহ্মপুত্রের অনুল্লেখে তাঁর ধারণা হল, যে যুগে ভারতীয় সভ্যতা যবদ্বীপে প্রবেশ লাভ করেছিল তখন "পঞ্জাবপ্রদেশ শক হূন যবন ও পারসিকদের দ্বারা বার বার বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে যেন বিদ্যায় সভ্যতায় স্খলিত হয়ে পড়েছিল ; অপর পক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা অভিষিক্ত ভারতের পূর্বতম দেশ তখনও যথার্থরূপে হিন্দুভারতের অঙ্গীভূত হয়নি।"

যতই সেদেশ পরিক্রমণ করেন, ততই ভারতীয় ভাবধারার অনুলেপন দর্শন করে কবি বিমুগ্ধ হন। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত শুধুমাত্র এদের সাহিত্যেই চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নি, তাদের প্রেরণায় এদের জীবন ও সমাজের আদর্শ গঠিত হয়েছে। এই দুই মহাকাব্যের মহান চরিত্রগুলিকে এরা অন্তরের মধ্যে বরণ করেছে, তাঁদের আদর্শে নিজেদের চরিত্রকে গঠন করতে এরা সর্বদাই সচেষ্ট। তাদের শিল্প, ললিতকলা ও উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব সর্বাধিক। নৃত্য এদেশের উৎসবের প্রধান অঙ্গ এবং তার মধ্যে ললিতকলার পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়েছে। এই নৃত্যেরও বিষয়বস্তু প্রধানত রামায়ণ-মহাভারত থেকেই সংগৃহীত। কবির ভাষাতেই বলা যায়, "এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে।" বালীর যে নৃত্যানুষ্ঠান কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাতে তাঁর শাল্ব-সত্যবতীর নৃত্য, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের এবং অর্জুনের সঙ্গে সুবলের যুদ্ধের নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতেও নৃত্যের মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের প্রাণ এমনিভাবে স্পন্দিত হত। কিন্তু ইতিহাসের আলোড়নে আজ আমাদের দেশে সংস্কৃতির এই ধারাটি শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। অথচ এই সুদূর দ্বীপে আজো তা তেমনি সজীব ও অম্লান। এই অপূর্ব দৃষ্টান্ত কবির প্রাচীনসভ্যতা-রসিক চিত্তকে শুধু ভাবাবিষ্টই করল না, তিনি তার মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্প-প্রেরণা চরিতার্থ করারও একটি অভিনব উপায় খুঁজে পেলেন। যবদ্বীপের এই মহাকাব্য-প্রভাবিত নৃত্যাদর্শকে তিনি পরবর্তী কালে রচিত তাঁর কয়েকখানি নৃত্য-নাট্যের মধ্যে রূপায়িত করে তুলেছেন। ফলে ভারতীয় নৃত্যকলায় একটি অভিনব অধ্যায় রচিত হয়েছে। অথচ আমাদেরই প্রাচীন ধারার সঙ্গে এই নৃত্যকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ!

যবদ্বীপের শিল্পকলার মধ্যেও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

কবি লিখছেন, "আমি মঙ্কুনগরো-উপাধিধারী যে-রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখছি চারিদিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্মে এ'রা মুসলমান।"

এমনিভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও আধুনিকতার সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে রামায়ণ-মহাভারত যবদ্বীপের শিল্পে, সাহিত্যে, জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই দুই মহাকাব্যের নর-নারীরা সেখানে ভাব-মূর্তিতে বিচরণ করেন ; প্রতি গৃহে, ক্রিয়া-কর্মে, উৎসবে-আমোদে তাঁরা দেখা দেন। সেখানে তাঁদের যে সর্বজনব্যাপী পরিচয় আছে, আমাদের নিজেদের দেশে তা' নেই।

যবদ্বীপবাসীদের মধ্যে অনেকেরই নাম ভারতীয়। কবি বলেছেন, "এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতরো আমাদের দেশে দেখা যায় না।"

এই পরিক্রমা থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়-কলার সম্বন্ধেও অনেক অজ্ঞাত তথ্য আহরণ করলেন। যবদ্বীপে নৃত্যের মধ্য দিয়ে ওড়ার ভাব-ব্যঞ্জনার আলোকে তিনি শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশ-বাক্য "রথবেগং নাটয়তি"র সার্থকতা উপলব্ধি করলেন ; বুঝলেন, "রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।"

যবদ্বীপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতের দান কতখানি, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধ ও কবিতায় মন্তব্য করেছেন। 'জাভা-যাত্রীর পত্রে' কবির এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন সুস্পষ্ট বিবৃতি না থাকলেও বোরোবুদুরের মন্দির দর্শনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের গঠনের সৌষ্ঠব তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি, কিন্তু ভিতরকার প্রস্তরমূর্তিগুলি তাঁর মন হরণ করেছিল। তার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন "প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর-অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই।" এই উচ্ছৃঙ্খলতা-বর্জিত শোভন ও সংযত প্রাণোল্লাসকেই যে কবি সনাতন ভারতীয় জীবনাদর্শ বলে মনে করতেন, তাঁর বহু প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে। এই মূর্তি-রাজির মধ্যে কবি রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারী, এমন কি ইতর জীবজন্তু পর্যন্ত সকলকেই দেখতে পেলেন। সকল জীবের এই সাম্যের ভাবটি বৌদ্ধধর্মের, তথা প্রাচীন

ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট স্থান। এই সুদূর দ্বীপের নির্জন মন্দিরের অভ্যন্তরে পাষাণ-মূর্তিরাজির মধ্যে তারই পরিচয় পেয়ে কবি ক্ষণেকের জন্য অভিভূত হয়ে পড়লেন; তাঁর মন ফিরে গেল অতীতের সেই গৌরবময় বিস্মৃতপ্রায় যুগে।

বোরোবুদুর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই কবির ভ্রমণপর্বের সুদীর্ঘ একটি অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। কবি দেশে ফিরলেন পরিপূর্ণ মন নিয়ে। যে স্মৃতির আনন্দরসায়নে তাঁর চিত্ত রঞ্জিত হল, তা নতুন দেশ দেখার নয়, আপনার দেশেরই অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের, বর্তমানের কোলাহলকে অতিক্রম করে সাময়িকভাবে ভারতের শান্তিময় প্রাচীন যুগে প্রত্যাবর্তনের। যদিও এতদিন পরে যবদ্বীপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মিলন-অভিজ্ঞানের অবিকৃত অবিচ্ছিন্ন সঙ্গতি কবি পান নি এবং তা পাওয়া সম্ভবও নয়, তবু আপনার অপার্থিব মানস-দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি খণ্ডিত অপভ্রংশের মধ্য থেকেই একটি অখণ্ড তাৎপর্য আবিষ্কার করে ফিরে এলেন। যবদ্বীপে মূক মাটির বুকে, স্তম্ভিত পাষাণের দেহে, আত্মভোলা মানুষের জীবনে 'অদৃশ্য ভাষায় যে বাণী লেখা আছে, তা তিনি পড়েছেন, বর্তমান কালের মায়া-বিভ্রান্তি উপেক্ষা করে তিনি শুনেছেন অতীত কালের কণ্ঠস্বর, সেই দূর বিদেশের কৃত্রিম চাকচিক্যে ভরা দৃষ্টি-বিভ্রমকারী নানা বস্তুর দিকে না তাকিয়ে সেখান থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন ইতিহাসের চিন্ময় স্মারকচিহ্ন। তাঁর এই উপলব্ধি যেমনই ভাস্বর, তেমনই সার্থক,

> "এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
> আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
> সে-চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
> সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।"

'প্রাচীন সাহিত্যে'র কালিদাস এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর প্রভাব

সমালোচনা শুধুমাত্র কোন রচনার গুণ ও দোষের তালিকা প্রণয়ন নয়, তার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নততর প্রতিভা, গভীরতর দৃষ্টি। অপূর্ব সহৃদয়তা ও দূরদর্শিতার বলে যিনি মূল লেখকের অনুভূতির উৎসে উপনীত হতে পারেন, সার্থক সমালোচক হওয়া কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে দেখতে পাই তিনি সেই দুর্লভ শক্তির অধিকারী ছিলেন—যার দ্বারা শুধু যে সমালোচ্য সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা যায় তাই নয়, স্রষ্টার সৃজনী-প্রেরণার মর্ম-মূলে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় এই লোকোত্তর শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

এইসব মহাকবির রচনাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন মরমীর দৃষ্টি দিয়ে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, সেই কাল জয়ী মহাকবিদের কাব্য পাঠে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে সূক্ষ্ম রস-নিবিড় ভাবানুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে, অপূর্ব ভাব প্রকাশ-শক্তির সাহায্যে তিনি তাঁর সেই মানস প্রতিক্রিয়াকে আমাদের চিত্তে সংক্রামিত করে দিয়েছেন। আমরা সাধারণ রসবোধ নিয়ে এঁদের কাব্য পাঠ করতে বসলে যে সব ভাবের আভাসমাত্রও পাই না, রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর শক্তি সেইসব ভাব আবিষ্কার করেছে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে আমরা এর বহু নিদর্শন পাই।

'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সমালোচনাই করেননি। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে দেখি কবি বিভিন্ন প্রাচীন কাব্যের রস উপভোগ করে আবার সেই উপভুক্ত রসের উপাদানে এক নতুন রস সৃষ্টি করেছেন। এইখানেই এই গ্রন্থের মৌলিকত্ব। সাধারণত সমালোচনার মধ্যে যুক্তিতর্ক প্রাধান্য পাওয়ার দরুণ সাহিত্যরস ততটা স্ফূর্তি পায় না। কিন্তু 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এই

বইখানি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য-গ্রন্থগুলির অন্যতম, কোন কোন দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর বর্ণাঢ্য ও ঐশ্বর্যপূর্ণ রচনারীতির তুলনা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যত্রও দুর্লভ।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র মধ্যে 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'শকুন্তলা' এবং অংশত 'কাব্যে উপেক্ষিতা'য় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কয়েকটি কাব্যের কোন কোন দিক্ নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র এই প্রবন্ধগুলিকে এই বইয়ের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির তুলনায় সার্থকতর বলা যায়। এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি, কিন্তু অন্যান্য প্রবন্ধগুলি অন্য লোকদের অনুরোধে লেখা, 'রামায়ণ' দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা হিসাবে, 'কাদম্বরীচিত্র' যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত একটি চিত্রের ব্যাখ্যা হিসাবে এবং 'ধম্মপদং' চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'ধম্মপদং'-এর সমালোচনা হিসাবে লেখা হয়েছিল, তার জন্য প্রথমোক্ত প্রবন্ধগুলির মত এই প্রবন্ধগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি, তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য একটা গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ। অবশ্য 'রামায়ণ' এবং 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধ দুটির ঐশ্বর্য মোটেই কম নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই প্রবন্ধ দুটিতে সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেও ভাষা ও চিন্তার ইন্দ্রজাল রচনা করেছে; কিন্তু 'ধম্মপদং' প্রবন্ধটি অত্যন্ত নীরস, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্যান্য প্রবন্ধে যে বর্ণাঢ্যতা ও শিল্পসুষমা দেখা যায়, এই প্রবন্ধটিতে তার চিহ্নও মেলে না।

কালিদাস-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষের দ্বিতীয় কারণ, প্রাচীন কবিদের মধ্যে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের উপরে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য কবিদের মধ্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও বাণভট্টের প্রভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনেক জায়গায় পড়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি ও বাণভট্টের কীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ব্যাসের সম্বন্ধে তিনি কোন প্রবন্ধ লেখেননি, কিন্তু 'কাহিনী'র অন্তর্গত চারটি কবিতায় তিনি ব্যাসের অঙ্কিত বিভিন্ন চরিত্র ও বিভিন্ন পরিস্থিতির যে অভিনব ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার তুলনা বিরল, মহাভারতের দুর্যোধন, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, কচ, দেবযানী, সোমক, কর্ণ, কুন্তী প্রভৃতি চরিত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়, তাদের রবীন্দ্রনাথ শুধু পূর্ণ-প্রস্ফুট করে তোলেননি, তাদের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন তিনি। কিন্তু বাল্মীকি, ব্যাস ও বাণভট্টের রচনায়

মর্মোদ্ঘাটনে যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রভূত পরিমাণে সূক্ষ্ম রসগ্রাহিতা, অভ্রান্ত পর্যবেক্ষণশক্তি ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন কালিদাসের কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়। কারণ কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের যে নিবিড় সমজাতীয়তা ছিল, পৃথিবীর আর কোন কবির সঙ্গেই তেমনটি ছিল না। কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য এত বেশী বলে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের মনকে সর্বাধিক পরিমাণে আবিষ্ট করেছেন এবং কালিদাসই তাঁর রচনায় গাঢ়তম ছায়া পাত করেছেন। কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুগভীর মানস-আত্মীয়তা অনুভব করেছেন, তাই তাঁর কাব্যের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন নিজের সমালোচনা শক্তির স্বচ্ছন্দ ও পরিপূর্ণ বিকাশের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের কালিদাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি এতই সর্বাঙ্গসুন্দর যে তাদের উৎকর্ষের তারতম্য বিচার করা যায় না। তবে এদের মধ্যে 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ দুটি কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্য উল্লেখযোগ্য। 'মেঘদূত'কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা, গান, সমালোচনা, কথিকা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সবই রচনা করেছেন, কিন্তু 'প্রাচীন সাহিত্যে'র এই প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি 'মেঘদূত' সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত উপলব্ধি যেভাবে রসময় করে পরিবেশন করেছেন, তার তুলনা অন্যত্র পাই না। 'মেঘদূত' বিশেষভাবে কবিদেরই কাব্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও যে এটি প্রিয় কাব্য ছিল, তা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই তিনি 'মেঘদূতে'র রস এরকম নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই রসকে তিনি নিজের কবি-অনুভূতির দ্বারা নতুন রূপ দিয়ে এই প্রবন্ধে পরিবেশন করেছেন। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটির মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্যেটে কালিদাসের 'শকুন্তলা' পাঠ করে যে মন্তব্য করেছিলেন, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তারই বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন; অর্থাৎ এই প্রবন্ধটির মধ্যে আমরা কালিদাস, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন মহাকবিকেই একসঙ্গে পাই; এই মণি-কাঞ্চনযোগের তুলনা হয় না। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের নামকরণ সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা দরকার; 'কুমারসম্ভব' ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেমন 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র মধ্যে তুলনা করে দুটি গ্রন্থের ঐক্য প্রদর্শন করেছেন, তেমনি 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ

'শকুন্তলা'র সঙ্গে শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের তুলনা করে দুটি নাটকের অনৈক্য প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের নাম 'টেম্পেষ্ট ও শকুন্তলা' রাখলে ঠিক হত বলে মনে হয়। তাছাড়া কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' এই দুটি প্রবন্ধ মিলিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, একটি প্রবন্ধ আর একটির পরিপূরক, দ্বিতীয় প্রবন্ধটির 'শকুন্তলা' নাম থেকে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে এই প্রবন্ধের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' নাটকের রস ও তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এই কারণেও এর এই নামকরণ সমর্থন করা যায় না।

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের যে বিচার করেছেন, তার পুনর্বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং আমাদের সে যোগ্যতাও নেই। আমরা এখানে শুধু একটিমাত্র বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'প্রাচীন সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন, তাঁর নিজের রচনার মধ্যে সেগুলির প্রভাব পড়েছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-সম্বন্ধীয় বীক্ষণের মূল কথাগুলিকে যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যেও প্রয়োগ করি, তাহলে কোথাও কোন অসঙ্গতি ঘটে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র মেঘদূত প্রবন্ধটিই স্মরণ করা যাক্। আমাদের মন নিয়ে 'মেঘদূত' পড়তে বসলে আমরা 'মেঘদূতে' যে কোথাও অতলস্পর্শ বিরহের আভাস আছে, একথা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি না। মনে হয়, বিরহ যেন সেখানে বিলাস, তাকে উপলক্ষ করে সর্ব-বিশ্ব-পরিব্যাপী সম্ভোগের সুকুমার মূর্তিই সেখানে উজ্জ্বল; বর্ণনার চিত্র-সৌন্দর্যই তার প্রধান রস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই 'মেঘদূত'কে নিয়ে চলে গেছেন তাঁর আপন কল্প-রাজ্যে; যেখানে 'মানস সরোবরের অগমতীরে' রয়েছে একজনের পরম দয়িত, সেই দয়িত এবং তার মধ্যে রয়েছে অতলস্পর্শ বিরহ; সেই গভীর বিরহের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে সে অনুভব করে এই আশ্বাস যে, "এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চির-মিলন হইবে"। এই সমস্ত অনির্বচনীয় ভাবানুভূতি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এক নতুন 'মেঘদূত' সৃষ্টি করেছেন। কালিদাসের কাব্যে সত্যই এই কথা আছে কি না, তা নিয়ে হয়তো মতৈক্যের অভাব হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে এই বিষয়টি অন্যতম প্রধান

ভাবাবলম্বন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সুবিশাল কাব্য প্রবাহের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাই এক পরম অলক্ষ্য দয়িতের বিরহের বেদনা এবং জীবনের পরপারে এক অজানা দেশে তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলনের আশার অভিব্যক্তি। তাঁর 'জীবনদেবতা'-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে দেখি কবির সঙ্গে তাঁর জীবনদেবতার বিরহ মিলনের আলো-আঁধারের লুকোচুরি। 'আহ্বান' কবিতায় দেখতে পাই, যে নারীকে কবি বার বার ডেকে ডেকে ফিরেছেন, যিনি মৃদু হেসে দ্বার খুলে দিয়ে আবার দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছেন, তাঁর সঙ্গে জীবনের শেষে এক আলোকিত পুষ্পবনে অন্তহীন মিলনের আশ্বাসে কবি-হৃদয় পূর্ণ।

'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কবি এই দুই কাব্যের গতিধারা সতর্কভাবে অনুসরণ করে শেষ পযন্ত দেখিয়েছেন যে উদ্দাম সৌন্দর্যসম্ভোগ বর্ণনাতে কালিদাসের সত্যকার প্রবণতা ছিল না; যদিও কালিদাস তাঁর কাব্যে ও নাটকে অনাহূত প্রেমের তরুণ লাবণ্যকে অত্যুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেছেন, তাঁর লক্ষ্য আসলে ছিল সেই প্রেমের প্রশান্ত মহনীয় বিরল-বর্ণ পরিণামের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মতে "উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত......নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা-অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যেও এই সত্য অসংখ্য স্থানে বাণী-মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। তাঁর প্রথম বয়সে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা'-নাটকের কেন্দ্রীয় বক্তব্যটিই তাই। কবি দেখিয়েছেন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেম যতক্ষণ কর্তব্যকে ভুলে দৈহিক আকর্ষণ ও দেহ সঙ্গ-সুখলাভের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততক্ষণ তা ছিল অসার্থক। কিন্তু যখন চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে অর্জুনকে নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে তার আত্মার সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করল, তখন অর্জুন পূর্ণ ও শাশ্বত প্রেমের পরিচয় পেলেন, তিনি ধন্য হলেন, চিত্রাঙ্গদার নারী-জন্মও সার্থক হল। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র মত 'চিত্রাঙ্গদা'রও মূল কথা এই যে, মাতৃত্বেই নারীত্বের প্রকৃত পরিপূর্ণতা। 'রাজা ও রাণী'তেও বিক্রমের প্রেম কর্তব্য ও সমাজকে অস্বীকার করেছিল বলে তার সাংঘাতিক পরিণাম প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্য 'মহুয়া'তেও এই সুরের পুনরাবর্তন লক্ষ্য করি

প্রেমের পলায়নী মনোবৃত্তি, সংসারের কর্তব্য-সংঘাতকে পরিহার করে আবেশ-বিভোর স্বপ্ন-স্বর্গ রচনাকে 'মহুয়া'য় তীব্রভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে; সামাজিক কর্তব্যের ধূলি-ধূসর রাজপথেই প্রেমের আসন পাততে হবে—এই কথাই কবি 'মহুয়া'র মধ্যে অত্যন্ত অপরূপ ভঙ্গীতে বলেছেন,

"আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
....
উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।"

কালিদাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে নরশিশুতে খেলা করিতেছে তেমনি তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে।" পৃথিবীর দ্বিতীয় যে কবির কাব্য সম্বন্ধে এই উক্তি সমান সার্থকতার সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে সুনিবিড় অচ্ছেদ্য একাত্মতা দেখানো হয়েছে, তার তুলনা অন্যত্র বিরল। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, "অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।" রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেও দেখি মানব ও প্রকৃতি যেন কোন্ এক আশ্চর্য মন্ত্রশক্তিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত হয়েছে। তাঁতের কাপড়ের টানা পোড়েনের মত মানবের সঙ্গে প্রকৃতি রবীন্দ্র-কাব্যে, রবীন্দ্র-নাট্যে, রবীন্দ্র-উপন্যাসে সর্বত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। তাঁর প্রথম বয়সের লেখা থেকে সুরু করে শেষজীবনের রচনাগুলি পর্যন্ত—কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির বিদেহী আত্মাকে দেখেছেন, শেলী বন-বাণীর মধ্যে তাঁর মানসীর বাণীর ধ্বনি শুনেছেন; কিন্তু কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ তার অন্তরে

অন্তরে এক হয়ে গিয়েছেন। তাই প্রকৃতি তাঁদের কাব্যের মধ্যে জীবন্তরূপে দেখা দিয়েছে।

শকুন্তলা নাটকের মর্ম-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কালিদাস তরুণ-তরুণীর অসংযত হৃদয়ের দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রু-বর্ষণে নির্বাপিত করে তাকে দুঃসহ দুঃখের হোমানলের মধ্য দিয়ে পবিত্র করে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের অক্ষয় স্বর্গে উন্নীত করেছেন। কালিদাসের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মত রবীন্দ্রসাহিত্যের নরনারীরাও দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে অসংযমের ক্ষালন করে অবশেষে শান্তি ও শুচিতার স্নিগ্ধ স্পর্শ লাভ করেছে। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র ও বিনোদিনী দুরন্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে শুধু মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা অনুতাপ ও আত্মগ্লানির বিষম পীড়নে জর্জরিত হয়ে মর্মদাহ ভোগ করলেন এবং তার অবসানে তাঁরা সুখের সন্ধান না পেলেও শান্তির আশ্বাস লাভ করলেন। 'ঘরে বাইরে'র বিমলার কাহিনীও এই প্রলোভন, বঞ্চনা, আত্মগ্লানি ও সান্ত্বনা লাভের মর্মস্পর্শী ইতিহাস। 'শাপমোচন' নাটিকার নায়িকা মঞ্জুশ্রীও যখন দুঃখের দহনে জ্বলে অশ্রুধারায় নিজের অন্তরমন ধৌত করলেন, তাঁর শাপমোচনও তখনই সম্ভব হল।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিশেষভাবে জীবনের সেই অংশের প্রতি দৃক্‌পাত করেছেন—যা সুন্দর, মোহময়, বরণীয়। বাইরের রুক্ষ কর্কশ মলিন জগৎকে তাঁরা খুব প্রসন্নভাবে দেখেননি, তাই তাঁদের কাব্যেও তার রূপায়ণ অত্যন্ত অল্প।

'কুমারসম্ভবে'র যতীশ্বর শিব রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করেছেন, তাই তাঁর কাব্যেও দেখি নানা ভঙ্গীতে তাঁরই আরতি, শিল্প ও প্রেম সর্বক্ষেত্রে তিনিই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ দেবতা।

এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসেরই মন্ত্র দিয়ে কাব্য-লক্ষ্মীর পূজা করেছেন। কালিদাসে যে ভাব অর্ধপ্রচ্ছন্ন, যার উপলব্ধি সহৃদয় সমালোচকের অতন্দ্র অনুধ্যান-সাপেক্ষ, রবীন্দ্রনাথে তা দীপ্ত দিবালোকের মত স্বপ্রকাশ, প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশে সুন্দর, মহৎ, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো

আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা এডগার অ্যালান পো-র (১৮০৯-১৮৪৯) কোন তুলনামূলক আলোচনা আজ অবধি হয়েছে বলে জানি না। অথচ দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম সাধর্ম্য হচ্ছে এই যে, দুজনেই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দুজনেই মূলত কবি এবং কবি হিসাবেই তাঁরা বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিন্তু কবিতা ছাড়াও ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁদের দান বিশ্বের সাহিত্য-ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে। আরও একটি বিষয়ে এঁদের মধ্যে মিল দেখা যায়। দুজনেরই প্রতিভা প্রথমদিকে তাঁদের নিজেদের দেশে তেমন ভাবে

উপলব্ধি করে তাঁদের

পৃষ্ঠা ১২ ছত্র ১৩ তে ভুলবশত 'শাপমোচন'-এর নায়িকার নাম 'মঞ্জুশ্রী' ছাপা হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'মঞ্জুশ্রী'র জায়গায় 'মধুশ্রী' হবে।

কবিতা প্রধানত গীতিধর্মী। দুজনেরই কবিতায় তাঁদের ব্যক্তি-মানসের উজ্জ্বল, ও অবিকল প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতীকধর্মী বা Symbolical কাব্য রচনায় দুজনেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং তার মধ্যে তাঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গিয়েছেন। দুজনেই Onamatopœia বা ভাবানুকারী ধ্বনি সৃষ্টিতে নিজের নিজের ভাষার সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন। দুজনেরই স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল ছোট কবিতা লেখার দিকে; দীর্ঘ কবিতা তাঁরা খুব কমই লিখেছেন। পো মাত্র দুটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন—Tamerlane এবং Al Aaraaf। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টির তুলনায় সেগুলির সংখ্যা খুবই অল্প। দুই কবিই তাঁদের রচনাকে বারবার সংশোধন করতেন, তার ফলে সেগুলি শেষ পর্যন্ত উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছোত। অবশ্য দুজনের মধ্যে

একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রবাহের স্বরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে অফুরন্ত সৃষ্টি-প্রাচুর্য এবং ভাব ও বিষয়বস্তুর অসীম বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা পো র কবিতায় মেলে না। পো একজন শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতার সংখ্যা কুড়ির বেশী নয়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এডগার অ্যালান পো এবং রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট গল্পের মধ্যে আরও স্পষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। দুজনেই নিজেদের ভাষায় প্রথম সার্থক ছোট গল্প রচনা করেছেন এবং আজ অবধি ছোট গল্পের লেখক হিসাবে তাঁদের ভাষায় তাঁদের কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি বিশেষ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পো-র গভীর সাধর্ম্য বর্তমান। দুজনেই অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কয়েকটি গল্প লিখেছেন। এডগার অ্যালান পো লিখেছেন The Black Cat, The Tell-Tale Heart, Ligeia, The Masque of the Red Death, The Pit and the Pendulum প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প, আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, নিশীথে, মাস্টার মহাশয়, কঙ্কাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গল্প। আশ্চর্যের বিষয়, এই অতিপ্রাকৃত উপাদান অবলম্বনে লেখা গল্পগুলি এডগার অ্যালান পো ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই গল্প-ভাণ্ডারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। দুজনেই এই গল্পগুলিতে কল্পনার বিস্ময়কর প্রসারের পরিচয় দিয়েছেন। দুজনেই তাঁদের অপূর্ব ভাষার যাদুতে এই গল্পগুলির মধ্যে অতিপ্রাকৃত জগতের রহস্যঘেরা স্বপ্নময় পরিবেশকে মূর্ত করে তুলেছেন, এই ভাষা ও পরিবেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে সমালোচকের লেখনী সম্পূর্ণ অক্ষম। এঁদের অতিপ্রাকৃত রসাত্মক গল্পগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাদের মধ্যে অশরীরীর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ততটা দেখানো হয় নি, যতটা ব্যক্তিবিশেষের মনের থেকে সৃষ্ট অলৌকিক রহস্য বা অতিপ্রাকৃত উপলব্ধিকে রূপায়িত করে তোলা হয়েছে, অর্থাৎ দুজনেরই গল্পের অতিপ্রাকৃত উপাদান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মন্ময় বা subjective। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় অনেক সমালোচক কোলরিজের The Rime of the Ancient Mariner, Christabel প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে তাদের তুলনা করেন, কিন্তু এডগার অ্যালান পো-র এই জাতীয় গল্পগুলির কথা তাঁদের মনে পড়ে না। কোলরিজ রবীন্দ্রনাথের

ত গল্প লেখেন নি, তিনি কবিতা লিখেছেন আর পো গল্পই লিখেছেন। কোলরিজের
চয়ে পো-র সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়।

পরবর্তী কালের সাহিত্যিকদের উপর এডগার অ্যালান পো-র প্রভাব অপরিসীম।
সম্বন্ধে Cambridge History of American Literature-এ (Vol. II, P. 69)
লখা হয়েছে, "Poe's influence has been far-reaching. As poet, he has had
any imitators both in his own country and abroad, but especially
France and England. As romancer he has probably wielded a
rger influence than any English writer since Scott." রবীন্দ্রনাথ প্রথম
ীবন থেকেই এডগার অ্যালান পো-র রচনার অনুরাগী ছিলেন; ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
ার 'রবীন্দ্র স্মৃতি'তে (পৃঃ ৪৬) লিখেছেন, "এডগার এলেন পো'র সঙ্গে রবিকাকাই
ামাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন।" পরিচয় করিয়ে দেবার পরে এডগার অ্যালান
া-র রচনা পড়ে ইন্দিরা দেবী যে কতখানি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন, তা তিনি
ই উক্তির ঠিক পরেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনে পো-র
চনা এইরকম বা এর চেয়েও গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল বলে অনুমান করা যায়।
ই কারণে এবং পো-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে আমাদের মনে
য়, রবীন্দ্রনাথের উপরেও পো-র কতকটা প্রভাব পড়েছিল। দুজনের কবিতা, ছোট
ল্প ও সমালোচনা-সাহিত্য ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করলে এই প্রভাবের স্পষ্টতর নিদর্শন
াওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের উপর এডগার অ্যালান পো-র প্রত্যক্ষ প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত আমরা
খানে দিতে চাই। এডগার অ্যালান পো-র 'লিজিয়া' (Ligeia) নামে চমৎকার
ল্পটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'নিশীথে'র গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। দুই গল্পের
বিষয়বস্তুর মধ্যে বেশ ঐক্য আছে এবং ভাষার দিক দিয়েও কোন কোন জায়গায়
মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা প্রথমে দুটি গল্পের সার সংকলন করে তারপর
উভয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব। অবশ্য এই সংক্ষিপ্তসারের মধ্য দিয়ে গল্প
দুটির বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, কারণ পো ও রবীন্দ্রনাথের
গল্পের ভাষা ও বিষয়বস্তু পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং তাঁদের গল্পের
ভাষা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ঘটনাংশের সারসংকলন করা কতকটা মণিহারের মণিগুলোকে

বাদ দিয়ে সুতোটাকে ধরে রাখার মত। যা হোক্, আমরা দুই গল্পের সংক্ষিপ্তসার নীচে দিলাম।

'লিজিয়া' গল্পের নায়ক তার প্রথমা স্ত্রী লিজিয়ার মৃত্যুর পর তাকে স্মরণ করছে। দীর্ঘাঙ্গিনী লিজিয়ার রূপ-মাধুরী ছিল অপূর্ব। তার গভীর কালো চোখের তুলনা মিলত না কোন শিল্পে বা সাহিত্যে, আর সেই চোখের নির্বাক ভাষায় থাকত কী এক অতল রহস্য। সেই রহস্য কখনও কখনও যেন নায়কের চেতনার মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়েছে দিয়েই আবার মিলিয়ে গেছে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে সে কোনদিনই পারেনি। লিজিয়ার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার বিরাট দুর্বার ইচ্ছাশক্তি যা অত্যন্ত তীব্রভাবে তার প্রতিটি চিন্তায়, কথায় ও কাজে প্রকাশ পেত। তার শিক্ষা ও জ্ঞান ছিল অপরিসীম, দর্শন, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র—সমস্ত বিষয়েই ছিল তার সমান ব্যুৎপত্তি. নিজের জ্ঞানকে সে অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করতে পারত।

কিন্তু বিবাহের কয়েক বছর বাদেই লিজিয়াকে কাল-রোগে ধরল। প্রাণপণে লিজিয়া দিনের পর দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করল। অসহ্য তার যন্ত্রণা, কিন্তু বাইরে : কোনদিন প্রকাশ পায়নি। লিজিয়ার আসন্ন মৃত্যুর আলোকে নায়ক বুঝতে পারল তার প্রতি লিজিয়ার ভালবাসা কত অসাধারণ, সে ভালবাসা সাধারণ আকর্ষণের কত ঊর্ধ্বে। তা চরম আত্মসমর্পণের চেয়েও বেশী। নায়কের মনে সে সময় সে এত ভালবাসার উপযুক্ত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। অন্তিম সময়ে লিজিয়া মৃত্যুর কাছে মানুষের পরাজয়ের জন্য আক্ষেপ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এতদিন নায়ক বাস করত রাইন নদীর তীরের এক প্রাচীন শহরে। লিজিয়ার মৃত্যুর পরে সে ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার এক বন্য নির্জন অঞ্চলে এক পরিত্যক্ত বিরাট এবং প্রাচীন ও অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত মঠ-বাড়ী কিনে তাকে সারিয়ে নিয়ে বাস করতে লাগল। ইতিমধ্যে সে লেডী রোয়েনা ট্রিভালিয়ন নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিল; কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারেনি, বরং মনে মনে তাকে সে ঘৃণা করত। রোয়েনাও তাকে তাই এড়িয়ে চলত। নায়ক লিজিয়াকে ভুলতে পারেনি। স্মৃতির দাহ প্রশমিত করার জন্য সে আফিঙের নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

দিনরাত সে লিজিয়ার কথাই ভাবত এবং কখনো চুপি চুপি, কখনো চীৎকার করে তার নাম ডেকে ডেকে বেড়াত।

এদিকে বিবাহের পরে এক মাস যেতে না যেতেই রোয়েনা কঠিন অসুখে পড়ল। প্রবল জ্বরের মধ্যে সে চমকে ওঠে, বিড বিড় করে বকে, সে জানায় যে সে কার নিঃশব্দ উপস্থিতি অনুভব করছে। নায়ক তাকে রোগের বিকার বলেই মনে করে। ' প্রথমবার একটু সামলে নিয়ে রোয়েনা কয়েকদিন বাদে দ্বিতীয়বাব অসুখে পড়ল, এবার আর সে সারল না। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে হতে সে অবশেষে এক রাত্রে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। মৃত্যুর দুদিন আগে এক রাত্রে একদিন যখন জোর বাতাসে ঘরের পর্দাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে, সেই সময় রোগশয্যায় শায়িতা রোয়েনা বিছানা থেকে অল্প একটুখানি উঠে নায়ককে জানাল সেই অদৃশ্য উপস্থিতি আবার সে উপলব্ধি করেছে, তার শব্দ শুনেছে। নায়ক তাকে প্রবোধ দেওয়া সত্ত্বেও সে মূর্ছা যাবার উপক্রম করল। তখন তার জন্য নায়ক সুরা আনতে গেল। কিন্তু আনতে গিয়ে দেখল ধূপাধারের আলোয় আলোকিত সোনালী কার্পেটের একটা অংশের উপর কার যেন ক্ষীণ ছায়া একবার চকিতে দেখা দিয়েই পরক্ষণে মিলিয়ে গেল, তা এত ক্ষীণ যে তাকে ছায়ার ছায়া বলে মনে হয়। নায়ক তার এই দেখাকে আফিঙের ঘোর বলে উপেক্ষা করে সুরা এনে স্ত্রীর সামনে ধরল। কিন্তু রোয়েনা সুরার পাত্র মুখে তোলবার সময় নায়ক যেন দেখল কোথা থেকে উজ্জ্বল চার ফোঁটা রক্ত এসে সেই সুরার উপরে পড়ল। আফিং, স্ত্রীর আতঙ্ক এবং গভীর রাত্রের বায়ুহিল্লোল মিলিয়ে এই চার ফোঁটা রক্তের অলীক দৃশ্য রচনা করেছে ভেবে নায়ক তার মনকে প্রবোধ দিতে চাইল। কিন্তু এই ঘটনার পরেই রোয়েনার অসুখ চরমে পৌঁছোলো এবং তারপর মাত্র দু' রাত্রি কাটিয়ে তৃতীয় রাত্রিতে সে মারা গেল। রোয়েনার সাদা-কাপড়ে ঢাকা মৃতদেহের পাশে বসে নায়কের লিজিয়ার কথা মনে পড়ল, সে মনের মধ্যে লিজিয়ারই নাম জপ করতে লাগল।

এম্‌নি করে রাত্রি গভীর হয়ে এল। এমন সময় রোয়েনার মৃতদেহ হঠাৎ যেন নড়ে উঠল। নায়ক নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে উপলব্ধি করল সত্যিই রোয়েনার জীবন ফিরে আসছে। সেও তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল রোয়েনাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কিছুক্ষণের

মধ্যেই জীবন ফিরে আসার সব লক্ষণ রোয়েনার দেহ থেকে চলে গেল, তাতে মৃত্যুর ছাপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কিন্তু আবার এক ঘন্টা পরে নায়কের মনে হল রোয়েনার জীবন ফিরে আসছে। আবার সে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এবারও রোয়েনার জীবন ফিরল না, আ... তার সারা দেহ মৃত্যুতে নিথর হয়ে গেল।

আবার কিছুক্ষণ পরে সেই একই ব্যাপার। সেই জীবন ফিরে আসার লক্ষণ, সেই নায়কের ব্যর্থ চেষ্টা, সেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর জয়। বারবার এই ব্যাপার ঘটতে লাগল। এমনি করে প্রায় সারা রাত্রি কেটে গেল। অবশেষে শেষ রাত্রে রোয়েনার শরীরে আবার জীবনের আভাস জাগল এবং এবার তার মধ্যে জীবনের লক্ষণ পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠল। বেঁচে উঠে সে শয্যা থেকে নেমে এল। সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহ নিয়ে সে ধীরপদে এগিয়ে গেল নায়কের দিকে। হঠাৎ নায়কের মনে হল এ তো রোয়েনা নয়! রোয়েনা এত দীর্ঘ ছিল না। এ মুখ, এ নিঃশ্বাস, গালের এ রক্তাভা এ যেন আর কারও। নায়ক উন্মত্তের মত সেই মূর্তির দিকে ছুটে গেল। মূর্তি তার স্পর্শকে এড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর তার মাথা আর দেহ থেকে সাদা কাপড়ের ঢাকা ফেলে দিল। তার কালো চুলের রাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সে মেলল তার চোখ। নিবিড় কালো সেই চোখ। তখন নায়ক তাকে চিনতে পেরে চীৎকার করে বলে উঠল, "Here then, at least, can I never—can I never be mistaken—these are the full, and the black, and the wild eyes—of my lost love—of the Lady—of the LADY LIGEIA."

'নিশীথে' গল্পের নায়কও তার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাকে স্মরণ করছে। তার প্রথমা স্ত্রী সর্বগুণে গুণবতী ছিল। নায়কের নিজের কথায়, "আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল।...কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।" তারপর একদিন নায়কের সাংঘাতিক অসুখ হল। তার স্ত্রী অহর্নিশ অবিশ্রান্তভাবে তার সেবা করে তাকে সারিয়ে তুলল। কিন্তু সে তখন গর্ভবতী ছিল, এই অমানুষিক পরিশ্রম তার সইল না, কিছুদিন পরে সে এক মৃত সন্তান প্রসব

করল। সেই থেকেই তার নানারকম জটিল ব্যাধি দেখা দিল। নায়ক তাকে সেবা করতে গেলে সে বাধা দিত।

বরানগরের গঙ্গাতীরে নায়কের একটি বাড়ী ছিল। বাড়ীর সামনের বাগানের মধ্যে তার স্ত্রী নিজের হাতে একফালি বাগান রচনা করিয়েছিল। সেখানে এক বকুল গাছের নীচে সাদা মার্বেল পাথরের একটি বেদীও সে তৈরী করিয়েছিল, রোজ সন্ধ্যা-বেলায় সে সেখানে বসত। রোগের মাঝখানে একদিন চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় সে সেখানে গিয়ে বসতে চাইল। নায়ক তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। সেই সময় বকুলগাছ থেকে দুটি একটি করে বকুল ফুল ঝরছিল এবং নায়কের স্ত্রীর মুখে গাছের শাখার ফাঁক দিয়ে ছায়া-আঁকা জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল। এমন সময়ে নায়ক তার স্ত্রীর শীর্ণ হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলব না।" একথা শুনে তার স্ত্রী হেসে উঠল। "সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল।"

অনেক চিকিৎসাতেও যখন রোগের উপশম হল না, তখন ডাক্তারের পরামর্শে নায়ক তার স্ত্রীকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এলাহাবাদে নিয়ে গেল। কিছুদিন কাটবার পর এই সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ল যে তার স্ত্রীর এই অসুখ সারবার নয়, সে চিররুগ্না হয়েই সারাজীবন থাকবে। তখন নায়কের স্ত্রী নায়ককে আর একটি বিবাহ করতে অনুরোধ করল। নায়ক যখন প্রতিবাদ করে বলল যে আর কাউকে সে ভালবাসতে পারবে না, তখন তার স্ত্রী হেসে উঠল।

কিন্তু মুখে কিছু না বললেও অন্তহীন নিষ্ফল সেবা করে করে নায়ক ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। চিররুগ্নাকে নিয়ে জীবন কাটাবার কল্পনাও তার মনকে পীড়া দিত। হারাণ ডাক্তার তার স্ত্রীর চিকিৎসা করতেন। তিনি নায়ককে প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁর মনোরমা নামে একটি অনূঢ়া কিশোরী কন্যা ছিল। তার সঙ্গে নায়কের পরিচয় হল এবং সে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নায়কের বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যেত। তার স্ত্রী সবই বুঝত, কিন্তু কোনদিন সেজন্য সে কিছু বলে নি।

একদিন সন্ধ্যায় হারাণ ডাক্তারের মেয়ে মনোরমা নায়কের স্ত্রীকে দেখবার জন্যে

তার বাড়ীতে এল। সে সময় নায়কের স্ত্রীর ব্যথা খুব বেড়ে উঠেছিল, নায়ক তার কাছেই ছিল। চোখে লাগবে বলে কেরোসিনের আলোটা দরজার পাশে রাখা ছিল। এমন সময় মনোরমা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বিপরীত দিক থেকে কেরোসিনের আলো তার মুখের উপরে এসে পড়ল। আলো আঁধারে সে ঘরের ভিতরে কিছুই দেখতে না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। এমন সময় নায়কের স্ত্রী আচম্‌কা দুর্বল অবস্থায় একজন অপরিচিত লোককে দেখে সচকিত হয়ে বলে উঠল, "ও কে!" তারপর অস্ফুটস্বরে নায়ককে প্রশ্ন করল, "ও কে গো!" নায়ক প্রথমে মনোরমাকে না চেনবার ভাণ করল, তারপর তার পরিচয় দিল। তার স্ত্রী তখন মনোরমাকে কাছে ডেকে আপ্যায়িত করল। কিছুক্ষণ বাদে হারাণ ডাক্তার এসে দুই শিশি ওষুধ নায়কের স্ত্রীকে দিয়ে বললেন এর মধ্যে একটি খাবার ওষুধ, অপরটি মালিশের; দ্বিতীয়টি বিষ। তারপর স্ত্রীর অনুরোধে নায়ক ডাক্তারবাবু ও তাঁর কন্যার সঙ্গে বেড়াতে বেরোল। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে নৈশভোজন সেরে কিছু বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরে সে দেখল তার স্ত্রীর অন্তিম অবস্থা, সে মালিশের ওষুধ খেয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হল।

তারপর নায়ক মনোরমাকে বিবাহ করে দেশে ফিরল। কিন্তু মনোরমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক সহজ ও স্বাভাবিক হল না। নায়ক তাকে ভালবাসা জানাতে গেলে সে গম্ভীর হয়ে থাকত। এই সময় থেকেই নায়ক খুব বেশী মদ খেতে লাগল। তারপর একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় সে মনোরমাকে নিয়ে বরানগরের বাগানে বেড়াচ্ছিল। সে সময় বাগানে ছম্‌ছমে অন্ধকার, ঝাউগাছে বাতাসের দোলা লাগছে, এ ছাড়া চারদিকে কোন শব্দ নেই। মনোরমা কিছুক্ষণ পরে শ্রান্তি বোধ করে বকুলগাছের নীচে সেই বেদীতে শুয়ে পড়ল। সেই মায়াচ্ছন্ন পরিবেশ এবং সুরার মাদকতা নায়কের মনে আবেগের সঞ্চার করল। মনোরমার মুখে যখন চাঁদের আলো এসে পড়ল, তখন সে দুই হাতে তার হাত ধরে বলল, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলতে পারব না।" এ কথা বলেই কিন্তু নায়ক চমকে উঠল, তার মনে পড়ল এর আগেও সে আর একজনকে এই কথা বলেছিল। "এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম

পার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা—করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না।" এই হাসির শব্দ শুনে নায়ক মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান হলে সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে জানল যে যাকে সে হাসির শব্দ বলে মনে করেছিল, তা একদল যাযাবর হাঁসের পাখার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়।

নায়ক এ ব্যাপার জেনেও সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারল না। সন্ধ্যা হলেই তার ভয় হত, মনে হত যেন অন্ধকারের মধ্যে ঘন হাসি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সামান্য উপলক্ষ পেলেই তা অন্ধকার বিদীর্ণ করে আকাশ ভরে ধ্বনিত হয়ে উঠবে। অবশেষে অঘ্রাণ মাস এলে সে মনোরমাকে নিয়ে বোটে করে বার হল। অঘ্রাণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলে গেল। কদিন বেশ সুখেই কাটল। চারদিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মনোরমাও এতদিন পরে তার হৃদয়ের দ্বার একটু একটু করে খুলতে লাগল। অবশেষে নায়কদের বোট পদ্মায় পৌঁছোলো। 'একদিন শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় নায়ক মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মার চরে বেড়াতে গেল। বালির চরে চাঁদের আলো দেখে নায়কের মনে মায়াবেশ জেগে উঠল। বালুরাশির মাঝখানে একজায়গায় নদীর একটুখানি জল সঞ্চিত হয়েছিল। তাতে প্রতিফলিত জ্যোৎস্না দেখে মনোরমা কী ভেবে নায়কের মুখের দিকে চাইল, নায়কও অভিভূত হয়ে তখনই তার মুখে চুম্বন করল। কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ গম্ভীর স্বরে কে বলে উঠল, "ও কে? ও কে?" জনমানবহীন জায়গায় অকস্মাৎ এই স্বর শুনে দুজনেই চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই তারা বুঝল, এ ডাক মানুষের নয়, চরবাসী জলচর পাখীর। তা সত্ত্বেও তাদের চমকের ভাব কাটল না। তাড়াতাড়ি করে দুজনেই বোটে ফিরে এল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনোরমা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারে কে একজন নায়কের মশারির কাছে দাঁড়িয়ে মনোরমার দিকে একটি দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করে অস্ফুট কণ্ঠে নায়কের কানে কানে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "ও কে? ও কে? ও কে গো?" নায়ক দেশলাই জ্বেলে তারপর আলো জ্বালল। কিন্তু "সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল।" তা পদ্মা-পার হয়ে দূর দূরান্তরে এমন

কি যেন জন্ম মৃত্যুর দেশ ছাড়িয়েও চলে গেল, তার শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতম হয়ে গেল, তবুও তা একেবারে মিলিয়ে গেল না, নায়কের কানে বাজতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে নায়ক আলো নিভিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আবার তার মশারির পাশে কানের কাছে সেই অবরুদ্ধ স্বর বলতে লাগল, "ও কে, ও কে, ও কে গো!" নায়কের বুকের রক্তেও ঠিক তারই সমান তালে ধ্বনিত হতে লাগল, "ও কে, ও কে, ও কে গো!" তার ঘড়িটাও যেন তালে তালে বলতে লাগল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।"

'লিজিয়া'র সঙ্গে 'নিশীথে'র তুলনা করলে কয়েকটি প্রধান বিষয়ে দুটি গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুই গল্পের নায়কেরই প্রথমা স্ত্রী নানা গুণে ভূষিতা অলোকসামান্যা নারী। তারা দুজনেই স্বামীদের যেরকম ভালবেসেছে, তা শুধু ভালবাসা নয়, নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা। উভয় নায়কের প্রথমা স্ত্রী-ই বিবাহের কয়েক বছর পরে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে, স্বামীরা তাদের সেবা করেছে, কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। দুই গল্পের নায়কই তাদের প্রথমা স্ত্রীর প্রেমে মুগ্ধ এবং মৃত্যুর পরেও প্রথমা স্ত্রীরাই তাদের মনকে অধিকার করে আছে। দুই গল্পের নায়কই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে নিজেকে নেশায় ডুবিয়ে দিয়েছে; 'লিজিয়া'র নায়ক ধরেছে আফিং আর 'নিশীথে'র নায়ক ধরেছে মদ। প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগের পরে দুই গল্পের নায়কই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে কারও সম্পর্কই সহজ ও স্বাভাবিক হয় নি। দুই গল্পেরই শেষ দিকে নায়কেরা তাদের মৃতা প্রথমা স্ত্রীর আবির্ভাব উপলব্ধি করেছে এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই তাদের দ্বিতীয়া স্ত্রী এই উপলব্ধির হেতু হয়েছে। দুই গল্পেরই প্রধান ঘটনার পটভূমিকা নিশীথ রাত্রি।

এই নিগূঢ় সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের উপর এডগার অ্যালান পো-র প্রভাব সূচিত করে বলে মনে হয়। অবশ্য কেউ কেউ হয়তো অন্যান্য বিষয়ে দুটি গল্পের পার্থক্যের কথা বলে এই প্রভাবের কথা মানতে চাইবেন না। দুটি গল্পে যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তা আমরা অস্বীকার করছি না। রসের দিক দিয়েই দুই গল্পের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। 'লিজিয়া' গল্পে পো ভীতি, রোমাঞ্চ ও শিহরণ সৃষ্টি করে এক রহস্যঘন পরিবেশ রচনা করেছেন। কিন্তু 'নিশীথে' গল্পে রবীন্দ্রনাথ একটা অলৌকিক

আবহাওয়ার কুয়াশা সৃষ্টি করে একটি অপূর্ব মধুর মায়াজাল বয়ন করেছেন। 'লিজিয়া' গল্পে ভয়াল রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সত্যকার প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটেছে ; কিন্তু 'নিশীথে' গল্পে প্রেতাত্মা আদৌ রূপ পরিগ্রহ করে নি, এমন কি তার অস্তিত্বও সংশয়াতীত হয়ে ওঠে নি, নায়ক যে অলৌকিক উপলব্ধি লাভ করেছে, তাকে তার বিকারগ্রস্ত ও সুরার মাদকতায় আচ্ছন্ন মনের উপরে কতকগুলি রহস্যসঞ্চারী নৈসর্গিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া বলেও ব্যাখ্যা করা যায়। 'লিজিয়া' গল্পের রস তীব্র ও ভয়ঙ্কর, কিন্তু 'নিশীথে'র রস মদির ও মধুর। তাছাড়া 'নিশীথে' গল্পের মূল রস অতিপ্রাকৃত হলেও তার একটি বাস্তব setting আছে, কিন্তু 'লিজিয়া'র তা নেই, তার পরিবেশটি অবিমিশ্রভাবে অলৌকিক।

আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ 'লিজিয়া' গল্পটি পড়েছিলেন। না পড়বার কোন কারণ নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ যে এডগার অ্যালান পো-র রচনা নিজে পড়তেন এবং অপরকে পড়াতেন, তা আমরা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি, আর 'লিজিয়া' এডগার অ্যালান পো-র শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম। এই গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তার মূল ভাবটুকু নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করে 'নিশীথে' গল্পটি রচনা করেছেন বলে মনে হয়। তাঁর প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 'নিশীথে'কে একটি অভিনব ধরনের অনবদ্য গল্প করে তুলেছে। পো এবং রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টা-মানসের মূলধর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাই 'নিশীথে' 'লিজিয়া'র মত রোমাঞ্চকর গল্প হয় নি, তার মধ্যে কবি-কল্পনার ইন্দ্রজাল ও বর্ণাঢ্য ভাবঘন পরিবেশই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'লিজিয়া' ও 'নিশীথে'র মধ্যে এই যে একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে, সেই একই পার্থক্য রয়েছে এডগার অ্যালান পো ও রবীন্দ্রনাথ রচিত অতিপ্রাকৃত উপাদানমূলক সমস্ত গল্পের মধ্যে।

ভাষার দিক দিয়ে 'লিজিয়া'র সঙ্গে 'নিশীথে'র কয়েক জায়গায় সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। অবশ্য এই সাদৃশ্য খুব সূক্ষ্ম। দুজনের ভাষায় শব্দের মিল নেই, অর্থেরও অবিকল মিল দেখা যায় না, কেবলমাত্র প্রেরণার দিক দিয়ে একটা অনতিস্পষ্ট সমজাতীয়তা লক্ষ্য করা যায়। 'লিজিয়া' ও 'নিশীথে'র সমজাতীয় অংশগুলিকে আমরা নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম। আশা করি তাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম মিল আছে, তা সকলেই লক্ষ্য করবেন।

(ক) 'লিজিয়া' :—"Words are impotent to convey any just idea of the fierceness of resistance with which she wrestled with the Shadow (Death)."

'নিশীথে' :—"সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

(খ) 'লিজিয়া' :—"Yet not until the last instance, amid the most convulsive writhings of her fierce spirit, was shaken the external placidity of her demeanor."

'নিশীথে' :—"যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়।"

(গ) 'লিজিয়া' :—"...a faint, indefinite shadow of angelic aspect—such as might be fancied for the shadow of a shade."

'নিশীথে' :—"ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই।"

এডগার অ্যালান পো-র আর একটি বিখ্যাত গল্প "The Tell-Tale Heart"-এর সঙ্গেও 'নিশীথে'র একটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। "The Tell-Tale Heart" গল্পের নায়ক একজন বৃদ্ধকে খুন করে নিজের ঘরের মেঝের নীচে তার মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছিল; কিন্তু সে সেই মৃতদেহের হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিল এবং এই শব্দ উত্তরোত্তর প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল। পো-র ভাষায়, "My head ached, and I fancied a ringing in my ears : ...The ringing became more distinct :—it continued and became more distinct : I talked more freely to get rid of the feeling : but it continued and gained definitiveness—until, at length, I found that the noise was not within my ears.

No doubt I now grew very pale ;—but I talked more fluently,

and with a heightened voice. Yet the sound increased—and what could I do? It was a low, dull, quick sound—much such a sound as a watch makes when enveloped in cotton. ...I talked more quickly—more vehemently; but the noise steadily increased. I arose and argued about trifles, in a high key and with violent gesticulations, but the noise steadily increased. ...I foamed—I raved—I swore! I swung the chair upon which I had been sitting, and grated it upon the boards, but the noise arose over all and continually increased. It grew louder—louder—louder!"

'নিশীথে' গল্পের নায়কও এইরকম অস্ফুট স্বরের ধ্বনি "ও কে, ও কে, ও কে গো!" শুনতে পাচ্ছিল এবং সেই শব্দ ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো।' আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।' সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া, উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, 'ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

'লিজিয়া'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পটি ছাড়া 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেরও এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে। 'লিজিয়া' গল্পের নায়ক লিজিয়ার মৃত্যুর পরে ইংলণ্ডের এক পরিত্যক্ত মঠ বাড়ীতে বাস করেছিল আর 'চতুরঙ্গে'র শ্রীবিলাস দামিনীর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের একটি বনজঙ্গলে ভরা গ্রামের এক পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে বাসা বেঁধেছিল। দুটি ঘটনার মধ্যে কেবল পরিস্থিতির দিক দিয়েই মিল নেই, তাদের বর্ণনার ভাষাতেও যেন একটুখানি ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। 'লিজিয়া'তে এই বর্ণনা পাই :—

"I purchased and put in some repair, an abbey, which I shall not name, in one of the wildest and least frequented portions of fair England. The gloomy and dreary grandeur of the building, the

almost savage aspect of the domain, the many melancholy and time-honoured memories connected with both, had much in unison with the feelings of utter abandonment which had driven me into that remote and unsocial region of the country."

আর 'চতুরঙ্গ'-তে আছে :

"এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে-রাস্তা ছিল তার দুই ধারে শিশুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের একদিকের খানিকটা আছে কিন্তু বাগান নাই।...আমি যখন সকালবেলায় শেতলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে শিশুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধ'নে ফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড় কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারিদিকে সুখ দুঃখের যে-ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে-তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না।...

...সেই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু আমার দামিনী!"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র যে সমস্ত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য আমাদের নজরে পড়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের উপরে পো যতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্রষ্টার পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল এ সম্বন্ধে সূত্র নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হলাম। পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক বৃহত্তর পটভূমিকায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ব্যাপকতর ও উজ্জ্বলতর আলোক পাত করতে পারবেন।

লিপিকা

প্রতিভার সজীবতার সবচেয়ে স্পষ্ট নিদর্শন উন্মেষ থেকে পরিণতি পর্যন্ত অম্লান দীপ্তি ও অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তার অপ্রতিহত গতি। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যে তার যতখানি উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ পরিচয় পাই, আর কোনো সাহিত্যস্রষ্টার ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের রচনাবলীর মধ্যে যে বিচিত্র অভিনব প্রকাশভঙ্গী ও প্রেরণার নিদর্শন মেলে, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। কবির অফুরন্ত উদ্ভাবন-শক্তি আমাদের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে।

কবির এই চির-সজীব উদ্ভাবন-শক্তির একটি অপূর্ব উদাহরণ মেলে 'লিপিকা'র রচনাগুলির মধ্যে। এই রচনাগুলির রূপ ও প্রাণ দুইই অভিনব, দীপ্তিপূর্ণ এবং লাবণ্যময়। বিচিত্র এদের আঙ্গিক, ততোধিক বিচিত্র এদের আবেদন। এই রচনাগুলি আমাদের মনকে আবেশ-মায়ায় অভিভূত করে এবং আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এই লেখাগুলি একান্তভাবে কাব্যধর্মী এবং কাব্য হিসাবে এদের স্থান সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। কাব্যের মধ্যে থাকে একটি অন্তর্লীন আবেশ ও মাদকতাপূর্ণ পরিবেশ, তার মধ্যে বাক্যরাজির বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এক গহন স্বপ্নলোকের অপার্থিব রহস্য রসায়িত হয়ে ওঠে, 'লিপিকা'র রচনাগুলির মধ্যে কাব্যের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য অপূর্ব শিল্পময় ও সংবেদী অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

অন্যান্য রচনার বিচারের সময় আমরা যে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করি, 'লিপিকা'র রচনাগুলির ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা চলবে না। কারণ এদের মধ্যে বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী এই চারটি অঙ্গ এমন অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত হয়ে আছে যে তাদের পৃথকভাবে বিচার করতে গেলে অনেকখানি সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যাবে। এই চারটি অঙ্গের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যেই রচয়িতার কৃতিত্ব ও রচনাগুলির সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এই রচনাগুলির বক্তব্য-বিষয় খুবই অসামান্য। কিন্তু কবি যেটুকু এদের মধ্যে বলেছেন, তাকে নিতান্ত অল্প, এমন কি অনেক রচনায় অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

তার সার সংকলন করতে গেলে আমাদের নিরাশ হতে হবে। আসলে এদের মধ্যে কবি যতটুকু বলেছেন, তারই ভিতর তিনি আরও অনেক না-বলা কথার ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন, আমরা আমাদের মনের মধ্যে সেই না-বলা কথাকে অনুভব করি, তার কতক স্পষ্ট হয়, কতক হয় না, কবির ইঙ্গিতগুলি আমাদের মনে নানা বিচিত্র ভাবনার গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে। 'লিপিকা'র রচনাগুলি এই না-বলা কথার আভাস দিয়ে আমাদের মনকে নিয়ে চলে যায় নিকট থেকে দূরে, দূর থেকে সুদূরে, অগভীর থেকে গভীরে, গভীর থেকে অতলে। 'লিপিকা'র 'নতুন পুতুল' নামক রচনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিষণলালের গড়া পুতুল সম্বন্ধে বলেছেন, "যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।" এই কথা 'লিপিকা'র রচনাগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

এই লেখাগুলির স্বচ্ছন্দ অনায়াস ভঙ্গী এবং হালকা টলটলে ভাষা আমাদের বিস্মিত করে। মনে হয় এগুলি এতই সরল! এদের ভাব যে কত জটিল, ভাষা ও ভঙ্গীর এই সরলতা তা আমাদের বুঝতে দেয় না। আবার এই সরল ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যেই রয়েছে দক্ষ হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য, বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য শিল্প-সুষমা। তাই 'লিপিকা'র অন্তরের ঐশ্বর্য-ই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, তার রূপের লাবণ্যও তুলনারহিত।

'লিপিকা' বইটিকে রবীন্দ্রনাথ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডের রচনাগুলিতে একটি সামান্য বিষয় বা একটি বিশেষ মুহূর্তকে অবলম্বন করে কবির মন নানা বিচিত্র ও গভীর ভাবনার জাল বয়ন করেছে। এই রচনাগুলি এতই ভাবগভীর যে এদের রস আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে পাবি, কিন্তু বাইরের ভাষার শব্দসমষ্টি দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। সেইজন্য এদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে সে আলোচনা উচ্ছ্বাসবহুল প্রশংসায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই সে প্রচেষ্টা না করে আমরা অল্প কথার মধ্য দিয়ে এই রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝবার চেষ্টা করব। এই লেখাগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু প্রায় কিছুই নেই, যেটুকু রয়েছে তা কবির মনে ভাবের স্পন্দন সৃষ্টির উপলক্ষ মাত্র। এদের মধ্যে কবি 'পায়ে চলার পথ', 'বাঁশি', 'পুরোনো বাড়ি' প্রভৃতি বিষয়বস্তু নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন নি। পায়ে

চলার পথে চলে, বাঁশির আওয়াজ শুনে, পুরোনো বাড়ী দেখে কবি মনের মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত অভিনব ও অত্যন্ত গভীর ভাব উপলব্ধি করেছেন, সেই উপলব্ধ ভাবগুলিকেই তিনি এই রচনাগুলির মধ্যে ভাষায়িত করে তুলেছেন। কিন্তু এইটিই এই রচনাগুলি সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। এই লেখাগুলি পড়ে আমরা শুধু কবির উপলব্ধ ভাবগুলিকে মনের মধ্যে গ্রহণ করি না, এই ভাবগুলি আমাদের মনের মধ্যে নানা বিচিত্র ভাবনার আলোড়ন সৃষ্টি করে, কবি যা বলেছেন, তার অতিরিক্ত আরও নানা অভিনব ও অপার্থিব ভাব আমরা নিজেদের মনের মধ্যে উপলব্ধি করি। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই রচনাগুলির মধ্যে কবি এক একটি নগণ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে নানা বিচিত্র ও গভীর ভাব উপলব্ধি করে তাদের বাণীবদ্ধ করেছেন এবং সেই বাণীবদ্ধ ভাবের মাধ্যমে তিনি পাঠকদের মনে নতুন নতুন ভাবের উদ্বোধন করেছেন। তাই 'লিপিকা'র এই রচনাগুলি একই সঙ্গে ভাবের প্রকাশক্ষেত্র ও ভাবের উৎস দুইই।

এই খণ্ডের রচনাগুলির মধ্যে 'পায়ে চলার পথ' নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই রচনাটির সৌন্দর্য ও ভাবগভীরতার তুলনা হয় না। এর মধ্যে কবি ভাষা, চিন্তা ও কল্পনার যাদুতে এক স্বপ্নভরা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তার ভিতর দিয়ে যেন কোন্ এক অপার্থিব সুরলহরী মূর্ছিত হয়েছে, যা অনুভব করা যায়, কিন্তু ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। অবশ্য পথকে নিয়ে অনুপম গদ্যকাব্য সৃষ্টির আর একটি নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে মেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র সর্বশেষ অধ্যায়ে। কিন্তু তার রস ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ পথকে অবলম্বন করে গভীরতম ভাব এবং ইন্দ্রধনু-রঞ্জিত কল্পনার পক্ষ বিস্তার করেছেন, আর বিভূতিভূষণ বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশ, সেখানকার তরুলতা, পশুপাখী, নদনদী প্রভৃতির উল্লেখের মধ্য দিয়ে পথের বর্ণনাকে একটি স্থানিক বর্ণে (local colour) রঞ্জিত করেছেন। সেই বর্ণনাতে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনেরও প্রতিফলন পড়েছে।

'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'সতেরো বছর' এবং 'প্রথম শোক' রবীন্দ্রনাথের পূর্বরচিত 'পুষ্পাঞ্জলি'র অন্তর্গত তিনটি রচনার পরিবর্তিত সংস্করণ। বহু বছর আগে যখন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়া কাদম্বরী দেবী আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন, তখন কবি তাঁর দুঃসহ শোকের বেদনাকে 'পুষ্পাঞ্জলি'র রচনাগুলির মধ্যে অভিব্যক্তি দান করেছিলেন। 'লিপিকা'র মধ্যে 'পুষ্পাঞ্জলি'র তিনটি রচনা যেভাবে রূপান্তরিত

হয়েছে, তার মধ্যে ব্যক্তিগত শোকের তীব্রতা নেই, তার বদলে দেখি কবির প্রশান্ত অনুভূতির প্রকাশ। কবির নিজের ভাষাতে "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রথম রচনাটির নাম "গল্প"। মানুষ যে একান্তভাবে "গল্পপোষ্য জীব", এই সত্যটিই রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটির মধ্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এই রচনাটিকে লঘু প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। এটিকে দ্বিতীয় খণ্ডের অন্যান্য রচনার ভূমিকা স্বরূপে গণ্য করা চলে, কারণ অন্য প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই আমরা এক একটি গল্প পাই। কিন্তু লেখাগুলির মধ্যে গল্প থাকলেও তাদের ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। কারণ ছোট গল্পের মধ্যে আমরা যে পূর্ণাঙ্গতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সুদৃঢ় সংহত শিল্পরূপ এবং বিশদ জীবন-পর্যালোচনা দেখতে পাই, এই রচনাগুলির মধ্যে তা পাওয়া যায় না। এগুলির মধ্যে আমরা পরিপূর্ণ গল্প পাই না, যা পাই তাকে বলতে পারি গল্পের আভাস। এই আভাসটুকু রচনা করেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন, আমাদের মনের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হয়। প্রথম খণ্ডের রচনাগুলি যেমন আমাদের মনের মধ্যে নতুন নতুন ভাব উদ্বোধন করে, দ্বিতীয় খণ্ডের এই রচনাগুলি তেমনি আমাদেব মনের মধ্যে কাহিনীর জাল বোনে। এই রচনাগুলির বর্ণনাভঙ্গী সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কেতধর্মী, ছোট গল্পের চেয়ে কাব্যের সঙ্গেই তাদের মিল বেশী। প্রতিটি কাহিনীর মধ্যেই একটি অন্তর্নিহিত বক্তব্য আছে, কিন্তু সে বক্তব্য অত্যন্ত মৃদু ও প্রচ্ছন্ন, তা কোথাও কাহিনীর রসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে নি।

এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বচনাগুলির মধ্যে 'নামের খেলা'ই শ্রেষ্ঠ। নামের প্রতি মানুষের উৎকট মোহের হাস্যকরতা এই রচনাটির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে, এই গল্পের নায়ক নিজে নামের খেলায় উন্মত্ত অথচ এই খেলারই শিশু সংস্করণ যখন সে তার ভাগ্নের মধ্যে দেখতে পায়, তখন তাকে সে শাসন করে।

'লিপিকা'র প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি ভাবপ্রধান, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি কাহিনীপ্রধান, তেমনি তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি তত্ত্বপ্রধান। এই খণ্ডের অনেকগুলি রচনাতেই একটি কাহিনী আছে, কিন্তু কাহিনী সেখানে তত্ত্বকে

রূপায়িত করে তোলার বাহন মাত্র। 'প্রাণমন' ও 'আগমনী' প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই কাহিনীর আবরণও নেই, তাদের মধ্যে কবির মনের গভীরে উপলব্ধ তত্ত্ব প্রকাশ্য-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভাষা ও ভঙ্গীতে এই খণ্ডের অধিকাংশ রচনাই আগের দুটি খণ্ডের রচনাগুলির সগোত্র। কেবলমাত্র 'স্বর্গ-মর্ত' নাটিকা, আর 'প্রাণমন' ও 'আগমনী'র মধ্যে বর্ণিত তত্ত্ব একটু দুরূহ বলে রচনা দুটি কিছু পরিমাণে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে, এই বইয়ের অন্যান্য রচনার মধ্যে যে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব দেখা যায়, তা এই দুটি বচনার মধ্যে মেলে না।

তৃতীয় খণ্ডের কতকগুলি রচনায় রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগে ভারতবাসীর জীবনের বিভিন্ন দিকে যে সমস্ত গ্লানি প্রবেশ করেছে, সেগুলিকে গল্পের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। 'তোতা-কাহিনী' নামক রচনাটিতে তিনি আমাদের দেশের প্রাণহীন শুষ্ক কৃত্রিমতাপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপকে অপরূপভাবে রূপকের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই রকম 'কর্তার ভূত' নামক বচনাটিতে কবি দেখিয়েছেন কীভাবে ভারতবাসী প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মহান ঐতিহ্যকে হারিয়ে তার বিভিন্ন অর্থহীন প্রগতিবিরোধী বিধিনিষেধ ও সংস্কারের দাসত্ব করছে, যাব ফলে দেশেব কোনরকম উন্নতি হচ্ছে না, সমগ্র দেশের প্রাণধারা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে এবং প্রাণবন্ত বিদেশীরা এসে এদেশকে শোষণ ও লুণ্ঠন করে এদেশের লোকদের উপর প্রভুত্ব করছে, এই রচনাটির মধ্যে কবি অত্যন্ত অনায়াসভাবে গল্পচ্ছলে এই নিষ্ঠুর সত্যগুলিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সংক্ষিপ্ত অথচ ইঙ্গিতগর্ভ রচনা হিসাবে এই খণ্ডেব 'রথযাত্রা' নামক লেখাটির তুলনা হয় না। রাজা লোকলস্কর, সিপাই-সান্ত্রী, হাতী-ঘোড়া নিয়ে সদলবলে রথযাত্রা দেখতে যাচ্ছেন। সকলেই তাঁর দলে যোগ দিয়েছে, দেয়নি কেবল একজন, রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা যার কাজ। রাজার নির্দেশে "মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে, 'ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখবি চল্।'" দুঃখী যেতে রাজী হল না। তখন,

"মন্ত্রী বললে, তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা ঘটবে না?'
সে বললে, 'ঘটবে বৈকি। ঠাকুর তো রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।'
মন্ত্রী হেসে উঠল। বললে, 'তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই?'
দুঃখী বললে, 'তাঁর রথের চিহ্ন পড়ে না।'

মন্ত্রী বললে, 'কেন বল্ তো।'

দুঃখী বললে, 'তিনি যে আসেন পুষ্পকরথে।'

মন্ত্রী বললে, 'কই রে সেই রথ।'

দুঃখী দেখিয়ে দিলে, তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্যমুখী ফুটে আছে।"

এই ক'টি ছত্রের মধ্য দিয়ে একটি পরম সত্য যেভাবে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা হাজার পৃষ্ঠার আলোচনার ভিতর দিয়েও এতখানি প্রাঞ্জল হত না। অন্তরের অনুভূতির মধ্যে অপরিসীম গভীরতা ও আন্তরিকতা থাকলে তবেই তাকে এমন সহজ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই পৃথিবীর কবি, জীবনের কবি। তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ রচনাতেই দেখি মানবজীবনের জয়গান। 'লিপিকা'র তিনটি খণ্ডের বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, এ জীবন কত মধুর, স্বর্গের প্রলোভনও যার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এই সত্যের রূপায়ণ সবচেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়েছে 'ভুল স্বর্গ', 'সিদ্ধি' ও 'স্বর্গ মর্তে'র মধ্যে।

এখন 'লিপিকা'র আর একটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে এই প্রবন্ধ শেষ করব।

'পুনশ্চ'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।...পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে অনুসরণ করে অনেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে 'লিপিকা'র অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি গদ্য-কবিতার পর্যায়ভুক্ত। এই সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তি-যুক্ত, আমরা এখন তা'ই বিচার করব।

বিচার সুরু করার আগে প্রথমে গদ্য-কবিতা কাকে বলে, তা স্থির করা দরকার। প্রথমে গদ্যের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য কী, তা বুঝে নিলে গদ্য কবিতার স্বরূপ নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হবে। প্রধানত চারটি বিষয়ে গদ্যের সঙ্গে পদ্যের প্রভেদ। প্রথমত, পদ্য চরণ-

পরম্পরার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলিত, কিন্তু গদ্যের মধ্যে থাকে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, একটানা অবিরাম গতি। দ্বিতীয়ত, পদ্যের মধ্যে একটি নিয়মিত ছন্দ থাকে, গদ্যের মধ্যে তা থাকে না; অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভাষায়, "পদ্যের ছন্দোবিন্যস্ত ধ্বনি হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট। · পক্ষান্তরে গদ্যের ধ্বনিবিন্যাস হচ্ছে অনিয়মিত, অপরিমিত ও অনির্দিষ্ট, এককথায় অনিরূপিত।" তৃতীয়ত, গদ্যরচনা মাত্রেরই মধ্যে একটি যুক্তিশৃঙ্খলা আদ্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, অনেক সময় এই যুক্তিশৃঙ্খলা নিতান্ত ক্ষীণভাবে থাকে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে পারে না; কিন্তু পদ্য আবেগধর্মী বচনা, কবিব হৃদয়ের আবেগই তার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্ফূর্ত হয়, তার মধ্যে যুক্তিশৃঙ্খলার বিশেষ কোন স্থান নেই। চতুর্থত, গদ্যের বাক্যগঠনপ্রণালী সবসময়েই ঋজু, কিন্তু পদ্যেব বাক্যরচনায় সাধারণত একটা তির্যক ভঙ্গিমা থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণিমা' কবিতার প্রথম দুটি ছত্রের বক্তব্যকে গদ্যে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে, "সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা একেলা বসিয়া গ্রন্থ পড়িতেছিলাম।" কিন্তু এই কথাটিই কবিতায় ছন্দ ও সৌন্দর্যেব অনুরোধে এই রূপ নিয়েছে,

পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা

এর থেকেই গদ্য ও পদ্যের বাক্যগঠনপ্রণালীর পার্থক্য উপলব্ধ হবে।

গদ্য-কবিতা উভচর জীব। অর্থাৎ তার কোন কোন ব্যাপারে গদ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য বয়েছে, কোন কোন ব্যাপারে তার সাদৃশ্য আছে কবিতার সঙ্গে। তাব বাক্যবিন্যাসরীতি গদ্যেরই মত, যদিও কোন কোন সময় বৈচিত্র্য আনবার জন্য কবি তার মধ্যে পদ্যের মত তির্যকভাবে বাক্যবিন্যাস করেন। গদ্যের মত গদ্য-কবিতাতেও কোন নিয়মিত ছন্দ থাকে না। পদ্যের মধ্যে যেমন চরণ-পরম্পরা থাকে, গদ্য কবিতাতেও তা রাখা হয়, কিন্তু সেই চরণগুলি পদ্যের চরণের মত সমান মাপের পর্বে বিভক্ত নয়। আবার গদ্য-কবিতার মধ্যে গদ্যের অনুরূপ যুক্তিশৃঙ্খলা অপরিহার্যভাবে থাকে না; গদ্য-কবিতা পদ্যেরই মত আবেগধর্মী রচনা।

'পুনশ্চ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলা গদ্য-কবিতার সৃষ্টি করেন। তার আগে 'লিপিকা'র মধ্যে তিনি একবার এই ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, সে কথা তিনি 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় বলেছেন। 'লিপিকা'র প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ রচনাই তাঁর এই

পরীক্ষার ফল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'এদের মধ্যে 'প্রশ্ন' নামক রচনাটিকে সাময়িকপত্রে প্রকাশ করার সময় তিনি কবিতার মত পংক্তি ভেঙেই সাজিয়েছিলেন, যদিও গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই রচনা ও প্রথম খণ্ডের অন্যান্য রচনাকে তিনি পুরোপুরিভাবে গদ্যের রূপ দিয়েছেন। এই খণ্ডের অধিকাংশ রচনা সম্পূর্ণভাবে গদ্য-কবিতা না হলেও যে গদ্য-কবিতার নিকট আত্মীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'লিপিকা'র অন্যান্য রচনাকে কোনমতেই গদ্য-কবিতার পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। 'গল্প'র মত যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধকে, 'ঘোড়া' ও 'তোতা-কাহিনী'র মত শ্লেষগর্ভ কাহিনীকে, 'প্রাণমন' ও 'আগমনী'র মত তত্ত্ববহুল রচনাকে এবং 'স্বর্গ-মর্তে'র মত নাটিকাকে গদ্যে ছাড়া অন্য কোন ভাবে রচনা করা সম্ভব নয় এবং এগুলি যেভাবে রচিত হয়েছে, তাতে এদের গুরুতর ভাষাগত ও শব্দগত পরিবর্তন সাধন করেও গদ্য-কবিতায় রূপান্তরিত করা যায় না। তাই 'লিপিকা'র সব রচনাকেই 'গদ্য-কবিতা' আখ্যায় অভিহিত করবার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথও নিজে বলেছেন যে গদ্য-কবিতা সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম পরীক্ষার নিদর্শন " 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখা", সব লেখা নয়।

পঞ্চভূত

'পঞ্চভূত' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য-গ্রন্থ। তাব এই শ্রেষ্ঠত্বেব মূলে রয়েছে তার আঙ্গিকের অভিনবত্ব, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং বচনাশৈলীর মনোহারিত্ব। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচনাব সময় প্রচলিত রীতি অনুসবণ না কবে তিনি এক নতুন আঙ্গিকেব আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি ছ'টি বিভিন্ন চবিত্রের পরিকল্পনা করেছেন এবং তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এক একটি বিষয়কে নানা দিক থেকে দেখে এই সমস্ত বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন করে প্রকৃত সত্য নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন।

এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই নিজেদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। এরা একটি আলোচনা-সভায় বসে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনা-সভাটির নাম পঞ্চভূত সভা, সংক্ষেপে ভূতসভা। এর সভাপতির নাম ভূতনাথবাবু,* তিনি এই বইয়ের উত্তম পুরুষ, বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আলোচনাকে তিনি ডায়েরীর আকাবে লিপিবদ্ধ করেন। আলোচনা-সভাব অন্যান্য সদস্যেরা বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় বইয়ে দেয়, ভূতনাথবাবু তাকে তাঁর স্থির সংযত যুক্তি দিয়ে শান্ত করেন এবং সুনিপুণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসায় উপনীত হতে চেষ্টা করেন। তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী। তাঁর মতে "স্থায়ী রূপে জড়েব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হইতে গেলে, মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহিত করা নিতান্ত আবশ্যক।" বাকী পাঁচটি চরিত্রকে ভূতনাথবাবু পঞ্চভূত নাম দিয়েছেন এবং গ্রন্থের সূচনাতে তিনি তাদের

---

* 'ভূতনাথবাবু' নামটি সারা বইয়ের মধ্যে মাত্র একবার পাওয়া যায়। 'অপগুতা' নামক রচনাটিতে সমীর বলেছে, "আমাদের ভূতসভার বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূতনাথবাবু তাঁর ডায়ারিতে মন-নামক একটা দুরন্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে তোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ।"

পরিচয় দিয়েছেন। এক একটি চরিত্রের নাম ও বৈশিষ্ট্য পঞ্চভূতের এক একটি ভূতের মত।

এদের মধ্যে একজনের নাম ক্ষিতি। সে একান্তভাবে বাস্তববাদী। সে সব কিছুরই মূল্য নির্ধারণ করে ব্যাবহারিক দিক থেকে। তার মতে মানুষের উন্নতির জন্য আবশ্যককে সঞ্চয় এবং অনাবশ্যককে পরিহার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই।

আর একজনের নাম স্রোতস্বিনী (অপ্)। সে ভাবপ্রবণা কোমলহৃদয়া নারী। স্নেহ-প্রেম-প্রীতিতে তার অন্তর পরিপূর্ণ। সে অনাবশ্যককে ভালোবাসে, কারণ অনাবশ্যক মানুষের মনে স্নেহ, ভালোবাসা, করুণা, স্বার্থ বিসর্জনের স্পৃহা প্রভৃতি মহৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক করে ; তাই অনাবশ্যককে সে বর্জন করতে পারে না।

আর একজন দীপ্তি (তেজ)। তার মধ্যে নারীসুলভ মাধুর্য ও সৌকুমার্যের অভাব নেই, কিন্তু তার প্রকৃতি স্রোতস্বিনীর থেকে ভিন্ন। স্রোতস্বিনী বিনয় ও কুণ্ঠায় বিনম্র হয়ে মৃদু ভাবে নিজের বক্তব্য নিবেদন করে, কিন্তু দীপ্তি নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করে। তার মতে পুরুষের কাছে যা অনাবশ্যক, নারীর কাছে তা আবশ্যক হতে পারে ; এইজন্য তাকে বর্জনের কথা উঠতে পারে না।

চতুর্থ জনের নাম সমীর (বায়ু)। সমীরেরই মত সে একদিকে স্নিগ্ধ, অপরদিকে স্বচ্ছন্দ ও উদার। যা মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়, মানুষের জীবনকে সুন্দর, উন্নত ও সম্পূর্ণ করে তোলে, সেই কমনীয় বস্তুগুলিকে অনাবশ্যক বলে বর্জন করার কথা সে কল্পনা করতে পারে না।

পঞ্চম ব্যক্তি ব্যোম। সে উদাসীন ও আপনভোলা প্রকৃতির এবং কতকটা সৃষ্টিছাড়া ধরনের মানুষ। ব্যোমের দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষিতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আধ্যাত্মিক আদর্শকেই সে পরম সত্য বলে জানে। তার মতে—যা এমনিতে অনাবশ্যক বলে মনে হয়, তাই মানুষের সবচেয়ে বেশী আবশ্যক। ব্যোমের মতে যাতে জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটে, তাকেই বড় করে দেখা মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে অপমানজনক।

এই সমস্ত বিভিন্নজাতীয় চরিত্রের উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই নতুন রীতি অবলম্বনের ফলে 'পঞ্চভূত'-এর রচনাগুলি

অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।* আশ্চর্যের বিষয়, বিতর্ক ও বাদপ্রতিবাদের অবতারণা রচনাগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি, বরং তাদের একটি অভিনব শ্রী দান করেছে। এই রচনাগুলির মধ্যে যুক্তির সঙ্গে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের, মনীষার সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সম্মিলন সাধিত হয়েছে। এদের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিতর্কের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু সে পথে তিনি কাব্যের অমৃত সিঞ্চন করতে করতে গিয়েছেন।

বিভিন্ন বক্তার উক্তির বিভিন্ন সুর বচনাগুলির মধ্যে অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। ক্ষিতির বাস্তবনিষ্ঠা, ব্যোমের উদাসীন ভাব, সমীরের উচ্ছলতা, দীপ্তির তেজস্বিতা, স্রোতস্বিনীর মৃদুতা এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশের ফলে রচনাগুলি রামধনুর মত নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

এই রচনাগুলির আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচনার অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলি এদেব মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারা কথার বাহন মাত্র নয়। লেখক তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দন দেখিয়েছেন এবং নানারকম মানবিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রের তুলনায় কম সজীব নয়।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের আঙ্গিকটি আর একটি কারণের জন্য বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে। দু' একটি রচনা বাদ দিলে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রচনারই বিষয় ব্যক্তিগত নয়, বস্তুগত। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা-কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যই মুখ্য হয়ে ওঠে, তার ফলে প্রবন্ধটিও সরসতা লাভ করে। কিন্তু বস্তুগত প্রবন্ধে—আলোচিত বিষয়বস্তুর গুরুভারে রচনার প্রসাদগুণ ততটা স্ফূর্তি পায় না। 'পঞ্চভূত'-এর রচনাগুলিতে বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে ছয় ব্যক্তির লঘু ও সরস কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, তার ফলে বিষয়বস্তুর ভার লাঘব হয়ে রচনাগুলিতে স্বচ্ছন্দতা ও প্রসাদগুণ সঞ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' নামে একটি

---

* 'পল্লিগ্রামে', 'মন' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'—এই তিনটি রচনায় এই আঙ্গিক অনুসৃত হয় নি। এদের সঙ্গে পঞ্চভূত-সভার একটা যোগসূত্র অবশ্য আছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করেছি।

প্রবন্ধে* দুই ব্যক্তির লঘু কথোপকথনের ভিতর দিয়ে গুরু বিষয়ের আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই বিষয়ে প্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন, 'পঞ্চভূত'-এর আঙ্গিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের আঙ্গিকের তুলনায় অনেক বিচিত্র ও ঐশ্বর্যময়।

'পঞ্চভূতে'র মধ্যে কোন ত্রুটিই যে নেই, তা নয়। কোন কোন রচনায় পঞ্চভূত ও ভূতনাথবাবুর মানবিকতা তাঁদের কথার আড়ালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখন আর তাঁদের সজীব চরিত্র বলে মনে হয় না। কোন কোন জায়গায় বিভিন্ন চরিত্রের মূল পরিকল্পনাব সঙ্গে তাদের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। কোথাও কোথাও আবাব বিভিন্ন চরিত্রেব সংলাপের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা হয় নি। কয়েক জায়গায় কোন বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন-মুখী যুক্তিগুলির উপস্থাপনে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দিয়েছে, সেখানে এক পক্ষের যুক্তিই গুরুত্ব লাভ কবেছে, বিশেষ করে বাস্তববাদী ক্ষিতির যুক্তিগুলি অনেক জায়গায়ই লেখকের সুবিচার লাভ কবেনি। ভূতনাথবাবুকে ক্ষিতি বলেছিল,

"তোমার হাতে লেখনী পড়িলে যত সব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহিব করিবে।"

ক্ষিতির এই আশঙ্কা ক্ষেত্রবিশেষে সত্যে পরিণত হয়েছে।

তাছাড়া, 'পঞ্চভূতে'র কয়েকটি রচনায় স্থানবিশেষে কোন কোন চরিত্রের ভাষণ দীর্ঘ ও কবিত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে, তার ফলে কথোপকথনের স্বচ্ছন্দ লঘু ভাবটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য তাতে কিছু পরিমাণে রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই বইয়ে কয়েকটি ছোটখাট ত্রুটিও রয়ে গিয়েছে, এই প্রবন্ধের শেষে আমরা সেগুলির দৃষ্টান্ত দিয়েছি।

কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি একান্তই গৌণ ও অকিঞ্চিৎকর। মোটের উপর 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্র-প্রতিভার সবচেয়ে পরিণত সৃষ্টিগুলির অন্যতম। এই বইয়ের মধ্যে যেভাবে

---

* এই প্রবন্ধটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গৌরদাস বাবাজী ও রামবল্লভবাবুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে গৌরদাস বাবাজী ও হরিদাস বৈরাগীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অপূর্ব কবিত্বশক্তির সঙ্গে উচ্চাঙ্গের সমীক্ষণশক্তির সমন্বয় সাধিত হয়েছে, তার তুলনা অন্যত্র বিরল।

'পঞ্চভূতে' বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে সবগুলিই যে অখণ্ডনীয় বা সর্বজনগ্রহণীয়, তা নয়। কিন্তু 'পঞ্চভূতে'র প্রত্যেকটি রচনাই একটি প্রসঙ্গের নানা দিক সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আমাদের মনে অজস্র নতুন নতুন চিন্তার উদ্বোধন করে। এইখানেই এদের সার্থকতা। কয়েকটি জায়গা ভিন্ন এই রচনাগুলির মধ্যে অবান্তর কথা কোথাও স্থান পায় নি। প্রায় সব কথাই মূল্যবান এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা ও মৌলিকতা তাদের মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত স্বতঃপ্রকাশ। /

এখন আমরা 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের বিভিন্ন রচনা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

'পরিচয়' নামক রচনাটির প্রথম অংশে পঞ্চভূত-সভার সভ্য ও সভ্যাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ডায়ারি লেখার গুণ ও দোষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দীপ্তি ডায়ারি লেখার পক্ষপাতী, কারণ আমাদের জীবনে যে সমস্ত চিন্তা, ভাব, ঘটনা প্রতিদিন প্রবল সুখ-দুঃখের ঢেউ তুলে আমাদের বিচলিত করে যায়, ডায়ারিতে সেগুলি ধরে রাখলে মনে হয় যেন জীবনের অনেকখানি হাতে রইল। কিন্তু ভূতনাথবাবু এবং স্রোতস্বিনী ডায়ারি লেখার বিরোধী। কারণ ডায়ারি লিখলে বিধাতার সৃষ্ট জীবন যে রেখা ধরে চলছে, তার পাশেই কলম দিয়ে আর একটা রেখা সৃষ্টি করা হয়; জীবনের গতি রহস্যময়, তার মধ্যে নানারকম আত্মখণ্ডন, স্ববিরোধ, পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে; কিন্তু মানুষের কলম একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করতে চায়, প্রতি ঘটনা সম্বন্ধে সে একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; জীবনকে সে তার সিদ্ধান্তের অনুবর্তী করতে চায়। এক কথায় ডায়ারি সত্যকার জীবনের পাশে একটি কৃত্রিম জীবন খাড়া করে তোলে। ডায়ারি লেখার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি এই যে, যে সমস্ত ভাব, স্মৃতি ও উচ্ছ্বাস, সুখদুঃখ ও রাগদ্বেষ সাময়িকভাবে আমাদের জীবনে এসে পরে যথা-সময়ে স্বাভাবিকভাবে ঝরে গিয়ে মিলিয়ে যায়, ডায়ারি সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে। অথচ সেগুলি ঝরে যাওয়াই দরকার, কারণ তা হলে জীবনের বাড়াবাড়িটুকু চুকে গিয়ে

জীবনের মোটামুটিটুকু টিকে থাকবে, সেইটিই মানুষের সত্যকার রূপ। সেইসব তুচ্ছ বিষয়কে বৃহৎ করে তুললে, অর্ধস্ফুট ভাবগুলিকে অতিস্ফুট করে তুললে মনের সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়।

ভূতনাথবাবু ও স্রোতস্বিনী ডায়ারি লেখার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি যে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই মনের কথা, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই; কারণ রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার বিদেশে ভ্রমণ করার সময় ভিন্ন আর কখনও নিজের ডায়ারি রাখেন নি। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের এক জায়গায় দেখি রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন যে তিনি ডায়ারি লেখার পক্ষপাতী নন।

যাহোক, ডায়ারি লেখার বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি দেখাবার পরেও ভূতনাথবাবু ডায়ারি লিখতে রাজী হয়েছেন, তবে সে ডায়ারিতে তাঁর নিজের কথা তিনি লিখবেন না, তার বদলে লিখবেন পঞ্চভূত-সভার বিভিন্ন আলোচনার বিবরণ। অবশ্য সেই বিবরণ লেখবার সময় সবক্ষেত্রে "সত্যের অনুরোধ" পালন না করতে এবং বন্ধুদের "মুখে কথা বানাইয়া" দিতে তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না।

'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' 'পঞ্চভূত'-এর অন্যতম বিশিষ্ট রচনা। এর মধ্যে একদিকে রবীন্দ্র-নাথের সমাজ-সম্বন্ধীয় চিন্তা, অপরদিকে গভীরসঞ্চারী ভাবদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদকে রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেন নি। শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। সমাজের উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে তিক্ত বিরোধের সম্পর্ক দূর হয়ে একটি সুস্থ, সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হোক, এ'ই তিনি চেয়েছিলেন। 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নামক রচনাটির প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথ জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করেছেন, তার থেকে তাঁর এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাটির দ্বিতীয় অংশে কিন্তু জমিদার-প্রজা-সম্পর্কের আলোচনাকে পিছনে ফেলে রেখে তিনি সৌন্দর্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছেন। এই অংশের সৌন্দর্য ও ভাবগভীরতা অসামান্য।

রচনাটির সংক্ষিপ্তসার এই:—একদিন পঞ্চভূত ও তাদের সভাপতি বাংলার পল্লী

অঞ্চলে নৌকায় চড়ে নদীপথে ভ্রমণ করছিলেন। তখন এক সময় কোন এক গ্রামে জমিদারের পুণ্যাহের বাজনা শুনে স্রোতস্বিনী সে সম্বন্ধে উৎসুক হল। পুণ্যাহ কাকে বলে, তা ভূতনাথবাবু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তখন দীপ্তি বাজনার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করল। তার উত্তরে বাস্তববাদী ক্ষিতি বলল পুণ্যাহের বাজনা খাজনা-দেবীর কাছে প্রজাদের বলিদানের বাজনা।

ভূতনাথবাবু কিন্তু এই ব্যাখ্যাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে পারলেন না। তাঁর মতে এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেব মধ্য দিয়ে বৎসরের একটিমাত্র দিনের জন্যও যদি রাজা ও প্রজার মধ্যে ভাবের সম্পর্ক স্থাপন করে নীচ লোভ ও হীন ভয়কে ভুলে থাকা যায়, সেও ভাল।* পৃথিবীতে আদিম কাল থেকেই তো নানা আকারের গ্লানি পুঞ্জীভূত হচ্ছে। মানুষ মালিন্যকে রূঢ় নগ্ন সত্য বলে জানে, কিন্তু তাকে সে তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করতে পাবে না, তাকে একটা উচ্চ ভাবের প্রলেপ দিয়ে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করে।

এর থেকে ভূত-সভার সদস্যদের মধ্যে একটি আলোচনার সূত্রপাত হল। ভূতনাথবাবু, সমীর এবং স্রোতস্বিনী এই পুণ্যাহের দিনটিকে কেন্দ্র করে জমিদার ও প্রজার শুষ্ক সম্পর্কের দৈন্যকে ভাবের সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তোলার প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত মাধুর্য ব্যাখ্যা করলেন। অধ্যাত্মবাদী ব্যোমও এই আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল, যেখানে পরাভব স্বীকার না করে উপায় নেই, সেখানে মানুষ আপনার হীনতার গ্লানি বিদূরিত করবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়, এইভাবে মানুষ নির্দয় প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করেছে এবং তার ফলে সে তাদের মধ্যে গৌরবের সঙ্গে বাস করে আসছে। এই কথার উত্তরে ক্ষিতি একটি অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটন করে বলল, ভাবের দ্বারা এইভাবে অভাবকে আবৃত করবার সামর্থ্য না থাকলে মানুষ পশুর অধম হয়ে যেত।

---

* শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের যে জমিদারী ছিল, তার 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বহুবার যোগদান করেছেন। তিনি 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছিলেন এবং তাকে জমিদার ও প্রজার প্রকৃত মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর লেখা 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য। এই অনুষ্ঠানটি তাঁর কবিচিত্তকে কতখানি উদ্দীপিত করে তুলেছিল, 'পঞ্চভূতে'র এই রচনাটিতে তারই প্রমাণ মেলে।

ক্ষিতির এই তিক্ত মন্তব্যকে ভূতসভার ভাববাদী সদস্যেরা নীরবে পরিপাক করতে পারলেন না। তাঁরা যুক্তির পর যুক্তি দেখিয়ে, দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়ে ক্ষিতির উপলব্ধির ত্রুটি প্রদর্শনের চেষ্টা করতে লাগলেন। স্রোতস্বিনী দেখাল যে মানুষ শুধু প্রবলের সঙ্গে বাধ্য হয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে ভাবের সম্পর্ক পাতায় না, অসহায় মূক্ পশুর সঙ্গেও অযাচিতভাবে সম্পর্ক পাতায়, যেমন গাভীকে আমরা মা বলি। স্রোতস্বিনী পশুর সঙ্গে মানুষের এই জাতীয় ভাব-সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে মানুষের আত্মার সৃজন-চেষ্টা উপলব্ধি করেছে। ব্যোম স্রোতস্বিনীর উপলব্ধিকে আরো গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে বলল, মানুষের "কেন্দ্রবাসী আত্মা" ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপন করছে, জড়ের মধ্যে সেতু বন্ধন করছে। সমীর বলল, আমরা ভারতবাসীরা শুধু প্রাণীজগৎ নয়, চার পাশের নিত্যপরিচিত জড় পদার্থের সঙ্গেও আত্মীয়তা পাতিয়েছি—নদীর সঙ্গে, বসুন্ধরা থেকে বাস্তুভিটা পর্যন্ত সকলের সঙ্গে। জড় থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে, একথা আমাদের কাছে তাই অদ্ভুত বলে মনে হয় না। আমাদের ভাষায় 'থ্যাঙ্ক' শব্দের প্রতিশব্দ না থাকলেও আমরা উপকারী সকলের কাছে, এমন কি পশু ও জড়ের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি তাদের সঙ্গে এই জাতীয় সম্পর্ক স্থাপন করে।

সমীরের মন্তব্যের সূত্র ধরে ব্যোম বলল, আমরা ইউরোপীয় ধরনের কৃতজ্ঞতা দেবতার প্রতিও প্রকাশ করি না। দেবতার সঙ্গে আমরা স্নেহের সম্পর্ক পাতিয়েছি। স্নেহের দাবীর অন্ত নেই বলে স্নেহের মধ্যে একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, যা স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশী মধুর ও গভীর। রামপ্রসাদের গানে তার দৃষ্টান্ত মেলে। ইউরোপীয় ভাষায় এই উদার অকৃতজ্ঞতার তর্জমা অসম্ভব।

ক্ষিতি ব্যোমের এই মন্তব্যের উপরে কটাক্ষ করে বলল, ইউরোপীয়দের প্রতি ভারতবাসীদের অকৃতজ্ঞতার পিছনেও বোধ হয় এই ধরনের একটা গভীর ও উদার কারণ আছে ; সভার সকলেই ভারতবাসীর প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় ইউরোপীয়দেব দৃষ্টিভঙ্গীর অপকর্ষ প্রদর্শন করলেন, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়ন ভিন্ন তাঁদেব এই আলোচনা অথবা তার মর্ম গ্রহণ দুটোর কোনটাই সম্ভব হত না।

তখন ভূতনাথবাবু এক সুদীর্ঘ ভাষণের মধ্য দিয়ে এর উত্তর দিলেন। তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে এই। প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয়ের সম্পর্ক ভাইবোনের মত ; আমরা প্রথম

থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। তার ফলে আমরা প্রকৃতির মধ্যে নতুন সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্য অনুভব করতে পারি না, এক ধরনের অন্ধ অচেতন স্নেহে তার সঙ্গে মাখামাখি করি। ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক যেন স্ত্রী-পুরুষের মত, তারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। তাই ইউরোপীয়রা বাইরে থেকে প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করছে। প্রকৃতির সঙ্গে ইউরোপীয়দের এই মিলন-প্রচেষ্টার ফলে তাদের আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির আত্মার সংঘর্ষ হয়ে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ মাত্রায় মণ্ডিত হয়ে উঠছে। আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম ঐক্যের মধ্যে অত আধ্যাত্মিকতা থাকার কথা নয়, নেইও। আমরা প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে সজীব করে দেখি, কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না, বরং আধ্যাত্মিককে আমরা বাস্তব করে তুলি ; আমরা তার উপর মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করে তার কাছে ঐহিক সুখ-সম্পদ-সফলতা প্রার্থনা করে সৌন্দর্যহীন মোহে এবং অন্ধ অজ্ঞানতায় দেবতাকে পুতুল করে দিই। যেমন আমরা স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিনী জাহ্নবীর কাছে আত্মার আনন্দ লাভ করে সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে দেবতা বানিয়ে তার কাছে ইহকাল পরকালের সুবিধা প্রার্থনা করি। বক্তা তাই জাহ্নবীর কাছে ইহকালের সম্পদ বা পরকালের পুণ্য কামনা করবেন না এবং তা চাইলেও তিনি তা পাবেন না। শৈশবকাল থেকে জাহ্নবী ও তাঁর মধ্যে যে অবিমিশ্র আনন্দ-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাতেই তিনি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন, তারই মাধুর্যে তাঁর অন্তর-মন পরিপূর্ণ।

এই রচনাটির প্রথম অংশে মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে পশুর, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সম্পর্ককে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষাংশে প্রকৃতির সম্বন্ধে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমীর, ব্যোম ও ক্ষিতির উক্তির মধ্য দিয়ে প্রথমাংশের প্রসঙ্গ থেকে শেষাংশের প্রসঙ্গে আসার যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে। প্রথমাংশের প্রসঙ্গটি বিভিন্ন সুরের উক্তি ও বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়ে আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে যেমন বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি প্রত্যেক বক্তার চরিত্রের সঙ্গে তাদের উক্তির সঙ্গতিও আমরা লক্ষ্য করি। শেষাংশের প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে কিন্তু সভাপতি একাই বলেছেন। প্রথমাংশের আলোচনায় কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত না হলেও আলোচনাটির মধ্যে আদ্যন্ত একটি শৃঙ্খলা আছে, তাতে

বিভিন্ন বক্তার উক্তির মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে, মানুষ যে অন্য মানুষের সঙ্গে, প্রাণিজগতের সঙ্গে এবং জড় প্রকৃতির সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক স্থাপন করে, তার অন্তর্নিহিত হেতু প্রধানত দুটি—আত্মার সৃজন-চেষ্টার চরিতার্থতা এবং মানুষের কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। এ সম্বন্ধে বাস্তববাদী ক্ষিতির প্রতিবাদ অন্যান্য বক্তারা যথোচিত যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন। ক্ষিতির বিপরীতমুখী যুক্তিগুলি আলোচনাটিকে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন দিকে চালিত করে তাকে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সাহায্য করেছে। শেষাংশের প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে সভাপতির মন্তব্যগুলি অত্যন্ত মৌলিক, হৃদয়গ্রাহী, সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ। অপূর্ব তীক্ষ্ণদর্শিতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করে দুইয়ের পার্থক্য সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। ভাবালুতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন নি, বরং ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় তার অপূর্ণতা কোথায়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষণের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে জাহ্নবীর উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি রয়েছে, তা যে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই মনের কথা, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

"ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবী, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না। কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে, আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ, সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য চয়ন করিতে পারিয়াছি যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণশতদলের মতো সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।"

অনুচ্ছেদটির ভাষা অত্যন্ত আবেগধর্মী, কিন্তু অসামান্য সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ; আমাদের মন এর মধ্যে এক অপার্থিব রসের আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে হয়, এই অনুচ্ছেদটি রচনা করবার সময় রবীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে পঞ্চভূতের আলোচনা-সভার পরিবেশটি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

আলোচ্য রচনায় একটি মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার আছে। এব এক জায়গায় ভূতনাথবাবু বলেছেন, "আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।" এই উক্তির সমর্থনে ভূতনাথবাবু জনৈক ইংরেজ কবির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রী-পুরুষ রূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন , সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরেব প্রতি এমন অনিবার্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।"

এর থেকে মনে হয় যে ববীন্দ্রনাথ বলতে চান যে ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতেই এই সত্য প্রথম ধবা পড়েছিল। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। আমাদের বৈষ্ণব আচার্যেরা বহু আগেই এই সত্য উপলব্ধি কবেছিলেন। গৌড়ীয বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তিই এই তত্ত্বেব উপরে প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবেরা বলেন রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা দুই রূপ ধারণ করেন লীলা-রস আস্বাদনেব জন্য ; কারণ অভেদে লীলা সম্ভব নয়, পবস্পব হতে ভিন্ন থেকে মিলনের প্রচেষ্টা কবাতেই লীলার রস নিবিড় হয়ে ওঠে , সেই রস আস্বাদনের জন্যই ভগবান রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই রূপ ধারণ করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে,

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥"

অবশ্য আমাদের সাধনমার্গে এই তত্ত্ব বহু পূর্বে উপলব্ধ হলেও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তার কোন প্রভাব পড়ে নি।

'মনুষ্য' নামক রচনাটিতে সাধারণ মানুষের উপর রবীন্দ্রনাথের সুগভীর প্রীতি ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাটির সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

ভূতনাথবাবু তাঁর ডায়ারিতে ভূতসভার যে বিবরণ লেখেন, তাতে ভূতসভার

সদস্যদের চেহারা ও কথাবার্তা অবিকলভাবে কেন পাওয়া যায় না, সেই প্রশ্নের উত্তরে একদিন ভূতনাথবাবু বললেন, বাস্তবের কোন মানুষকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে হলে তাকে অবিকলভাবে চিত্রিত করা সম্ভব হয় না। একদিকে যেমন তার অপ্রয়োজনীয় অংশকে বর্জন করতে হয়, অপর দিকে চরিত্রের অন্তর্মহিমা বিকশিত করে তোলবার জন্যে অনেক অস্ফুট ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট করে তুলতে হয়। অবশ্য, মানুষের অনন্ত রহস্যকে সাহিত্যিক পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, একথা মনে করলে ভুল করা হবে।

অতঃপর নানা কথার পর ভূতনাথবাবু বললেন, কাউকে ভালবাসলে তবেই তার মধ্যে অনন্তের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমই সাধারণকে অসাধারণ করে তোলে। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই তত্ত্বটি আছে। বৈষ্ণবেরা সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ, প্রভুর প্রতি দাসের ভক্তি, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সৌহার্দ্য, কান্তের প্রতি কান্তার প্রেমের মধ্যে একটি সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করেছিলেন, তাই তাকে ঈশ্বর-আরাধনার রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর সমীর, ব্যোম ও স্রোতস্বিনী সাহিত্যে মানুষের রূপায়ণ কী ভাবে হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তাদের মত প্রকাশ করল। তাদের উক্তির সারমর্ম সংক্ষেপে এই। সাহিত্যে মানুষকে অবান্তরবর্জিত, নিখুঁত, সম্পূর্ণ করে ফুটিয়ে তুললে তার মধ্যে আর সজীবতা থাকে না। অসম্পূর্ণতাই মানুষের প্রাণবৈশিষ্ট্য, তর্ক, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত যেমন সুনির্দিষ্ট উপসংহারের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে, মানুষের মধ্যে সেই জাতীয় উপসংহার দেখালে তার চরিত্রকে খণ্ডিত ও নষ্ট করে ফেলা হয়। কোন মানুষকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে হলে তার অসম্পূর্ণতা সমেত এবং তার বিশিষ্ট ভঙ্গীটি সমেত রূপায়িত করতে হবে। সাহিত্যে বিষয় ও ভঙ্গীর মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে তর্ক আছে। আসলে বিষয়টা দেহ এবং ভঙ্গীটা জীবন। বিষয় ও ভঙ্গী দুইয়ে মিলে সাহিত্য জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে ওঠে। মানুষের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজস্ব মানসিক আকৃতি আছে, তার দিকে চাইলে পুরোনো মনুষ্যত্বের একটি নতুন বিস্তার আবিষ্কার করা যায়।

তখন দীপ্তি বলল যে সাহিত্যের মধ্যে সব মানুষের মানসিক আকৃতি ভঙ্গী অক্ষুন্ন রেখে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। যার ভঙ্গী ও স্বরূপ অবিচ্ছেদ্য, ভঙ্গীর মধ্যেই

স্বরূপ প্রকাশিত, সে অবিকল আকারেই সাহিত্যে রূপায়িত হবে। কিন্তু অনেকের ভঙ্গী তাদের স্বরূপকে গোপন করে। সে ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে খোলা ছাড়িয়ে শাঁস বার করার মত সেই সব মানুষের ভঙ্গীটা বাদ দিয়ে স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে হয়। কিন্তু সেরকম ক্ষেত্রেও সেই জাতীয় মানুষেব সাহিত্যিকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তার স্বরূপটুকুকে তিনি সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন বলে। সেটুকুই কজন পারে বা করে? অনেকের স্বরূপের ভিতরেও এমন কিছু নেই, যা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে।

কিন্তু সমীর একথা মানতে পারল না। তার মতে সংসারের অসংখ্য মানুষের মধ্যেই প্রকৃত সম্পদ আছে। যারা উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবহেলিত, সেই জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান রয়েছে, তা খুঁজে বাব করলে দেখা যাবে তারা মহাকাব্যের নায়কদের সমগোত্রীয়। তাকেই আবিষ্কার ও প্রকাশ করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের অভাব নেই, অভাব শুধু তাদেব খুঁজে বার করবাব মত সহানুভূতির।

তখন ভূতনাথবাবু বললেন যে এই অভাব থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ বাইরের লোকের কাছে যে মানুষ একান্ত তুচ্ছ, আপনার ভালোবাসার জনের কাছে সে অসামান্য। এই প্রসঙ্গে ভূতনাথবাবু একটি মুহুরীব দৃষ্টান্ত দিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে সে 'পিসিমা', 'পিসিমা' বলে কেঁদে উঠেছিল। সেই কান্না শোনার পবে ভূতনাথবাবুর কাছে তার গৌববহীন ক্ষুদ্র জীবনটি তার পিসিমার ভালোবাসার আলোকে অমূল্য মহিমায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। এইরকমভাবে প্রতি সামান্য মানুষই প্রেমের আলোয় গৌববান্বিত হয়ে অসাধারণত্ব লাভ কবে।

স্রোতস্বিনী তখন তাব হিন্দুস্থানী বেহারা নিহরের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলল যে ভালোবাসার এই যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ সমস্ত প্রাণ ও জ্যোতি হারিয়ে একান্ত অসহায়, সচল যন্ত্রের মত হয়ে পড়ে।

ভূতনাথবাবু বললেন, বিচ্ছেদ ও মৃত্যু আছে বলে মানুষের ভালোবাসার মধ্যেও একটা চিরন্তন বিষাদ রয়ে গিয়েছে।

স্রোতস্বিনী তখন বলল যে ভালোবাসা কেবলমাত্র সমাজের উপরের স্তরেই নেই, নীচের স্তরেও পূর্ণমাত্রায় আছে। নবযুগের সাহিত্যিককে সেই অন্ধকার নীচের স্তরের মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করে তুলতে

হবে, সেই সব মানুষকে মানবরূপে প্রকাশ করে তাদের আমাদের আত্মীয় রূপে পরিচিত করিয়ে দিতে হবে।

ক্ষিতি ও সমীর বলল, সাহিত্যে এই কাজ ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সুরু হয়েছে, সভ্যতার ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও প্রবল ও অভিজাত সমাজের মোহ ক্রমশ পরিত্যাগ করে অবহেলিত সাধারণ মানুষের জগতের দিকে নিজের পরিধি প্রসারিত করছে।

এই রচনার নাম 'মনুষ্য'—কিন্তু এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তার থেকে মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত ছিল 'সাহিত্য ও মানুষ'। রচনাটির সূচনা হয়েছে সাহিত্যে মানুষের রূপায়ণ কীভাবে হওয়া উচিত, সেই সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে ; শেষ হয়েছে উপেক্ষিত সাধারণ মানুষদের বিষয়ে সাহিত্যিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু রচনাটির মাঝখানে প্রেম ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কীভাবে অনন্ত রহস্যের উপলব্ধি করা যায় এবং প্রেমের আলোকে সাধারণ মানুষ কেমন করে অসাধারণ হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। রচনাটিতে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তির মধ্য দিয়ে যে আলোক পাত করা হয়েছে, তা খুবই অভিনব ও উজ্জ্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু রচনাটির একটি প্রধান দোষ এই যে এর মধ্যে সংহতির অভাব রয়ে গিয়েছে। সমগ্র রচনাটিতে কোন কেন্দ্রীয় বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি এবং আলোচনা প্রায়ই নিতান্ত আকস্মিকভাবে এক বিষয় ছেড়ে অন্য বিষয়ে চলে গিয়েছে।

প্রেমিকের ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সামান্য লোক অসামান্য হয়ে ওঠে, এই কথা রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য রচনাটির মধ্যে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছেন। এই কথা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যত্রও পাওয়া যায়, 'প্রেমের অভিষেক' কবিতা এবং 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্যের চিঠির মধ্য দিয়ে এই কথাটিই তিনি ভিন্নতর ভঙ্গীতে বলেছেন। কিন্তু ভালোবাসার জনের দৃষ্টিতে কোন মানুষ যেমনভাবে প্রতিভাত হয়, সাহিত্যিকও যদি তেমনভাবেই মানুষকে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করে তোলেন, তাহলে তা সার্থক হবে কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। মানুষকে তার ভালোবাসার জন যে দৃষ্টিতে দেখে তা মোহাঞ্জনজড়িত, তার মধ্যে যে অসামান্যত্ব সে অনুভব করে, তার অনেকখানিই প্রকৃত নয়, আরোপিত। পক্ষান্তরে মানুষের সত্যকার স্বরূপটিকেই

সাহিত্যে রূপায়িত করে তোলা সাহিত্যিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অতএব মানুষের উপরে প্রেমের আলোক পাত করে তাকে প্রকাশ করবার বদলে বস্তুগত বা objective দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করাই সাহিত্যিকের পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই রচনায় অত্যন্ত প্রাণস্পন্দী ভাষায় এই মত ব্যক্ত করেছেন যে সাহিত্যেব মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের উপেক্ষিত অবহেলিত মানুষের কথা প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর নিজের সাহিত্যে, বিশেষভাবে উপন্যাসগুলিতে নিম্ন-স্তরের মানুষদের চেয়ে উচ্চস্তরের মানুষরাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

নিম্নস্তরেব লোকদের কাহিনী সাহিত্যে রূপায়িত করে তোলার কথা রবীন্দ্রনাথ বললেও রূপায়ণেব পদ্ধতি কী বকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে এই রচনাটির মধ্যে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। বাস্তববাদী সাহিত্যিকেরা নিম্নস্তরের লোকদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবিকৃতভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা কবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতির পক্ষপাতী নন। একাধিক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে, জীবনের যে অংশ কুৎসিত, তা কিছুতেই সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কিন্তু সুন্দব ও কুৎসিত দুটিই জীবনেব অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং জীবনের কুৎসিত দিকটিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সুন্দর দিকটিকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুললে তা কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে জীবনেব সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে বলা চলবে কেমন করে ?

এই রচনাব সর্বশেষ অংশে ববীন্দ্রনাথ ক্ষিতি ও সমীরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে বর্তমান যুগের সাহিত্যিকরা ক্রমশ অভিজাত সমাজেব মোহ পরিত্যাগ কবে সাধারণ নরনারীদের কাহিনীকে তাঁদের সাহিত্যে রূপ দিচ্ছেন। একথা সত্য বটে, কিন্তু যেভাবে তাঁরা রূপ দিচ্ছেন, তার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলবার আছে। এই সব লেখকদের একটা বড অংশ নিজেরা গজদন্তের গম্বুজে বসে দূর থেকে সাধাবণ লোকদেব জীবনকে দেখেন এবং সেই দেখাকে ভাবালুতার সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যে রূপায়িত করেন। এর মধ্যে তাঁদের সাধারণ লোকদের প্রতি সহানুভূতির বদলে নিজেদের রচনায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসই বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সব সাহিত্যিকরা অবহেলিত সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার ক্লেশ স্বীকার করেন না, তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিক সততারই একান্ত অভাব। অবশ্য সাধারণ লোকদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সাহিত্যিকও এ পর্যন্ত কয়েকজন আবির্ভূত

হয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁরা সংখ্যায় অল্প এবং তাঁদের সকলের রচনাই উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। অতএব সমাজের নিম্ন স্তরের উপেক্ষিত লোকদের কথা তার প্রাপ্য মর্যাদার সঙ্গে সাহিত্যে রূপায়িত হচ্ছে বলে আশ্বস্ত হবার দিন এখনও আসে নি।

'নরনারী' নামক রচনাটি যুক্তি-পরম্পরার শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের সমস্ত রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রাধান্যের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা দিয়ে রচনাটির সূচনা করা হয়েছে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে নর ও নারীর প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের পার্থক্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। রচনাটির সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও লেখকের অতন্দ্র বিচারবুদ্ধি ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি।

রচনাটির সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

ভূতসভাতে সমীর একদিন একটি জটিল সমস্যা উত্থাপন করল। সে প্রশ্ন করল, ইংরেজী সাহিত্যে নারী এবং পুরুষ সমান প্রাধান্য লাভ করেছে—ডেসডিমোনা, ক্লিওপেট্রা এবং লামারমুরের নায়িকার তুলনায় ওথেলো, ইয়াগো, অ্যাণ্টনি এবং রেভনস্‌উডের নায়ক কিছুমাত্র হীনপ্রভ নয়; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রের প্রাধান্য অনেক বেশী—কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী, রোহিণী ও ভ্রমর এবং কপালকুণ্ডলার কাছে নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, নবকুমার একান্তই ম্লান ও নিস্তেজ, প্রাচীন বাংলা কাব্যেও একই দৃষ্টান্ত মেলে, এর কারণ কী ?

এর উত্তরে ক্ষিতি বলল যে সমীর বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমস্ত উপন্যাসের নাম করল, সেগুলি মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নয়। পুরুষের কার্যজগতে প্রভুত্ব, কিন্তু মানস-জগতে নারীরই প্রভাব বেশী। এইজন্য মানসপ্রধান সাহিত্যে নারীর প্রাধান্য লাভই স্বাভাবিক।

দীপ্তি তার প্রতিবাদ করে বলল, কার্যপ্রধান উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'আনন্দমঠে'ও বিমলা ও শান্তির চরিত্র যে-কোন পুরুষের তুলনায় অনেক জীবন্ত হয়ে ফুটেছে। অপরদিকে সমীর ওথেলো, কিং লিয়ার প্রভৃতি মানসপ্রধান নাটকে পুরুষের বিশিষ্ট ভূমিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলল যে হৃদয়বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই যে শ্রেষ্ঠ তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ কৃত্রিম, সুতরাং

নিরর্থক ; জীবনের আগুণে যখন মানবচরিত্র টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে, তখন তার মধ্যে অসংখ্য নতুন নতুন বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখা যায়।

তখন ব্যোম বলল যে কার্যক্ষেত্র স্ত্রীলোকেরই জন্য। সত্যকার পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী। লক্ষ কাজের ভিতরে থেকেও মানুষ মনের মধ্যে একটি নির্জন-লোক সৃষ্টি করে তার মধ্যে বাস করে। ভীষ্ম ও নেপোলিয়ন তার দৃষ্টান্ত। নির্জনের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, ভাবের আবির্ভাব। কর্মবন্ধনে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হওয়া তাই স্ত্রীলোকেব পক্ষেই সম্ভব, পুরুষের পক্ষে নয়।

এর উত্তরে দীপ্তি বলল, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের কাজ করার সুযোগ দেয় না। তখন ব্যোম বলল, স্ত্রীলোকেরা নিজেদেব কর্মবন্ধনে নিজেরা বদ্ধ হয়ে রয়েছে। অন্তঃপুরের মধ্যে, নিজেদের কার্যাবশেষের মধ্যে তারা নিজেদের নিহিত ক'রে রেখেছে। একবার তারা যদি বহিঃসংসারেব কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে দারুণ কাণ্ড বাধে। পুরুষ নানারকম চিন্তা ক'রে কাজ করে বলে সে নারীর মত অত দ্রুতবেগে তুমুল ব্যাপার বাধিয়ে তুলতে পাবে না, তার কাজ করতে বিলম্ব হয়। নারীর প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বেঁধে রেখেছে, তাই সেই শক্তি সংসারের সেবায় নিয়োজিত। নারীরা এরকম শক্তিময়ী বলে তারা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করেছে, এ নিয়ে তর্কের কোন কারণ নেই।

তখন ভূতনাথবাবু বললেন যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেবা আমাদের দেশের পুরুষদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বলেই আমাদের সাহিত্যে তাদের প্রাধান্য। এবপর আলোচনাটি অল্পক্ষণেব জন্য অন্য দিকে চলে গেল। স্ত্রীলোকেরা স্তুতিবাক্য শুনতে কেন ভালোবাসে তাই নিয়ে ভূতসভার সদস্যেরা কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন এবং এই আলোচনাব সময় ব্যক্ত ক্ষিতির একটি মন্তব্যের সূত্র ধরে স্রোতস্বিনী বলল যে, পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের কার্যক্ষেত্র বৃহৎ না হলেও তার কার্যের গৌরব অসীম। এই বিষয়-সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক শেষ হলে ভূতনাথবাবু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন। ক্ষিতি তার প্রমাণ চাইলে তিনি বললেন, আমাদের দেশের পুরুষেরা অকর্মণ্য, পুরুষের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। তারা লক্ষ্যহীন, সহস্র অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। আমাদের সমাজ-জীবনের যে অংশ পুরুষদের অধীন, তার মধ্যে নিরন্তর নিষ্ফলতা

ভিন্ন আর কিছু নেই। কিন্তু যে অংশে নারীর প্রাধান্য, সেই অংশ সমৃদ্ধ ও সার্থক হয়ে উঠেছে তাদের সেবা ও নম্রতা, তাদের প্রীতি, তাদের একাগ্রতার মধ্য দিয়ে।

সমীর তখন বলল, আমাদের দেশে পুরুষদের পৌরুষ হ্রাস পাওয়ায় তার মনুষ্যত্বেরও হানি ঘটেছে। এই দুর্বলতা ঢাকবার জন্য সে নিজের উপর দেবত্ব আরোপ করেছে এবং নারীও তাকে দেবতা ভেবে এতদিন পূজা করে এসেছে। এখন পুরুষেরা নিজেদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলে নারীরা অন্তহীন বেদনা ও নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হবে।

দীপ্তি বলল, বাঙালী পুরুষেরা নারীকে পতিপূজা করতে না শিখিয়ে যদি নিজেরা তাদের ভক্তির যোগ্য হবার জন্য চেষ্টা করত, সত্যকার দেবত্ব অর্জনে ব্রতী হত, তবে সব দিক দিয়েই ভাল হত। এখন তাদের কৃত্রিম দেবত্ব নিয়ে আস্ফালন করা এবং ভক্তির অভাবের জন্য স্ত্রীদের প্রতি অনুযোগ করা একান্তই হাস্যকর।

স্রোতস্বিনী নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বলল, পুরুষ ও নারী পরস্পরকে অতিরিক্ত বাড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষই দেবত্বের অধিকারী নয়। দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে বিবাদ করে কোন লাভ নেই। একজনের এক দিকে শ্রেষ্ঠত্ব, অপর জনের অপরদিকে। নারীরা হৃদয়মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মনোমাহাত্ম্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

তখন ভূতনাথবাবু বললেন, আমাদের নারী কেবল কবিতায় দেবী, মন্দিরের আসল দেবতা পুরুষেরা। আমাদের দেশে পুরুষেরাই সমস্ত সুখ-সুবিধা ভোগ করে এসেছে, নারী সব দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের সমাজে বাইরের কাজকর্ম গৌণ, গৃহধর্মই মুখ্য; তাই সেখানে নারীদের কর্মশক্তিই অধিকতর বিকশিত হবার সুযোগ পায়। আমাদের পুরুষ চিরদিনই নিষ্ক্রিয়, কিন্তু নারী চিরকাল সুশৃঙ্খলে সংসার পরিচালনা করে এসেছে, স্বামীও তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অন্যান্য দেশে বাইরের বিপুল বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পৌরুষ গঠিত হয়। কিন্তু আমাদের পুরুষদের জীবন গৃহ-কেন্দ্রিক এবং তা জননীর দ্বারা লালিত ও জায়ার দ্বারা চালিত। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র, বৃহত্তর ভাবধারার মধ্যে তাদের জীবনের বিকাশ ঘটে নি, অথচ তাদের পরাধীনতার গ্লানি ও অবমাননা নতমস্তকে বহন করতে হয়েছে। কিন্তু নারীর কর্মক্ষেত্র বাইরে নয়, ভিতরে; বাইরের কোন রাষ্ট্রবিপ্লব তার কর্তব্যপালনের প্রতিবন্ধক হয় না, পরাধীনতার মধ্যেও তার তেজ ও গৌরব অক্ষুণ্ন থাকে। আজ বিদেশী শিক্ষা এবং বিদেশের

ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত পুরুষকারের আদর্শ আমাদের দেশের পুরুষকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, তাই এখন সে বাইরের কর্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সনাতন ঐতিহ্যকে সে অতিক্রম করবে কেমন করে? তাই তার কাজের চেয়ে কথা ও আস্ফালনই বড় হয়ে ওঠে। আমাদের পুরুষেবা চিরদিন অকর্মণ্যভাবে দলাদলি, কানাকানি এবং হাসাহাসি করে এসেছে, কিন্তু নারীরা বরাবর নিজের কাজ করে গিয়েছে। তাই, আমাদের নারীবা যেমন শিক্ষাকে সহজে গ্রহণ করে জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করে দিতে পারে, পুরুষেবা তেমনভাবে পাবে না। সুতরাং আমাদের আজকের দিনের শিক্ষিতা নারীরা যদি বর্তমান যুগের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে হৃদয়ের সৌন্দর্য নিয়ে এসে দাঁড়ায়, তবে এই লক্ষ্মীছাড়া সমাজের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও অসংযম দূব হয়ে শৃঙ্খলা, স যম ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভূতনাথবাবুর কথা শেষ হলে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী সভা ছেড়ে চলে গেল। তখন বাস্তববাদী ক্ষিতি ভূতনাথবাবুব অভিমতের তীব্র সমালোচনা করে বলল, পুরুষের কর্মক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী, সেখানে সার্থকতা অর্জনের জন্য বিপুল শক্তি, সংযম ও সাধনার প্রয়োজন। নারীর কর্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ বলে প্রকৃতিগত সহজ বুদ্ধি ও সংস্কার দ্বারাই তারা তাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম। বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে অধিকাংশ পুরুষ নিষ্ফল হয় উপযুক্ত শক্তির অভাবের জন্য, কিন্তু মুষ্টিমেয় যে ক'জন সাফল্য লাভ করে, তাদের তুলনা নারীসমাজে মিলবে না। আমাদেব দেশের পুরুষদের নিষ্ফলতার কারণ বহুলাংশে আমাদের নারীরাই। নারীদের ত্যাগ স্বীকার সম্বন্ধে বলা চলে তারা ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের সন্তান ও প্রিয়জনের জন্য, তা তারা নিজেদের প্রবৃত্তি থেকেই করে। কিন্তু পুরুষের যা যথার্থ ত্যাগ তা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। তারপর নারীর সহজ প্রবৃত্তি যেমন সংসারের মঙ্গল সাধন করে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিও করে। এই অন্ধ প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির দুর্বলতার সংযোগ হয়ে বহু পরিবারে দুঃখ ও সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আমাদের নারীরা আমাদের সমাজকে এক বিরাট মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কারণ শুধু তাদের অশিক্ষা নয়, সেই সঙ্গে তাদের প্রবল হৃদয়ালুতা।

এই রচনাটির যুক্তি-সমাবেশ যেমন সুষ্ঠু ও পরিপাটি, সিদ্ধান্তগুলি তেমনি সূক্ষ্মদৃষ্টি-প্রসূত। 'পঞ্চভূতে'র অন্য কোন কোন রচনায় রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী ক্ষিতির যুক্তি-গুলিকে তেমন গুরুত্ব দেননি, কিন্তু এই রচনাটি সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না।

'নরনারী'তে তিনি ক্ষিতির যুক্তিগুলির প্রতি সুবিচার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কতকাংশে স্বীকারও করে নিয়েছেন। এর আগে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরাও বলেছিলেন যে আমাদের দেশের নারীরা পুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। 'নরনারী'তে ভূতনাথবাবুও সেই কথাই বলেছেন এবং তিনি এই মতের স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, তার অনেকগুলি একেবারে অভিনব। ভূতনাথবাবুর হৃদয়গ্রাহী ভাষণের বর্ণচ্ছটায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই এবং মনে করি এইটিই বুঝি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত। কিন্তু ক্ষিতির ভাষণ পড়ার পরে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজের মতের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতির জবানীতে স্বচ্ছ সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আমাদের দেশের পুরুষদের সাফল্য লাভের প্রতিবন্ধক কী. তিনি এই কথাই প্রকারান্তরে বলেছেন যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কাউকে শ্রেষ্ঠ না বলাই শ্রেয়ঃ কারণ উভয়ের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শেষ পর্যন্ত তিনি এও বলেছেন যে নারীর মধ্যে যেমন মহিমা আছে, তেমনি তার ত্রুটিবিচ্যুতিও আছে এবং সমাজেব সে যেমন মঙ্গলসাধন করছে, তেমনি তার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও হয়েছে। তাঁর এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বাস্তব বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যে পুরুষের চরিত্র যে নারী-চরিত্রের তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে আছে, তা রবীন্দ্রনাথ এই রচনায় দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তাঁর নিজের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে এই দোষ যাতে প্রবেশ না করে, সেজন্য তিনি চেষ্টা করেছেন এবং এই প্রচেষ্টায় তিনি সাফল্যও অর্জন করেছেন। তাঁর গোরা, নিখিলেশ বা অমিত রায় নারীচরিত্র-গুলির তুলনা কম জীবন্ত নয়। এতদিন বাঙালীর জীবন ছিল গৃহমুখী, গৃহে নারীরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। কথাসাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে বাংলা কথাসাহিত্যে নারীর চরিত্র স্বভাবতই বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে গৃহ-জীবনের পরিধিকে অতিক্রম করে সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকায় কাহিনীকে সংস্থাপিত করেছেন, তাই তাঁর উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য লাভ ক'রে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নারী-চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী উভয় দৃষ্টি-ভঙ্গীরই পরিচয় দিয়েছেন। ভূতনাথবাবুর দৃষ্টিতে বাঙালী নারীর যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোট গল্পের অনেক নারী-চরিত্রের মধ্যে সেই সব

বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় ; এইসব নারীর বাস এক করুণ মাধুর্যে বিমণ্ডিত ত্যাগ ও প্রেমের রাজ্যে, নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনের মধ্যে তাদের মহত্ত্ব বিকশিত। আবার ক্ষিতি বাঙালী নারীদের সম্বন্ধে যা বলেছে, তারও যাথার্থ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি নারী-চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন , নারীর মূঢ়তা ও অন্ধ আবেগ কীভাবে নানা অনর্থ বাধায় এবং সংসারকে ছারখার কবে দেয়, রবীন্দ্রনাথেব অঙ্কিত এইসব নাবী-চবিত্রের মধ্যে তারই দৃষ্টান্ত মেলে।

'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যেব মাত্রা' এই দুটি রচনায় ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যরসিক ও দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখে কৌতুকহাস্যের কারণ নির্ণয়েব প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম রচনাটিতে পঞ্চভূত-সভার সদস্যদের বিতর্কের মধ্য দিয়ে সত্যনির্ণয়েব চেষ্টা করা হয়েছে, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণভাবে ভূতনাথবাবুর লেখনী-নিঃসৃত।)

'কৌতুকহাস্য' নামক রচনাটির সারমর্ম এই। একদিন শীতের সকালে দূর থেকে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীকে পরস্পরের কটি বেষ্টন করে হাসতে দেখে পঞ্চভূত-সভাব পুরুষ সদস্যেরা তাদের হাসির কারণ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। ব্যোম বলল, মেয়েদের হাসির কোন কারণ থাকে না। সমীর বলল, কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই তার কাছে কিছু অসঙ্গত লাগে। মানুষ দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, কিন্তু কৌতুকে হাসে কেন ? কৌতুক তো সুখ নয়! সমীরেব প্রশ্ন নিয়ে ক্ষিতি প্রথমে একটু ব্যঙ্গ করে তারপর বলল, হাসি জিনিসটাই অসঙ্গত ও অসংযত ব্যাপার এবং মানুষের পক্ষে অপমানজনক। তাই প্রাচ্যজাতীয়েবা সভা-সমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাকে অসংযমের নিদর্শন বলে গণ্য করে।

তখন সমীর বলল, কৌতুকে আমোদবোধ নিতান্ত অযৌক্তিক এবং ছেলেমানুষের উপযুক্ত। কৌতুকের সঙ্গে আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি স্বার্থবোধেরও যোগ নেই। ক্ষিতি বলল, আমরা এক হাসির দ্বারাই কৌতুক ও সুখ উভয়কে অভিব্যক্তি দান করি। কিন্তু তা উচিত নয়। এখানে প্রকৃতির ব্যবস্থাতেই ত্রুটি আছে। তখন ব্যোম একথার প্রতিবাদ করে বলল, সুখের হাসি এবং কৌতুকের হাসিতে পার্থক্য আছে। সুখের স্মিতহাস্য, কৌতুকের উচ্চহাস্য। আলো ও বজ্রের মধ্যে যে প্রভেদ, এদের মধ্যেও সেই পার্থক্য। যে কারণভেদে একই ইথরে আলো ও

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তা আবিষ্কৃত হলে বোধহয় সুখের হাসি এবং কৌতুকের হাসির কারণ বার হয়ে পড়বে।

সমীর বলল, আমোদ বা কৌতুক ঠিক সুখ নয়। বরং তা নিম্ন মাত্রার দুঃখ। অল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর আঘাত করলে আমাদের সুখ হতে পারে। চিরাভ্যস্ত ক্লেশহীন জীবনযাত্রার মধ্যে আমরা কোন আমোদ পাই না। কিন্তু মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে অভ্যাসের ব্যতিক্রম করে, ইচ্ছাপূর্বক অল্প মাত্রায় কষ্ট ও অশান্তিকে উদ্রিক্ত করে আমরা আমোদ পাই, কারণ তাতে আমাদের চেতনশক্তি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কৌতুকও এইরকম সুখাবহ দুঃখ। কৌতুকের স্বল্পপরিমিত আঘাত যে দুঃখ দেয়, আমাদের চেতনাকে হঠাৎ চঞ্চল করে তুলে তার চেয়ে বেশী সুখী করে। আঘাতের সীমা অতিক্রম করলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হয়ে ওঠে। তাই প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য, কিন্তু আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য ; কারণ সে হাস্যের সৃষ্টি হয় একটা দ্রুত আঘাতের পীড়ন থেকে।

ক্ষিতি বলল, কৌতুকের হাসি ও সুখের হাসির এইভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা অযৌক্তিক। কৌতুকে আমরা যে শুধু উচ্চহাস্য হাসি তা নয়, মৃদুহাস্যও হাসি, এমন কি অনেক সময় মনে মনেও হাসি। আসলে এ সবই অবান্তর কথা। কৌতুকে আমাদের চিত্তে যে অনতিপ্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তা আমাদের পক্ষে সুখজনক। সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয়, আমাদের চিত্তপ্রবাহ হঠাৎ বাধা পেয়ে দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেই বাধা সুখের, সৌন্দর্যের, সুবিধার নয়, আবার অতি দুঃখেরও নয়। সেইজন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমরা আমোদ অনুভব করি।

তখন ভূতনাথবাবু বললেন যে, যে কোন রকমের অনুভূতিক্রিয়াই আমাদের চিত্তে সুখ উৎপাদন করে, অবশ্য যদি না তার সঙ্গে গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। ভয় পেতেও সুখ আছে, যদি না তার সঙ্গে সত্যকার ভয়ের কোন কারণ থাকে। দুঃখের অনুভূতিও আমাদের এই রকম ক্ষেত্রে ভালো লাগে ; আমরা দুঃখের কাব্যকে সুখের কাব্যের চেয়ে বেশী সমাদর করি। কারণ দুঃখ অনুভবে আমাদের চিত্তে বেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়।

ক্ষিতি ও ব্যোম এর থেকে সিদ্ধান্ত করল যে কমেডির হাসি এবং ট্র্যাজেডির অশ্রু দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল এবং তাদের হাসি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে শুনে তারা আরও জোরে হেসে উঠল। অবশ্য সে হাসির কারণ আগেকার মত এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেল। সে দিনকার মত ভূত-সভার আলোচনার সমাপ্তি হল।

'কৌতুকহাস্য' রচনাটির মধ্যে আলোচনার দিক দিয়ে যেটুকু অপূর্ণতা থেকে গিয়েছে, 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'র মধ্যে তা পূরণ করা হয়েছে। শেষোক্ত রচনাটিতে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তা কথোপকথনের আঙ্গিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না, এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই রচনাটির মধ্যে লিখেছেন, "কথোপকথনসভার একটি প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা। আমাদের যদি পদতল না থাকিত, দুই পা যদি দুটো তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার মতো হইত, তাহা হইলে মাটির ভিতর দিকে সুগভীরভাবে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইত, কিন্তু এক পা অগ্রসর হওয়া সহজ হইত না।...এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতি পদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথনকালে সেই সকল অনিশ্চিত সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভালো।" এই জাতীয় কতকগুলি বিষয় এই রচনায় পৃথকভাবে প্রবন্ধের আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে আলোচিত হয়েছে।

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'-তে ভূতনাথবাবু দীপ্তির একটি পত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। দীপ্তির পত্রের বক্তব্য এই যে, দুই সখীর হাসি থেকে ভূতসভার পুরুষ সভ্যেরা যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করেছেন, তা যুক্তিহীন ও অপ্রামাণ্য। এর উত্তরে ভূতনাথবাবু লিখেছেন, পঞ্চভূত-সভার উদ্দেশ্য কোন বিষয় সম্বন্ধে যুক্তিমূলক আলোচন করে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়া নয়, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনায়াস কথোপ-কথনের মধ্য দিয়ে খানিকটা জ্ঞানসমুদ্রের হাওয়া খেয়ে মনের স্বাস্থ্য বাড়ানো। এর পরে ভূতনাথবাবু কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আগেকার আলোচনার সার সংকলন করেছেন। অতঃপর তিনি দীপ্তির একটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দীপ্তির প্রশ্ন এই, যদি মনের মধ্যে অল্প পীড়ন অনুভব করার জন্যই হাসি পায়, তাহলে চলতে চলতে

হঠাৎ অল্প হোঁচট খেলে বা রাস্তায় যেতে যেতে অকস্মাৎ অল্প মাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে এলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এর উত্তরে ভূতনাথবাবু লিখছেন যে, যে কোন রকম পীড়নই কৌতুকজনক উত্তেজনা সৃষ্টি করে না। সচেতন পদার্থের মধ্যে কোনরকম অসঙ্গতি দেখলেই আমাদের হাসি পায়, জড় পদার্থের অসঙ্গতি হাসির উদ্রেক করে না।

এর কারণ সম্ভবত এই। প্রকৃত অসঙ্গতি ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে জড়িত, তা জড় পদার্থের মধ্যে নেই। জড়জগতে যে সমস্ত ব্যতিক্রম বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায় তা বাহ্য, আসলে সেখানে সব কিছুরই পিছনে উপযুক্ত কারণ আছে। কিন্তু চেতন জগতে যখন কোন অনিয়ম বা অসঙ্গতি দেখা দেয়, তখন তা অনিবার্য নয় এবং অনপেক্ষিতভাবে তা ঘটে, এইজন্য তা আমাদের মনে কৌতুক উৎপাদন করে।

কৌতূহলের সঙ্গে কৌতুকের যোগ আছে। কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নতুনত্বের লালসা, কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নতুনত্ব। কৌতূহল জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুর, কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে।

ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের এবং কথার সঙ্গে কার্যের অসঙ্গতির মধ্যেও নিষ্ঠুরতা রয়েছে। অসঙ্গতি কমেডিরও বিষয়, ট্র্যাজেডিরও বিষয়। যখন অসঙ্গতি অল্প মাত্রায় হয় এবং তার সঙ্গে কোন গুরুতর হানি, অনিষ্ট বা দুঃখ জড়িত থাকে না, তখন তা হয় কমেডির বিষয়, কিন্তু জড়িত থাকলে তা ট্র্যাজেডির বিষয় হয়ে ওঠে। অসঙ্গতি দুই শ্রেণীর—হাস্যজনক ও দুঃখজনক। বিরক্তিজনক ও রোষজনক অসঙ্গতিও শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। আসল কথা, অসঙ্গতি আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করলে কৌতুক বোধ হয়, কিন্তু গভীরতর স্তরে আঘাত করলে দুঃখ বোধ হয়।

মোট কথাটা এই যে, অসঙ্গতির মাত্রা একটু একটু করে বাড়ালে বিস্ময় থেকে হাস্যের এবং হাস্য থেকে অশ্রুর সৃষ্টি হয়।

এই দুটি রচনা মিলিয়ে আমরা হাস্যরসের উপাদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাচ্ছি। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন যে অসঙ্গতিই হাস্যরস সৃষ্টির মূল কারণ। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এই অসঙ্গতির মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হলে হাস্যরস এবং অপেক্ষাকৃত বেশী হলে করুণরস সৃষ্ট হয় এই

সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিযুক্ত, সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথেরই প্রদত্ত একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তিনি সমীরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকা হস্তে রাধিকার কুটিরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন। শুনিয়া শ্রোতা-মাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল।" এখানে যে অসঙ্গতি থেকে শ্রোতাদের হাস্য উদ্রিক্ত হয়েছে, সেই অসঙ্গতির তার যতই চড়ানো হোক্, তার থেকে করুণরস সৃষ্ট হবে না। আসলে যে অসঙ্গতি থেকে হাস্যরস সৃষ্ট হয় আর যে অসঙ্গতি থেকে করুণরস সৃষ্ট হয়, তাদের পার্থক্য পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। যে ধরনের অসঙ্গতি থেকে করুণরস সৃষ্ট হয়, তার মধ্যে একটা গভীরতা থাকে এবং তার পিছনে থাকে একটি সুস্পষ্ট কার্যকারণপরম্পরা ; কিন্তু যে ধরনের অসঙ্গতি থেকে হাস্যরস সৃষ্ট হয়, তা অগভীর এবং তার পিছনে কোন কার্যকারণপরম্পরা থাকার প্রয়োজন নেই, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই অনেক সময় তা দেখা দেয় এবং তাতে হাস্যরস সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

এই দুই রচনায় স্থূল অসঙ্গতি থেকে যে হাসির ব্যাপার ঘটে, তাতেই 'কৌতুক' বলা হয়েছে। কিন্তু 'কৌতুক' শব্দটিকে এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা চলে কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইয়ে যে ধরনের 'কৌতুক'এর নিদর্শন পাই, তা কিন্তু এই জাতীয় নয়, সেই কৌতুক শুভ্র ও অনাবিল এবং লেখকের মার্জিত রসবোধ থেকে তার সৃষ্টি

দুটি রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ট্র্যাজেডি আমাদের মনে গভীর দুঃখ ও বেদনা জাগ্রত করে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে করুণরসের মূল উপাদান দুঃখ হলেও ঐ রসের আস্বাদন আমাদের মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি করে, তা দুঃখ নয়, আনন্দ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উক্তির যাথার্থ্য সন্দেহের অতীত নয়।

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' নামক রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই।......সচেতন পদার্থ-সম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।......জড়ের পক্ষে কিছুই অসংগত কৌতুকাবহ হইতে পারে না।" কিন্তু এই উক্তিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা চলে না। জড়প্রকৃতির মধ্যে কোন সৃষ্টিছাড়া অসঙ্গতি হঠাৎ দেখতে পেলে মানুষ যে হেসে

ওঠে, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে। নীচে দুটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করলাম।

প্রথমটি ঘটেছিল জব্বলপুরে। সেখানে আমরা একদল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একটি পাহাড়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি ঐ পাহাড়ের পাশাপাশি দুটি চূড়ার উপরে দুটি অতিকায় পাথর রয়েছে এবং পাথর দুটি দুই চূড়ার মাঝখানের খাদের দিকে হেলে আছে, কিন্তু দুটি পাথর একটিমাত্র বিন্দুতে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে, সেইজন্য তারা নীচে পড়ে যাচ্ছে না। এই দৃশ্য দেখা মাত্র আমাদের দলের সকলে হেসে উঠেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি শান্তিনিকেতনেই ঘটেছিল। একদিন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বারান্দায় দুটি সাইকেল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড করিয়ে রাখা ছিল। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই কোন লোক ধাক্কা না দেওয়া সত্ত্বেও দুটি সাইকেল একই সঙ্গে পড়ে গেল। মাধ্যাকর্ষণের স্বাভাবিক নিয়মেই সাইকেল দুটি পড়েছিল, তবু এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল।

সুতবাং দেখা যাচ্ছে, জড়পদার্থের মধ্যেও প্রকৃত অসঙ্গতি কিছু ঘটলে তা হাস্যরসের সৃষ্টি কবতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জড়প্রকৃতির যে সমস্ত "অসঙ্গতি"র দৃষ্টান্ত দিয়ে "জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না" বলেছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গতি নয়, তার কারণ তাদের প্রত্যেকের পিছনেই উপযুক্ত কাবণ আছে এবং সে কারণ লোকের কাছে অস্পষ্ট নয়।

যাহোক্, এই দুই রচনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকলেও দুটি রচনারই উৎকর্ষ অসামান্য। এদের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই রচনাভঙ্গী বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। এদের মধ্যে হাস্যরস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর হন নি, তাঁর আলোচনার মধ্যেও শুভ্র হাস্যরসের একটি ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসবোধ যে কত সূক্ষ্ম, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় এর থেকে পাওয়া যায়।

'মন' ও 'অখণ্ডতা' এই দুটি রচনা পরস্পরের পরিপূরক। প্রথম রচনাটি ভূতনাথ

বাবুর একার লেখা। দ্বিতীয়টিতে পঞ্চভূত-সভার আলোচনার অভ্যস্ত আঙ্গিক অনুসরণ করা হয়েছে।

এই দুটি রচনাই অত্যন্ত সুলিখিত, বিশেষভাবে 'মন' প্রবন্ধটি অত্যন্ত মনোরম ও সুখপাঠ্য। এই দুটি প্রবন্ধের সব কথা সম্বন্ধে হয়তো অনেকে একমত হবেন না, কিন্তু প্রবন্ধ দুটির মধ্যে যে মৌলিক চিন্তা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা রবীন্দ্রনাথেরও খুব কম রচনার মধ্যেই মেলে।

'মন' রচনাটির সারমর্ম নীচে দেওয়া হল।

মধ্যাহ্নকালে নদীর তীরে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসে লেখক চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র্য দেখে মনে করলেন যে এইরকম সহজে বাইরের ঘূর্ণা-বাতাসের মতই অবলীলাক্রমে একবার সৃষ্টি করে তার পরক্ষণেই ফু দিয়ে তা ভেঙে ফেলে ক্ষ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে যদি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত তো বেশ হত।

কিন্তু তার বদলে তিনি কাগজকলম নিয়ে লিখতে বসেছেন। নিশ্চল প্রাণহীন প্রীতিহীন কতকগুলো মতামতকে তিনি উঁচু করে তুলে ধরেছেন, কেউ তাদের দেখে, কেউ যোগ্যতা বিচার না করেই অবজ্ঞা করে। ইচ্ছা থাকলেও লেখক এ কাজে বিরত হতে পারেন না। মানুষ সভ্যতার খাতিরে নিজের 'মন নামক এক অংশকে অমিত প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে, এখন তাকে ছাড়তে চাইলেও সে ছাড়ে না।

কিন্তু কবির ভৃত্য হৃষ্টপুষ্ট নিশ্চিন্ত প্রফুল্লচিত্ত নারায়ণসিং বেশ সহজভাবেই আছে। তার মধ্যে কোনই জটিলতা নেই। সে এখানকার বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে।

লেখক কল্পনা করছেন, কোন শিশু দেবতার খেয়ালে তাঁর সামনের আতা গাছটি যদি 'মন' পায়, তাহলে তার সহজ শ্রী একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, নানা অসন্তোষ, সংশয় ও প্রশ্নজাল তাকে বিব্রত করবে। তার ফুল ফোটানো, ফল পাকানো বন্ধ হয়ে যাবে, তার পল্লবমর্মর, ছায়া ও সরস সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা ঘুচে গিয়ে হয়তো তার মধ্য থেকে একদিন শুষ্ক প্রবন্ধ বা সমালোচনা বেরিয়ে আসবে।

প্রকৃতির মধ্যে মন থাকলে পৃথিবীতে জুড়োবার জায়গা পাওয়া যেত না। মনের দাহে জর্জরিত মানুষ এই মনোহীন শান্ত প্রকৃতির মধ্যেই দাহের নিবৃত্তি পায়।

আমাদের মন আমাদের ভিতরকার সব সামঞ্জস্য নষ্ট করে বৃহৎ হয়ে পড়েছে।

প্রয়োজনীয় সব কাজ সেরে ফেলেও অনেকখানি মন বাকী থাকে। সে বসে বসে ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, সহজ জিনিসকে 'কঠিন ক'রে তোলে এবং আরও অনেক অনুচিত কাজ করে।

কিন্তু নারায়ণসিংহের মন তার যতটা প্রয়োজন, ততটুকুই আছে। জীবনের নানা বিপর্যয়ের হাত থেকে তার মন তাকে রক্ষা করে, কিন্তু বিব্রত ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে না ; মাঝে মাঝে হয়তো তার মধ্যে মন একটু চাঞ্চল্য আনে, কিন্তু সেটুকু চাঞ্চল্য তার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

'অখণ্ডতা' নামক রচনাটির সংক্ষিপ্তসার এই।

একদিন পঞ্চভূত-সভায় দীপ্তি বলল, এখন প্রকৃতির স্তব নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এই কথার সূত্র ধরে সমীর বলল, যারা প্রকৃতির স্তব করে, তারা নারীকেও পূজা করে। এ কথা শুনে দীপ্তি বলল, তার মানে জড়ের উপাসকরাই নারীদের ভক্ত! সমীর বলল, তা নয়। সে তার বক্তব্য পরিষ্কার করার জন্য তার একটি রচনা সভায় পাঠ করল। ভূতনাথবাবুর 'মন' প্রবন্ধের পরিপূরক স্বরূপে সমীর এই রচনাটি লিখেছে।

সমীরের রচনার সারমর্ম এই।

মানুষ প্রতি পদে বাধ্য হয়ে মনের সাহায্য নেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাকে সে অপছন্দ করে। মন আমাদের উপকার করে, কিন্তু আমাদেব সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে মিশে থাকতে পারে না। সে সর্বদা খিট্‌খিট্ করে, পরামর্শ ও উপদেশ দেয়, সব কাজে হস্তক্ষেপ করে। বাইরের লোক ঘরের লোক হলে তাকে যেমন ত্যাগ করাও যায় না, ভালোবাসাও যায় না, মনের অবস্থাও তেমনি। বাঙালীর দেশে ইংরেজ সরকারের মত তার ভাব, ধরনধারণ, আইন ভিন্ন ধরনের এবং তার শিক্ষায় আমাদের নিজস্ব সহজ বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট হয়েছে, আমরা তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। ইংরেজের মতই মন আমাদের মধ্যে এতকাল বাস করেও পর থেকে গিয়েছে। ইংরেজদের মত মনের কাছেও নরম হলে তার জুলুম বাড়ে, কিন্তু কঠিন হলে সে জোর খাটাতে পারে না।

মনের উপর গভীর বিদ্বেষ থাকার দরুণ আমরা যে কাজে মনের অভাব দেখা যায়, তারই প্রশংসা করি। যে সব লোক ভেবেচিন্তে কাজ করে, তাদের আমরা ভালোবাসি না। কিন্তু যে না ভেবে না চিন্তে বেপরোয়াভাবে কথা বলে ও কাজ

করে, তাকেই আমরা ভালোবাসি। মনের অস্তিত্ব যা ভোলায়, তাকে বলি মনোহর। মনের বোঝা যে অবস্থায় অনুভব করি না, তাকে বলি আনন্দ।

বুদ্ধি আমাদের সহস্র কাজ করে এবং জীবন রক্ষা করে। কিন্তু প্রতিভা কদাচিৎ আমাদের কাজে আসে, কখনও তা অকাজেও আসে। কিন্তু বুদ্ধি মনের সামগ্রী, হিসাবে বাধা। আর প্রতিভা মনের নিয়ম মানে না। তাই আমরা বুদ্ধির চেয়ে প্রতিভাকে উঁচু আসন দিই।

প্রকৃতির মধ্যে মন নেই, সুতরাং আমাদের মত দ্বৈত অস্তিত্বও তার নেই। প্রকৃতি একাকী অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তার সৌন্দর্যের বিকাশ, তার গড়া ও ভাঙা সবই যেন ইচ্ছায় হচ্ছে, চেষ্টায় হচ্ছে না। চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য অব্যবস্থিত ইচ্ছাশক্তির বড় একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। রাজভক্তি ও প্রভুভক্তি তার নিদর্শন। আগেকার দিনের রাজার মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তির নিদর্শন ছিল বলে মানুষ তার জন্যে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিত। মানুষের নেতাদেরও মন দেখা যায় না অথচ লোকেরা বিনা দ্বিধায় তাদের অনুসরণ করে। নারীও মনের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত নয়। তার মধ্যে আছে কেবল যুক্তিতর্কহীন বিচার-আলোচনাশূন্য ইচ্ছাশক্তি। সে ইচ্ছাশক্তিতে কখনও সে অন্নপূর্ণা, কখনও সংহারিণী।

মানুষের অন্তঃকরণের দুটি অংশ আছে। একটি অংশ মহাদেশের মত বৃহৎ, অচেতন, ও নিশ্চেষ্ট। আর একটি অংশ সমুদ্রের মত সচেতন, সক্রিয়, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল। মহাদেশেরই মত প্রথম অংশটি স্থির ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু প্রাণবন্ত, সৃষ্টিশীল, তার মধ্যে আছে অনায়াসনৈপুণ্য ও গোপন জীবনীশক্তি। দ্বিতীয় অর্থাৎ সচেতন অংশটি সমুদ্রেরই মত মহাশক্তিশালী, অথচ কিছু সৃষ্টি করতে বা পালন করতে অক্ষম। সমুদ্র চঞ্চল ভাবে যা কিছু সঞ্চয় ও ত্যাগ করে, তা তার গোপন তলদেশে দৃঢ় নিশ্চল আকারে রাশীকৃত হয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের চেতনা প্রতিদিন যা কিছু এনে ফেলছে, সে সমস্তই সংস্কার, স্মৃতি ও অভ্যাসের আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতন ভাবে সঞ্চিত হয়ে উঠছে।

মানুষের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী। সমাজের সমস্ত আহরণ, উপার্জন, জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়ে নিশ্চল স্থিতি লাভ করছে। এই জন্য তার এমন সহজ বুদ্ধি, সহজ শোভা, অশিক্ষিতপটুতা।

তার সংস্কারগুলি দৃঢ় ও পুরাতন, তার কর্তব্য চিরাভ্যস্ত সহজসাধ্যের মত। পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে সেই পরিবর্তনের ইতিহাসের স্তরগুলি সঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। স্ত্রীলোক যেন গানের মত, একটি সমে এসে সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হচ্ছে। তার একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দু আছে, তাকে অবলম্বন করে আবর্ত নিজের পরিধি বিস্তার করছে, নতুন নতুন জিনিসকেও তাই সে অনায়াসে টেনে নিয়ে নিজস্ব করে নিচ্ছে। এই কেন্দ্রটি বুদ্ধি নয়, সহজ আকর্ষণশক্তি, একটি ঐক্যবিন্দু। এর মধ্যে মনের প্রভাব পড়লে ঐক্য ভেঙে যায়।

তখন ব্যোম বলল, এই ঐক্যের নামই আত্মা। আত্মা বিভিন্ন বস্তুকে নিজের চার দিকে টেনে এনে একটা গঠন দিয়ে গড়ে তোলে। কিন্তু মন বস্তুসমূহের দিকে আকৃষ্ট হয়ে তাদের এবং নিজেকে ভেঙে ফেলে। তাই আত্মযোগের প্রথম সোপান নিজেকে অবরুদ্ধ করা। ইংরেজরা মনেরই মত জিনিসগুলিকে তাড়ায়, আবার ধরে। আর আমরা আত্মার মত কিছু হরণ না করে চারদিকের জিনিসগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট কবে তাদের গড়ে তুলি, তাই আমাদেব সমাজে, গৃহে, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় একটা রচনার নিবিড়তা দেখা যায়। মন আহরণ করে, আত্মা সৃজন করে।

যোগীরা যেমন যোগবলে সৃষ্টি করেন, তেমনি কবিরা এবং বড় বড় লোকেরা প্রতিভার বলে সৃষ্টি করেন। তাঁদের সৃষ্টিতে সমস্ত উপাদান যেন দৈবশক্তির প্রভাবে পরিপূর্ণভাবে সুষমভাবে সমন্বয় লাভ করে। মনও তার মধ্যে থাকে, কিন্তু সচেতন-ভাবে নয়, সে প্রতিভার মায়ামন্ত্র-বলে মুগ্ধের মত কাজ করে যায়। নারীও নিজের জীবনকে ঠিক তেমনি অচেতনভাবে, তেমনি মায়ামন্ত্রবলে সর্বাঙ্গসুন্দর, স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলে। শুধু গৃহ নয়, সে যেখানে যায়, নিজের চার দিককে একটি সৌন্দর্যসংযমে বন্ধন করে, তার চলাফেরা বেশভূষা কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিতকে এক অনির্বচনীয় গঠন দান করে। এর নাম শ্রী। এ বুদ্ধির কাজ নয়, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ; মনের শক্তি নয়, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি, মহারহস্যময় নিখিলজগৎ-কেন্দ্রভূমি থেকে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার মত উচ্ছ্বসিত উৎস। এই কেন্দ্রভূমি অচেতন নয়, অতিচেতন। একই বস্তু প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকের মধ্যে প্রতিভা এবং নারীর মধ্যে শ্রী ও নারীত্বরূপে বিকশিত হয়।

এই দুটি প্রবন্ধের সাহিত্যিক উৎকর্ষ অসামান্য। বিশেষত 'মন' প্রবন্ধটি একেবারে তুলনারহিত। এই প্রবন্ধটি কতক পরিমাণে লিরিক বা গীতিকবিতার সমগোত্রীয়। কবির একটি ভাব-দৃষ্টি বা অনুভূতি গীতিকবিতার মধ্যে প্রকাশলাভ করে। যে ভাব-দৃষ্টি বা অনুভূতি ছন্দ ও সুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনির্বচনীয় ঝঙ্কার লাভ করে, রসমূর্ছনা লাভ ক'রে গীতিকবিতায় পরিণত হয়, তা যদি সুশৃঙ্খল ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তা গদ্যে অভিব্যক্ত হয়ে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। 'মন' প্রবন্ধও এইরকম একটি ভাব-দৃষ্টি থেকেই জন্মলাভ করেছে। এটি একটি খাঁটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। 'মন' প্রবন্ধ লেখবার সময় কবি কোন তর্কে প্রবৃত্ত হননি বা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চাননি, তিনি একটা অনুভূতির আবেশে বিভোর হয়ে 'মনে'র হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছেন। জীবনে এক সময়ে একটি বিশেষ অনুভূতি আসে, সেই অনুভূতিকে অবলম্বন করে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের আনন্দ আছে। 'মন' প্রবন্ধের মধ্যে কবি সেই দুর্লভ আনন্দকে উপভোগ করেছেন।

বহু শতাব্দীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের মন এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে যে তার মধ্যে একটা জটিলতা এবং নিত্য-অসন্তোষের ভাব এসে গিয়েছে। মনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গতি তাই আর থাকছে না। মন উচিত্য-অনৌচিত্যের চোখ-রাঙানী দিয়ে প্রাণের স্বচ্ছন্দ গতিকে সব সময় বাধা দিচ্ছে। যে কবি জীবনের সহজ মুক্ত ছন্দ ও বাধাবন্ধহীন আনন্দকে সবচেয়ে বড করে দেখেছেন, 'মনে'র উপর তাঁর বিরাগ একান্ত স্বাভাবিক। তাই তিনি 'মন' এবং 'অখণ্ডতা' দুটি রচনাতেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে 'মন' জিনিসটা মানুষের পক্ষে অনেক পরিমাণেই একটা বাহুল্য এবং 'মন' মানুষের যেটুকু উপকার করে, তার চেয়ে অনর্থ সৃষ্টি করে অনেক বেশী। অবশ্য 'মন'-এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মামলায় আসামী 'মন' রবীন্দ্রনাথের এই দুটি রচনাকেই তার স্বপক্ষে দলিল হিসাবে উপস্থাপিত করতে পারে। খুব উন্নত স্তরের 'মন' না থাকলে রবীন্দ্রনাথ এমন সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে 'মনে'র ত্রুটিগুলি আবিষ্কার করতে পারতেন না এবং মন না থাকলে এমন চমৎকার দুটি প্রবন্ধ লিখতেও পারতেন না। মনের উপযোগিতার এমন অব্যর্থ প্রমাণ আর কি হতে পারে?

যুক্তির দিক দিয়ে এই দুটি প্রবন্ধের সব কথাকে অখণ্ডনীয় বলা যায় না। 'মন' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে নারায়ণসিংহের মধ্যে যতটুকু মন আছে, তা'ই আদর্শস্থানীয়, কারণ "এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে তিলমাত্র বিরোধ-বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আস্তা গাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণসিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণসিং।" এবং "আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণসিংহের মনটি উহার আবশ্যকের গায়ে গায়ে ঠিক ফিট করিয়া লাগিয়া আছে।" কিন্তু নারায়ণসিংহের মনে যে জীবনের প্রয়োজন মেটানো ছাড়া আর কোন কথা ধারণা করার শক্তি নেই, তার মূলে রয়েছে তার অশিক্ষা এবং সে যে উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি, তার জন্য দায়ী আমাদের বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা। অশিক্ষার ফলে অনুন্নত একটি মনকে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ বলেছেন, তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে সকলে একমত হবেন বলে মনে হয় না, অবশ্য এটি সত্যই তাঁর মত কিনা তা বলা যায় না; এই জাতীয় সাহিত্যরসপ্রধান ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে যে সমস্ত কথা বলা হয় তার সবটাই লেখকের নিজস্ব মত নাও হতে পারে।

'অখণ্ডতা'র মধ্যেও চিন্তা ও যুক্তির দিক দিয়ে সমালোচ্য বিষয় কিছু কিছু আছে। মানুষের সঙ্গে মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই রচনাতে বলা হয়েছে, "ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে (মনকে) দেখিতে পারি না", "আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে (মন) সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না," "মনের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ এতই সুগভীর" প্রভৃতি। কিন্তু মন আমাদের থেকে ভিন্ন কোন পদার্থ নয়, সে আমাদের সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ আসলে আমাদের সঙ্গে মনের সংঘাত ও বিরোধ বলতে আমাদের সহজ প্রবৃত্তির (instinct) সঙ্গে মনের সংঘাত ও বিরোধের কথা বোঝাতে চেয়েছেন; কিন্তু 'সহজ প্রবৃত্তি' কথাটা কোথাও উল্লিখিত হয়নি বলে আলোচনাটি সামান্য পরিমাণে অস্পষ্ট হয়েছে। এই রচনায় দেখি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাকে মন থেকে স্বতন্ত্র ও মনের চেয়ে শক্তিশালী একটি পদার্থ বলেছেন। কিন্তু প্রতিভা আসলে মনেরই উন্নত পর্যায়। মন বিকল হয়ে গেলে প্রতিভাও স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়; এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে, কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে।

'অখণ্ডতা'য় সমীর মানুষের অন্তঃকরণের সচেতন ও অচেতন অংশকে যেভাবে সমুদ্র ও মহাদেশের সঙ্গে তুলনা করেছে, তার মধ্যে খানিকটা কষ্টকল্পনা লক্ষ্য করা যায়, এই তুলনার মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য আছে বলা যায় না। মহাদেশ ও সমুদ্র—উভয়ের উল্লেখ করার সময় সমীর মহাদেশকে "বৃহৎ" বলেছে, কিন্তু সমুদ্র তো আরও বৃহৎ!

'অখণ্ডতা' রচনায় রবীন্দ্রনাথ ব্যোমের জবানীতে লিখেছেন যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা যেন দৈবশক্তির সাহায্য পেয়ে প্রায় অনায়াসভাবে নিজের কাজ করে যান এবং পরিণামে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেন। তাঁর ভাষায় "বড়ো বড়ো লোকেরা যে বড়ো বড়ো কাজ করেন,...যেখানকার যেটি সে যেন একটি দৈবশক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়, একটি সুসম্পন্ন সুসম্পূর্ণ কার্যরূপে দাঁড়াইয়া যায়।... মনে হয়, সমস্তই যেন জাদুতে হইতেছে; যেন সমস্ত ঘটনা, যেন বাহ্য অবস্থাগুলিও, যোগবলে যথেচ্ছামতো যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া যাইতেছে...।" কিন্তু ইতিহাসে এর বিপরীত দৃষ্টান্তই বেশী দেখতে পাওয়া যায়; বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সাধারণত প্রতিপদে বৃহৎ বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হন, নিজের শক্তিতে তাঁরা অনেক কষ্টে এইসব বাধা অতিক্রম করে জয়যুক্ত হন, অনেকে শেষ পর্যন্ত পরাজয়ও বরণ করেন। তাই দেখি রাণা প্রতাপ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে কী রকম অসীম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, অনেক বাধাকে তিনি নিজের শক্তিতে অতিক্রম করলেও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে তিনি পারেন নি। নেপোলিয়নের জীবনকাহিনীও বারবার বাধার সম্মুখীন হওয়া ও বাধা অতিক্রম করার ইতিহাস, শেষ অবধি তাঁকে পরাজয় বরণই করতে হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টও তাঁর মহান ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কত বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, শেষ অবধি তো তাঁকে প্রাণই বিসর্জন দিতে হল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও কত বার যে কী বিরাট বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা তাঁর জীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন; তাঁর বিশাল প্রতিভা এবং অদম্য শক্তি সত্ত্বেও অনেক ব্যাপারে তাঁকে নৈরাশ্য বরণ করতে হয়েছিল। অতএব প্রতিভাশালী লোকদের কাজ যেন দৈবশক্তির আনুকূল্য লাভ করে অনায়াসভাবে নিষ্পন্ন হয়ে যায়, একথা মনে করা যায় না।

'নরনারী' নামক রচনাটির সঙ্গে 'অখণ্ডতা'র সামান্য যোগ আছে। 'নরনারী'তে ভূতনাথবাবু যে সব যুক্তি দেখিয়ে বাংলাদেশের পুরুষদের তুলনায় নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন, এই রচনায় সমীর ও ব্যোম তারই অনুরূপ যুক্তি দেখিয়ে পুরুষজাতির তুলনায় নারীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছে। 'পল্লিগ্রামে' রচনার মধ্যে এক জায়গাতে ভূতনাথবাবু আর একবার পুরুষের তুলনায় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করেছেন, এবং সেখানে তিনি যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি 'নরনারী' এবং 'অখণ্ডতা'র মধ্যে প্রদর্শিত যুক্তিগুলির সমজাতীয়।

'গদ্য ও পদ্য', 'কাব্যের তাৎপর্য', 'প্রাঞ্জলতা' এই তিনটি রচনায় সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 'গদ্য ও পদ্য' নামক রচনাটিতে পঞ্চভূত-সভার বাদ-প্রতিবাদের আঙ্গিক খুব সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছে, প্রত্যেকটি সভ্যই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কথা বলেছে। অন্য দুটি রচনায় এই আঙ্গিক এতখানি সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়নি।

'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার এই।

একদিন ভূতনাথবাবু অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বললেন, বাঁশীর শব্দে বা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় হৃদয়ে স্মৃতি জেগে ওঠে না, বিস্মৃতির মহাসমুদ্র তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। ভূতনাথবাবুর ভাবোচ্ছ্বাস দেখে ক্ষিতি উপহাস করে বলল, কবিতা ছন্দে শুনতে ভালো লাগে, গদ্যের সঙ্গে কবিত্ব মেশালে তা দৈনন্দিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

ভাবোচ্ছ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভূতনাথবাবু চুপ করে গেলেন। তখন স্রোতস্বিনী তাঁর প্রতি সহানুভূতিপরবশ হয়ে বলল, গদ্যে পদ্যে কি এতই বিচ্ছেদ? ভূতনাথবাবু বললেন, পদ্য অন্তঃপুর এবং গদ্য বহির্ভবন। পদ্য সকলের এবং প্রত্যেকের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র করে নিজের জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করে রেখেছে, ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে তার বাস। হৃদয়ের ভাবকে সেই সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলে তাকে আক্রমণ করার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু সেই সীমার বাইরে গেলে তার পক্ষে বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার কোন উপায় নেই।

তখন ব্যোম বলল, সে ঐক্যবাদী। একা গদ্যেই মানুষের সব প্রয়োজন মিটত, মাঝখান থেকে পদ্য একটা অনাবশ্যক বিচ্ছেদ এনেছে, কবি নামে একটা স্বতন্ত্র জাতকে সৃষ্টি করেছে এবং তারা কবিত্ব নামে একটা কৃত্রিম পদার্থ গড়ে তুলেছে। পদ্য পেখম তুলে নেচে নেচে বেড়ায় বলে ব্যোম তাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।

দীপ্তি একথার প্রতিবাদ করে বলল, ময়ূরের পেখমের মত কবিতার পেখমও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, কবিদের ষড়যন্ত্র নয়।

সমীর তখন বলল, কৃত্রিমতাই মনুষ্যত্বের গৌরব। মানুষ ছাড়া আর কেউ কৃত্রিম হতে পারে না। কারণ : বিধাতার পবে একমাত্র মানুষই কিছু কিছু সৃষ্টি করতে পাবে। গদ্যের চেয়ে পদ্য বেশী কৃত্রিম, কারণ তাতে মানুষের সৃষ্টি বেশী আছে।

স্রোতস্বিনী সমীরকে সমর্থন করে বলল, সৃষ্টির যে অংশ আমাদের হৃদয়ে ভাব সঞ্চাব করে, সেই অংশকে এমন পরিপূর্ণভাবে সুন্দর করে তোলবাব জন্য বিধাতাকে কত যত্ন নিতে, নৈপুণ্য খেলাতে হয়েছে। তেমনি ভাব প্রকাশ করতেও মানুষকে নানা নৈপুণ্য অবলম্বন কবতে হয়, শব্দের মধ্যে সঙ্গীত, ছন্দ ও সৌন্দর্য আনতে হয়। এ যদি কৃত্রিম হয়, তবে সমস্ত বিশ্বরচনা কৃত্রিম।

ব্যোম তখন বলল, সমস্ত বিশ্বরচনা যে কৃত্রিম অর্থাৎ সমস্তই যে মায়া, এমন মতও আছে।

ক্ষিতি বলল, এই সব অবান্তর কথার আড়ালে আসল কথাটা অর্থাৎ ভাব-প্রকাশের জন্য পদ্যের আবশ্যক আছে কিনা, সেই কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। তার মতে ভাবপ্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নি। ছোট ছেলেরা যেমন ছড়াকে ভাব-মাধুর্যের জন্য নয়, ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য ভালবাসে, তেমনি অসভ্য অবস্থায় মানুষও অর্থহীন কথার ঝঙ্কারকে ভালোবাসত। তাই মানুষের প্রথম কবিত্ব অর্থহীন ছড়া। পরে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে ছন্দের সঙ্গে অর্থও যুক্ত হয়েছে। এখন পরিণত মানুষ অর্থ ও ভাব চায়, কিন্তু মানুষেরই দু'একটি গোপন স্থানে অপরিণত বালক অংশ থেকে গেছে, সে চায় ধ্বনি ও ছন্দ।

দীপ্তি বলল, সেই অপরিণত অংশ আছে বলেই জগতে যা কিছু মিষ্টত্ব আছে।

সমীর বলল, পুরোপুরি পেকে যাওয়া মানে জ্যাঠামি। আধুনিক হিন্দু জাত পৃথিবীর সবচেয়ে জ্যাঠা জাত।

তখন ভূতনাথবাবু তাঁর ভাষণ সুরু করলেন। প্রথমে তিনি বললেন. গতির মধ্যে একটা পরিমাণ-করা নিয়ম আছে। এ কথার পিঠে ব্যোম বলে উঠল স্থিতিই যথার্থ স্বাধীন, কারণ সে নিজের অটল গাম্ভীর্যে বিরাজ করে; কিন্তু গতিকে প্রতি পদে নিজেকে নিয়মে বেঁধে চলতে হয়।

অতঃপর ভূতনাথবাবু বললেন যে গতির সঙ্গে গতির, এক কম্পনের সঙ্গে অন্য কম্পনের একটা যোগ আছে, একথা বিজ্ঞানই বলে। আমাদের চেতনা একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। তার সঙ্গে বিশ্বসংসারের ধ্বনি, আলোকরশ্মি প্রভৃতি বিচিত্র কম্পনের যোগ আছে। হৃদয়বৃত্তি বা emotion আমাদের হৃদয়ের আবেগ বা গতি, তারও সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ব-কম্পনের ঐক্য আছে। সঙ্গীত অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে তক্ষনি তার সঙ্গে মিলে যায়। তখন গানে ও প্রাণে একটি নিবিড় সংঘর্ষ হতে থাকে, কারণ সঙ্গীত তার কম্পন সঞ্চার ক'রে আমাদেব সমস্ত অন্তবকে চঞ্চল ক'বে তুলতে পারে। যাহোক্, এই যে প্রবল স্পন্দন আমাদের অন্তরকে চঞ্চল ক'রে তোলে, তা আমাদের বিশ্বস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, আমরা তখন সমস্ত জগতের সঙ্গে এক তালে পা ফেলতে থাকি। এই ভাবকে কবিরা ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অনেকে তা বুঝতে পারে না, কারণ ভাষার সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, তাকে মস্তিষ্ক ভেদ কবে অন্তরে প্রবেশ করতে হয়। তাই কবিরা ভাষাব সঙ্গে সঙ্গীত যোগ ক'রে দেন, তাতে ভাষার কাজ সুগম হয়, সঙ্গীতের মায়াস্পর্শে, ছন্দে ও ধ্বনিতে অত্যন্ত সহজে হৃদয়ের সঙ্গে ভাবের পরিচয় সাধিত হয়। সুর ও তাল, ছন্দ ও ধ্বনি, সঙ্গীতের দুই অংশ। কবিতায় ছন্দ ও ধ্বনি দুয়ে মিলে ভাবকে কম্পিত ও জীবন্ত করে তোলে, বাইরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করে দেয়। মনুষ্যসৃষ্ট ভাষা কৃত্রিম হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য অকৃত্রিম।

স্রোতস্বিনী তখন বলল, নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা ও নাট্যকলা একত্র সম্মিলিত হয়ে নানা দিক থেকে আমাদের চিত্তকে আঘাত করে চঞ্চল করে। এতগুলি বিভিন্ন কলার সম্মিলন বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না।

'কাব্যের তাৎপর্য' রচনার সংক্ষিপ্তসার এই।

ভূতনাথবাবু কচ-দেবযানী-সংবাদ সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন। একদিন স্রোতস্বিনী কবিতাটি তাঁরই মুখ থেকে শুনতে চাইল। কিন্তু ভূতনাথবাবু কবিতা পড়তে সুরু করার আগেই দীপ্তি বলে উঠল যে কবিতাটা ভালো হয় নি, কারণ তার তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

আহত হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের অসন্দিগ্ধ মত ভ্রান্ত হতে পারে, আবার সমালোচকের মতও অভ্রান্ত না হতে পারে। অতএব এইটুকু মাত্র

নিঃসংশয় সত্য যে তাঁর কবিতা দীপ্তির মনের মত হয় নি। এটা তাঁর দুর্ভাগ্য, হয়তো দীপ্তিরও দুর্ভাগ্য হতে পারে।

তখন ব্যোম নানা বাধা ও বিদ্রূপের মধ্যে ঐ কবিতার একটা ব্যাখ্যা দিল। তার ব্যাখ্যা সংক্ষেপে এই। কচ আত্মার প্রতীক, দেবযানী দেহের প্রতীক। স্বর্গ থেকে সংসারাশ্রমে এসে আত্মা এখানকার সুখদুঃখ বিপদসম্পদ থেকে শিক্ষা লাভ করে। এই সময় সে আশ্রমকন্যা দেহের মন ভোলায় ইন্দ্রিয়বীণায় স্বর্গীয় সঙ্গীত বাজিয়ে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় চলছে। অবশেষে আত্মার বিদায় নেবার ক্ষণে দেহ কাতরভাবে অনুনয় করে। তার উত্তর না দিয়ে আত্মা অজানা রাজ্যে চলে যায়।

ব্যোম বলল, এইটিই জগতের সবপ্রথম প্রেম এবং এ প্রেম জীবনের প্রথম প্রেমের মতই সরলতম ও প্রবলতম। যখন পৃথিবীও অপরিণত অবস্থায় ছিল, তখনই এই প্রেমের জন্ম হয়েছিল।

এই নিয়ে ব্যোম, ক্ষিতি ও সমীরের মধ্যে খানিকক্ষণ বাদপ্রতিবাদ হবার পর ক্ষিতি এই কবিতার আর একটা ব্যাখ্যা দিল। সে বলল, এর মধ্যে Evolution theory অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটা রয়ে গেছে। সঞ্জীবনী বিদ্যা অর্থ বেঁচে থাকার বিদ্যা। একটা জগৎ যাকে অবলম্বন করে এই বিদ্যা অভ্যাস করছে, সেই প্রাণীবংশের প্রতি তার প্রেম ক্ষণিকের। যেই একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়, অমনি সে ঐ যুগের প্রাণীবংশকে ধ্বংসের মুখে ফেলে এগিয়ে চলে যায়।

দীপ্তি বিরক্ত হয়ে বলল, এমন ব্যাখ্যা আরও রাশি রাশি দেওয়া যায়। ব্যোম তাকে সমর্থন করে বলল, এগুলো তাৎপর্য নয়, দৃষ্টান্ত মাত্র। আসলে এর মূল কথা এই যে আমরা একবার করে আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি ; যেমন চলার সময় পা ফেলে পরক্ষণেই পা তুলে নিতে হয়, তেমনি অগ্রসর হবার সময় আমাদের পদে পদে বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করতে হয়।

সমীর বলল, গল্পের শেষে আছে দেবযানী কচকে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, কচ যে বিদ্যা শিখেছেন, তা অন্যকে শেখাতে পারবেন, কিন্তু নিজে ব্যবহার করতে পারবেন না। সেই অভিশাপ সমেত গল্পের তাৎপর্য এই দাঁড়ায়। সঞ্জীবনী বিদ্যা অর্থ ভালো করে জীবন ধারণ করার বিদ্যা। ধরা যাক্ কোন কবি জগতে এসে সংসারকে

তার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় মুগ্ধ করে সেই বিদ্যা শিখে নিল। সে সংসারকে ভালোবাসল, কিন্তু সংসার যখন তাকে তার বন্ধনে ধরা দিতে বলল, তখন সে ধরা দিল না, কারণ ধরা দিলে সে এ বিদ্যা শেখাতে পারবে না। সংসার তখন তাকে অভিশাপ দিল যে এই বিদ্যা সে অন্যকে দান করতে পারবে, কিন্তু নিজে ব্যবহার করতে পারবে না। এই অভিশাপের দরুণই গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগলেও গুরু নিজের জীবনে সংসার-জ্ঞান ব্যবহার করতে অক্ষম। প্রাচীন যুগেও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের মন্ত্রণা অনুসারে রাজারা রাজ্য শাসন করতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণরা নিজে রাজ্য শাসন করতে পারতেন না। পূর্ববর্তী বক্তারা এই কবিতার যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেগুলো সাধারণ কথা। কাব্যের এই রকম সাধারণ অর্থ করলে তাকে নতুন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা বলা যায় না।

তখন স্রোতস্বিনী বলল, সেই সব সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাম-সীতার করুণ কাহিনী অথবা শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের মধ্যে কোন নতুন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা নেই, সাধারণ কথাই আছে এবং তা আছে বলেই সর্বসাধারণে তার রসভোগ করে আসছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের হয়তো রূপক অর্থ করা যায়। কিন্তু সেই অর্থের চেয়ে তার মধ্যে যে সাধারণ, স্বাভাবিক ও পুরোনো কথা আছে, তা'ই আমাদের অভিভূত করে। সে কথাটি অত্যাচারপীড়িত নারীর লজ্জা এবং সেই লজ্জা নিবারণ। তেমনি কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানব-হৃদয়ের এক অত্যন্ত চিরন্তন ও সাধারণ বিষাদকাহিনী বর্ণিত আছে; তাকে যাঁরা অকিঞ্চিৎকর মনে করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকে প্রাধান্য দেন, তাঁরা কাব্যরসের অধিকারী নন।

তখন সমীর এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভূতনাথবাবুর বক্তব্য শুনতে চাইলে তিনি বললেন যে কবিতাটা লেখবার সময় তাঁর মাথায় কোন অর্থই ছিল না। কাব্যে কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করে দেয়; তখন তাঁরা নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে কবিতার ব্যাখ্যা করেন, কেউ সৌন্দর্য, কেউ নীতি, কেউ তত্ত্ব সৃজন করতে থাকেন। কেউ কাব্যের শিক্ষাংশ বাদ দিয়ে কাব্যাংশটুকু নিলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না; আবার কেউ মাত্র শিক্ষাংশটুকু নিলেও ক্ষতি নেই, আনন্দ কাউকে জোর করে দেওয়া যায় না। কাব্য থেকে কেউ পান ইতিহাস, কেউ নীতি, কেউ বিষয়জ্ঞান, আবার কেউ তার থেকে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বার করতে পারেন না। যিনি যা পেলেন, তাতেই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত; তাঁর সঙ্গে অন্যদের বিরোধের কোন প্রয়োজন নেই, বিরোধে কোন ফলও নেই।[১৮]

'প্রাঞ্জলতা' নামক রচনাটির সারমর্ম এই।

একদিন স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি কোন একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবির উল্লেখ করে বলল যে তাঁর কবিতা তাদের ভালো লাগে না। সমীর যখন বলল যে ঐ কবিকে বড় বড় সমালোচকেরা উচ্চ আসন দিয়েছেন, তখনও তাদের মত পরিবর্তিত হল না। দীপ্তি বলল, কবিতার ভালোমন্দ নিজে থেকেই বোঝা যায়, এজন্যে সমালোচনার দরকার নেই। তখন ক্ষিতি ও ব্যোম বলল যে মানুষের মন অনেক সময় মানুষকে ছাড়িয়ে চলে। সমালোচকের সাহায্য ভিন্ন অনেক সময় তার নাগাল পাওয়া যায় না। জানা ও বোঝাও এখন নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়, তার জন্য নানারকম শিক্ষা ও সাহায্যের প্রয়োজন। সমীর বলল যে মানুষের হাতে সবই কঠিন হয়ে পড়েছে। অসভ্যেরা যেমন তেমন ভাবে চীৎকার ক'রে উত্তেজনা বোধ করে, কিন্তু সুশিক্ষিত মানুষ অভ্যাসসাধ্য শিক্ষাসাধ্য গান গেয়ে ও শুনে সুখ পায়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকারী ও অনধিকারী, রসিক ও অরসিক এই দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষিতি কল, বিজ্ঞান, আইন ও টাকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলল, মানুষ কোন কাজ সহজে করবার জন্য যে সব উপায় আবিষ্কার করে, ক্রমে সেই উপায়টাই অত্যন্ত কঠিন জিনিস হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষের সব কিছুই অসম্ভব কঠিন হয়ে পড়েছে।

স্রোতস্বিনী স্বীকার করল যে এই কারণে এখন কবিতাও কঠিন হয়েছে এবং তা সকলের বোধ্য নয়, বিশেষ লোকের বোধ্য। কিন্তু যে কবিতা তার ভালো লাগে নি, তার মধ্যে কোন কাঠিন্য নেই, তা নিতান্তই সরল কবিতা। অতএব তা ভালো না লাগার কারণ তার বোঝবার দোষ নয়।

তখন ব্যোম বলল, যা সরল তাই সহজ নয়। অনেক সময় তা'ই অত্যন্ত কঠিন। গ্রীক প্রস্তরমূর্তি কৃষ্ণনগরের কারিগরের পুতুলের তুলনায় অনেক সরল, প্রাঞ্জল এবং প্রয়াস-বিহীন, কিন্তু তাই বলে সহজ নয়।

দীপ্তি বলল, অনেক সময় ভাবের দারিদ্র্য ও আচারের বর্বরতাকে সরলতা বলে ভ্রম হয়, প্রকাশক্ষমতার পরিচয়কে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলে মনে করা হয়।

ভূতনাথবাবু বললেন, বর্বরতা ও সরলতা এক জিনিস নয়। বর্বরতার আড়ম্বর-আয়োজন অত্যন্ত বেশী। সরলতা অনাড়ম্বর। আমাদের মধ্যে এখনো একটা

আদিম বর্বরতা আছে বলে সত্যের প্রাঞ্জল মূর্তির মধ্যে আমরা গভীরতা ও অসামান্যতা দেখতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্য কৃত্রিম ভূষণে এবং সমস্ত রকম অতিশয্যে ভারাক্রান্ত হয়ে না এলে আমাদের কাছে তার মর্যাদা নষ্ট হয়।

সমীর বলল, সংযম ভদ্রতা ও উন্নতির লক্ষণ, অতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্বরতা।

ভূতনাথবাবু বললেন, ভদ্র লোকের মত ভদ্র সাহিত্যেরও ম্যানার আছে, কিন্তু ম্যানারিজ্‌ম্‌ নেই। ভালো সাহিত্যের পরিমিত সুষমা এবং ভঙ্গিমার অভাবের জন্য তার আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, তার পরিপূর্ণতা অনেক সময় নজরে পড়ে না। পরিপূর্ণতার প্রাঞ্জলতাকে সহজ বলে এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাকে দুরূহ বলে কেউ যেন ভুল না করে। উচ্চ শ্রেণীর সরল সাহিত্যকে বোঝা অনেক সময় কঠিন, কারণ মন তাকে বুঝে নেয়, কিন্তু সে নিজেকে বোঝাতে থাকে না।

এই তিনটি রচনাতেই যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম এবং মৌলিক চিন্তার বিস্ময়কর নিদর্শন অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। যেমন 'গদ্য ও পদ্য' রচনায় পদ্যের ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূতনাথবাবুর উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি প্রায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর্যায়ে পৌঁছেছে। জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ লিখেছেন, "এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পদ্যচ্ছন্দের উৎপত্তি বিষয়ে যে অনুমান করিয়াছিলেন ভাষাবিজ্ঞানে এখন সেই কথাই বলে।"

'গদ্য ও পদ্য' রচনার নাম সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলবার আছে। সেই নাম থেকে মনে হতে পারে যে রচনাটির মধ্যে গদ্য ও পদ্যের সাদৃশ্য ও পার্থক্য, উভয়ের সম্বন্ধ এবং তাদের বিরোধিতা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কার্যত কোন আলোচনাই রচনাটিতে করা হয় নি। রচনাটির সূচনায় গদ্য ও পদ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য দু' একটি কথা বলা হয়েছে, তারপর রচনাটির বাকী অংশে পঞ্চভূত-সভার সদস্যেরা কবিতা কৃত্রিম জিনিস কিনা এই একটি মাত্র বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন এবং সভাপতি এই বিষয়টির উপরেই সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন, অথচ বিষয়টি আলোচ্য রচনার মূল বিষয় নয়, প্রসঙ্গক্রমে অবতারিত হয়েছে মাত্র। সুতরাং রচনাটির কেন্দ্রীয় ঐক্য যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে নি, তেমনি এর নামকরণও সার্থক হয়েছে বলা যায় না।

এই রচনাটির আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে বিরোধিতা আছে—ক্ষিতির এই অভিমতের কোন প্রতিবাদ কেউ করে নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভূতনাথবাবু "পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে।" —এই কথা বলে ক্ষিতির অভিমত স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গদ্য ও পদ্যের এই মূলগত বৈষম্য তিনি স্বীকার করেন নি, উভয়ের সমন্বয়ের আদর্শেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর গদ্য আগাগোড়াই কবিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের গদ্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অপরদিকে কবিতার মধ্যেও তিনি অনেক জায়গায় গদ্যের বাগ্‌ভঙ্গী সন্নিবেশ করেছেন এবং শেষ জীবনে গদ্য ও পদ্যের রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে গদ্য কবিতা সৃষ্টি করেছেন।

('কাব্যের তাৎপর্য' এবং 'প্রাঞ্জলতা'—এই দুটি রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কাব্যের আস্বাদনের মূলনীতি সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধে দুই দিক দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই দুটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে ও খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।) 'প্রাঞ্জলতা' রচনাটিতে সত্যিই প্রাঞ্জলতা আছে এবং 'কাব্যের তাৎপর্য' (রচনাটির তাৎপর্য অনায়াসেই বোঝা যায়।) কিন্তু এই দুটি রচনায় যে সমস্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে, তাদের সবগুলি সম্বন্ধে যে উপযুক্ত বিচার করা হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। যেমন 'প্রাঞ্জলতা'র মধ্যে বিভিন্ন বক্তা নানারকম যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে কোন রচনা সরল হলেই নিকৃষ্ট হয় না। কিন্তু "অনেক সময়ে ভাবের দারিদ্র্যকে, আচারের বর্বরতাকে সরলতা বলিয়া ভ্রম হয়—অনেক সময় প্রকাশক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়"—দীপ্তির এই মন্তব্য সম্বন্ধে কেউ কোন কথা বলেন নি, ভূতনাথবাবু দীপ্তির উক্তির "বর্বরতা" শব্দটি নিয়ে অনেক কথা বলে মূল বিষয়টির পাশ কাটিয়ে গেছেন, ভাবের দারিদ্র্য ও প্রকাশক্ষমতার অভাবের সঙ্গে সরলতা ও ভাবাধিক্যের পার্থক্য কী, সে সম্বন্ধে তিনি কোন আলোকপাতই করে নি।)

'প্রাঞ্জলতা' রচনার উপসংহারটি অত্যন্ত উপভোগ্য। কোন বিশিষ্ট ইংরেজ কবির কবিতা তাদের ভালো না লাগার স্বপক্ষে দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী যে সব যুক্তি দেখিয়েছে, সেগুলি ভূতসভার পুরুষ সদস্যেরা বিশদভাবে আলোচনা করে খণ্ডন করলেন। খণ্ডন করার পরে,

"দীপ্তি কহিল, 'নমস্কার করি! আজ আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর কখনো উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতদিগের নিকট উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া বর্বরতা প্রকাশ করিব না।'

স্রোতস্বিনী সেই ইংরাজ কবির নাম করিয়া কহিল, 'তোমরা যতই তর্ক কর এবং যতই গালি দাও, সে কবির কবিতা আমার কিছুতেই ভালো লাগে না।' "

এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং সমস্ত তর্কবিতর্কের পরিণাম খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সাধারণত কোন মানুষের কোন উক্তি বা মতের কেউ প্রতিবাদ করলে সে তা নিয়ে তর্ক করে এবং বিস্তর তর্কের পরে যখন প্রতিবাদীর যুক্তির বিরুদ্ধে তার আর কিছু বলবার থাকে না, তখনও সে তার ভুল স্বীকার করে না বা পূর্ব-মত ত্যাগ করে না। এখানে দীপ্তি আর স্রোতস্বিনীও তার অন্যথা করে নি।

('কাব্যের তাৎপর্য' রচনায় দেখি, ভূতসভার সদস্যেরা ভূতনাথবাবুর কচ-দেবযানী-সংবাদ সম্বন্ধে লেখা কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতার কথা স্বতই মনে পড়ে। কিন্তু 'কাব্যের তাৎপর্য'র মধ্যে আলোচিত কবিতা থেকে কোন অংশ উদ্ধৃত করা হয় নি বা কবিতাটির বিস্তৃত পরিচয়ও দেওয়া হয় নি। সুতরাং ভূতসভার সদস্যেরা কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে বললেও তারা আসলে কচ-দেবযানী প্রসঙ্গেরই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে। 'কাব্যের তাৎপর্য' রচনাটিকে হাস্যরসাত্মক বললে বোধহয় খুব অত্যুক্তি করা হয় না। কারণ বিভিন্ন সদস্য কচ দেবযানী প্রসঙ্গের যে সমস্ত অমূল কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা আমাদের হাসিরই খোরাক জোগায়। এই সমস্ত ব্যাখ্যা দ্বিজেন্দ্রলালের "এ ঘাটে লাগায়ে ডিঙা পান খাইয়া যাওরে বন্ধু" গানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এক শ্রেণীর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতাকে যেভাবে তাঁদের খেয়াল-খুশী-মত ব্যাখ্যা করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এই রচনার মধ্য দিয়ে তার উপর কটাক্ষপাত করেছেন বলে মনে হয়। তবে তিনি নিজেও অনেক সময় নিজের কবিতার কল্পনা-নির্ভর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'সোনার তরী' কবিতার অন্তত তিনটি এইজাতীয় ব্যাখ্যা তিনি বিভিন্ন সময়ে দিয়েছেন। 'কাব্যের তাৎপর্য' রচনার শেষ দিকে ভূতনাথবাবুর জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে কোন কাব্যকে লোকে যে কোন ভাবে আস্বাদন

করতে পারে এবং নিজের ইচ্ছা ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার মধ্য থেকে যে কোন তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারে, তার সঙ্গে কারও কোন বিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে সর্তাধীনে গ্রহণ করা উচিত। কাব্যের তাৎপর্য গ্রহণের অধিকারী-অনধিকারী ভেদ আছে। কোন কাব্যকে অনেকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন, যার মধ্যে মূলানুগতা, যুক্তি ও সঙ্গতির কোন বালাই থাকে না। কাব্য পড়লে যে ব্যাখ্যা স্বাভাবিকভাবে মনে জাগে না, কল্পনার সাহায্যে যে ব্যাখ্যা গড়ে তোলা হয়, তা কখনোই প্রকৃত সাহিত্যরসিকের সহানুভূতি বা সমর্থন লাভ করতে পারে না। সাহিত্যকে যাঁরা সৎ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আস্বাদন ও বিচার করেন, তাঁদের সঙ্গে এই জাতীয় ব্যাখ্যাকারদের বিরোধ তাই কখনও শেষ হবে না।।

'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' এবং 'ভদ্রতার আদর্শ' এই দুটি রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ভারতবাসীর মনে সৌন্দর্য ও শ্রী সম্বন্ধে যে একটি ঔদাসীন্য আছে, তারই সম্বন্ধে দুটি রচনায় দুই দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' রচনার বিষয়-সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায়।

একদিন সমীর আগেকার 'কৌতুকহাস্যে'র প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, যারা বস্তুকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তার গুণকে অনায়াসে নিতে পারে, তারা হাস্যরসিক হয় না। যেমন আমরা গজেন্দ্রগমনের সঙ্গে সুন্দরীর মন্দ গতির, হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে স্ত্রীলোকের হাত-পায়ের তুলনা দিই, কিন্তু তাতে আমাদের হাসি পায় না, কারণ এক্ষেত্রে আমরা বস্তু থেকে গুণকে বাদ দিয়ে নিয়েছি। কোন কোন উপমাতে আমাদের হাসি পায়, তার কারণ বোধহয় ইংরেজী শিক্ষা।

ক্ষিতি সমীরের মত সমর্থন করল। কিন্তু ব্যোম বলল, এর কারণ এই যে আমরা অন্তর্জগৎবিহারী। বাইরের জগৎ আমাদের কাছে কিছু নয়। আমরা মনের মধ্যে একটা জিনিস গড়ে তুলি, সেইটাই আমাদের কাছে সত্য, বাইরের জগৎ তার প্রতিবাদ করলে আমরা তা গ্রাহ্য করি না।

ক্ষিতি এই মত সমর্থন করে বলল যে এর একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত এই যে আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা মনে করেন স্বরলিপির সাতটি সুর বিভিন্ন পশুপাখীর কণ্ঠস্বর থেকে পাওয়া এবং প্রথম সুরটা গাধার সুর থেকে চুরি।

ব্যোম বলল, আমরা গ্রীকদের মত মনের সৃষ্টির সঙ্গে বাইরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চাই না ; আমাদের দেবদেবীর মূর্তিকে আমরা গ্রীকদের মত সুন্দর ও স্বাভাবিক করে গড়তে চেষ্টা করি না। গণেশ প্রভৃতি দেবতার বিসদৃশ মূর্তি আমাদের কাছে হাস্যকর নয়, কারণ আমরা সেই মূর্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি, বাইরের জগৎ বা চার দিকের সত্যের সঙ্গে তার তুলনা করি না।

সমীর বলল, যাকে উপলক্ষ করে আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ বা সাধনা করি, তাকে সম্পূর্ণ সুন্দর স্বাভাবিক করে তোলা আমরা অনাবশ্যক বলে মনে করি।

ব্যোম বলল, এতে কলার দিক দিয়ে ক্ষতি হলেও এর সুবিধা এই যে আমাদের ভক্তি, স্নেহ, প্রেম এমনকি সৌন্দর্য ভোগের জন্য বাইরের দাসত্ব করতে হয় না। আমাদের দেশের স্বামী স্ত্রীর কাছে দেবতা হিসাবে পূজা পান, কিন্তু তার জন্য স্বামীর দেবত্ব বা মহত্ত্ব থাকবার দরকার হয় না। স্ত্রীও মানুষ হিসাবে স্বামীকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করে, আবার দেবতা হিসাবে পূজা করে। একটা ভাব অপরটাকে অভিভূত করে না, কারণ আমাদের মনোজগতের সঙ্গে বাহ্য জগতের সংঘাত তেমন প্রবল নয়। সমীর পৌরাণিক দেবদেবীর ব্যাপারে এবং গাভীর ব্যাপারে আমাদের অনুরূপ আচরণের দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যোমের উক্তিকে সমর্থন করল।

ক্ষিতি বলল, এইরকম কাল্পনিক সৃষ্টি বিস্তার করতে পারি বলে অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে। এটা সুবিধা নয়, অসুবিধা। এই মনোভাবের জন্য আমরা অপাত্রেও ভক্তি অর্পণ করি।

সমীর বলল, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে এখন এর ব্যতিক্রম ঘটছে। এর দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র। এই বইয়ে বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করবার আগে এবং কৃষ্ণের পূজা প্রচার করার আগে কৃষ্ণকে নির্মল ও সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করেছেন।

ক্ষিতি বলল, এই মনোভাবের অভাবের জন্য আমাদের দেবতার দেবতা হবার, পূজ্যের উন্নত হবার, মূর্তির ভাবের অনুরূপ হবার প্রয়োজন হয় নি। এতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটতে থাকে। বহির্জগৎকে বিলুপ্ত করে মনোজগৎকে একচ্ছত্র প্রাধান্য দিতে গেলে মানবজীবনের মূল অবলম্বনকেই হারাতে হয়।

'ভদ্রতার আদর্শ' রচনাটির সংক্ষিপ্তসার এই।

একদিন ব্যোমের অনুপস্থিতিতে স্রোতস্বিনী ভূতসভার অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের বলল যে বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম আছে, অতএব তাঁরা যেন ব্যোমকে একটু ভদ্রবেশ প'রে আসতে বলেন। দীপ্তি বলল, কাব্যরাজ্যে কবির শাসন যেমন কঠিন, আমাদের আচারব্যবহার বসনভূষণ সম্বন্ধে সমাজপুরুষের শাসন তেমনি কঠিন হওয়া উচিত, না হলে সমাজের ছন্দ ও সৌন্দর্য রক্ষা হতে পারে না।

ভূতনাথবাবু বললেন, অন্যমনস্ক ব্যোমকে এই বেশে মন্দ লাগে না। ক্ষিতিও বলল, ভালো কাপড় পরলে ব্যোমকে মানাবে না।

সমীর বলল, বেশভূষা আচারব্যবহারের স্খলন যেখানে শৈথিল্য অজ্ঞতা ও জড়তা সূচনা করে, সেইখানেই তা কদর্য দেখতে হয়। বাঙালী-সমাজ যেন পৃথিবীর বাইরে, তার সম্পর্ক কেবল ঘর ও গ্রামের সঙ্গে, তার কোনো সাধারণ অভিবাদন নেই। বাঙালীর বেশভূষা ও চালচলনের অভাবে একটা অপরিমিত আলস্য, স্বেচ্ছাচার ও আত্মসম্মানের অভাব প্রকাশ পায়, সেটা বিশুদ্ধ বর্বরতা।

ভূতনাথবাবু বললেন, কিন্তু আমরা সেজন্য লজ্জিত নই, বরং গর্বিত। মানসিক বিকারের ফলে আমরা বলি আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিক, অশনবসনগত নয়, তাই জড় বিষয়ে আমরা অনাসক্ত।

সমীর বলল, উচ্চতম বিষয়ে সব সময় লক্ষ্য স্থির রাখার জন্য নিম্নতম বিষয়ে যাঁদের বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্য জন্মায়, তাঁদের কেউ নিন্দা করে না, সমাজও তাদের শাসন বা উপহাস করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশের সব লোকই পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আদবকায়দা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে সমাজের শাসনের অতীত হয়ে বসে আছে!

এমন সময় ব্যোম আগেকার চেয়েও অদ্ভুত পোষাক পরে উপস্থিত হল। পূর্ব-আলোচনার সারমর্ম শুনে সে মন্তব্য করল, বৈরাগ্য ছাড়া মহৎ কাজ হয় না। যে সব জাতি কর্মিষ্ঠ, তারাই যথার্থ বৈরাগ্য জানে, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে পরিত্যাগ ক'রে তারা দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করে, বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের কর্মহীন শ্রীহীন নিশ্চেষ্ট নির্জীব বৈরাগ্য কেবল জড়ত্ব, অধঃপতিত জাতির মূর্ছাবস্থা, অহঙ্কারের বিষয় নয়। প্রকৃত কর্মী কর্মের নিয়মপালন উপলক্ষে সমাজের ছোট ছোট

কর্তব্য উপেক্ষা করতে পারে ; কিন্তু আমরা অকর্মণ্য, আমাদের সে অধিকার নেই, অথচ আমরাই তা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে করি। যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোন মহত্ত্ব সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নেই, তা অসভ্যতার নামান্তর।

স্রোতস্বিনী বলল, বেশে ব্যবহারে বাসস্থানে নিজেদের ভদ্র করে না তুললে আমরা নিজের ও পরের কাছে সম্মান লাভ করব না। ক্ষিতি বলল, সে জন্য বেতনবৃদ্ধি দরকার। দীপ্তি বলল, বেতনবৃদ্ধি নয়, চেতনবৃদ্ধি দরকার। অভাব নয়, মূঢ়তাই আমাদের ভদ্রতার অভাবের জন্য দায়ী, আমাদের বড়লোকেরাও নোংরা। স্রোতস্বিনী বলল, তার কারণ আমরা অলস। ক্ষিতি বলল যে, আমরা মনে করি আমরা স্বভাবে শিশু, অতএব অত্যন্ত সরল। নোংরামি ও নিয়মহীনতায় আমাদের লজ্জা নেই, আমাদের সব কিছুই অকৃত্রিম ও আধ্যাত্মিক।

এই দুটি রচনায় 'পঞ্চভূত'-এর অন্যান্য রচনার তুলনায় উৎকর্ষের অভাব লক্ষ্য করা যায়। 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'-এ দেখি পঞ্চভূত-সভার আলোচনায় দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী উপস্থিত নেই। তাই নারীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই বিষয় সম্বন্ধে যে সব সত্য ধরা পড়ে সেগুলি আমরা এই আলোচনায় পাই না, এর ফলে আলোচনাটির মধ্যে একটু অপূর্ণতা অনুভব করা যায়। শুধু স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির বক্তব্য নয়, সভাপতি ভূতনাথবাবুর বক্তব্য থেকেও আমরা বঞ্চিত হই, কারণ ভূতনাথবাবু এই আলোচনা-সভায় উপস্থিত থেকেও একটি কথা বলেন নি। এই রচনার আর একটি ত্রুটি এই যে, 'পঞ্চভূতে'র অন্যান্য রচনায় ক্ষিতি, ব্যোম ও সমীরের প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য তাদের প্রত্যেকের উক্তিতে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, এই রচনায় তাদের উক্তিতে সেই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে নি। এই রচনার মধ্যে ক্ষিতি যে সব কথা বলেছে, সেগুলি ব্যোম বা সমীরের মুখেও বেমানান হত না। তার ফলে রচনাটিতে বৈচিত্র্যের অভাব অনুভব করা যায়।

এই রচনাটিতে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মোটামুটি ভাবে গ্রহণযোগ্য তবে গ্রীকদেব দেবমূর্তির সৌন্দর্যের কারণ এবং আমাদের দেবমূর্তির সৌন্দর্যের অভাবের কারণ সম্বন্ধে এর মধ্যে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা সংশয়ের অতীত নয়। এতে রবীন্দ্রনাথ সমীরের জবানীতে লিখেছেন, যে গ্রীকরা "বহির্জগতের আদর্শকে ...নিজের ইচ্ছামতে লোপ" করতে জানত না বলেই তারা "মনের সৌন্দর্যভাবকে মূর্তি দিতে গেলে কথনোই কোনো অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্যের সমাবেশ" করতে পারত না।

ন্তু আমরা বহির্জগতের আদর্শকে নিজের ইচ্ছামত লোপ করতে পারি বলেই দেবদেবীর তি রচনায় অস্বাভাবিকতা ও অসৌন্দর্যের সমাবেশ করতে পারি। কিন্তু আমাদের ক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তিতেও সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতার অভাব নই। এর থেকে মনে হয়, ভারতবাসীরা দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনার সময়ও যতদূর ম্ভব বহির্জগতের আদর্শকে অক্ষুণ্ণই রাখতেন। গণেশ প্রভৃতি দেবতার মূর্তি যে অদ্ভুত-র্শন, তার কারণ আমাদের বহির্জগতের আদর্শকে যথেচ্ছভাবে লোপ করার ক্ষমতা বা ৌন্দর্যবোধের অপূর্ণতা নয়, বহু যুগের বহু কল্পনা ও তত্ত্ব একত্র সংমিশ্রিত হয়ে এইসব র্তির পরিকল্পনা রচনা করেছে, সৌন্দর্যবোধকে স্বতই তার সঙ্গে আপোষ করে চলতে য়েছে এবং বহির্জগতের আদর্শকে সে ক্ষেত্রে তত্ত্বের অনুরোধে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

'ভদ্রতার আদর্শ' নামক রচনায় বিভিন্ন বক্তা একটা কথাই জোর দিয়ে বলেছেন যে, াঙালীর বেশভূষা চালচলনের অভাবে যে একটা অপরিমিত আলস্য, শৈথিল্য, স্বেচ্ছাচার ও আত্মসম্মানের অভাব প্রকাশ পায়, তা অত্যন্ত গর্হিত, কতকগুলি কারণ াকলে এই ত্রুটি মার্জনা করা যায়, কিন্তু আমাদের সে রকম কোন কারণ নেই; অথচ াদের ক্ষেত্রে কারণ আছে, তাদের তুলনায়ও আমাদের ভদ্রতার অভাবের প্রতি ঔদাসীন্য বেশী এবং আমরা সে জন্য লজ্জিত নই, বরং কিঞ্চিৎ গর্বিত। বাঙালীর এই ত্রুটিকে পঞ্চভূত-সভার সকলেই ধিক্কার দিয়েছে, সবচেয়ে বেশী দিয়েছে ব্যোম। অথচ ব্যোমের বেশভূষায় ভদ্রতার অভাব আছে বলে স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি মন্তব্য করাতেই এই দিনকার আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। সাজপোষাকে ভদ্রতা রক্ষার আদর্শ বাঙালীরা রক্ষা করে না বলে ব্যোম স্বজাতিকে ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু সে নিজে কেন এই আদর্শের প্রতি ঔদাসীন্য দেখায়, তার কোন কৈফিয়ৎই সে দেয় নি। আলোচ্য রচনাটির আর একটি ত্রুটি এই যে, এর মধ্যে স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, ক্ষিতি, ব্যোম, সমীর, ভূতনাথবাবু কলে একটি কথাই বারবার করে বলেছেন, যে কথাটির উল্লেখ আমরা উপরে করেছি। এর ফলে রচনাটিতে বেশ খানিকটা একঘেয়েমি এসে গিয়েছে।

আলোচ্য রচনাটির এক জায়গায় সমীর বলেছে, "হিন্দুস্থানির সেলামের মতো াঙালির কোনো সাধারণ অভিবাদন নাই।...বাঙালি স্ত্রীলোক যথেষ্ট আবৃত নহে এবং র্বদাই অসম্বৃত...।" যে সময়ে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল, তখনকার বাঙালী-সমাজ সম্বন্ধে এই মন্তব্য সত্য ছিল, কিন্তু এখনকার বাঙালী-সমাজ সম্বন্ধে সত্য নয়। এখন বাঙালী

করজোড়ে নমস্কার করাকে সাধারণ অভিবাদন বলে গ্রহণ করেছে এবং এখন শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেরও অধিকাংশ বাঙালী স্ত্রীলোক জামা পরে।

'অপূর্ব রামায়ণ' এবং 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' কতকটা দার্শনিক রচনার পর্যায়ভুক্ত। ছুটি রচনাই অত্যন্ত সুন্দর, তবে পূর্ববর্তী রচনাগুলির তুলনায় এদের মধ্যে বিচিত্র যুক্তিজালের সমাবেশ এবং একটি বিষয়কে নানা দিক থেকে বিচার করে পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করার নিদর্শন দেখা যায় না। সে দিক দিয়ে এই রচনা ছুটি আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary) হয়ে পড়েছে। এই ছুটি রচনাতেও স্রোতস্বিনী ও দীপ্তিকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখি না। তারও ফলে এদের মধ্যে অসম্পূর্ণতা দোষ প্রবেশ করেছে। অবশ্য এই ছুটি প্রবন্ধ ভাবগৌরবে সমৃদ্ধ। এদের রচনাভঙ্গীও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

'অপূর্ব রামায়ণ' রচনাটির সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

শুভকাজের বাড়ীতে নহবতের তান শুনে ব্যোম বলল, আমাদের দেশের রাগিণীগুলিতে একটা মৃত্যুশোকের ভাব আছে. সুরগুলি কেঁদে কেঁদে বলে, জগতে কিছুই স্থায়ী হয় না। এই নিষ্ঠুর কথাটা বাঁশীর মুখে শুনতে ভালো লাগে, কারণ বাঁশীতে এই কঠোর সত্যকে মধুর করে তোলে, মনে হয় মৃত্যু এই রাগিণীরই মত করুণ, কিন্তু এই রাগিণীর মতই সুন্দর। একজনের কণ্ঠে যে কথা রোদনের চীৎকার হয়ে বেজে উঠত, বাঁশী তাকেই জগতের মুখ থেকে ধ্বনিত করে করুণাপূর্ণ ও সান্ত্বনাময় রাগিণীর সৃষ্টি করেছে।

ব্যোম আরও বলল, মৃত্যুই জগৎরচনারূপ কাব্যের প্রধান রস। মৃত্যু না থাকলে জগৎ নিশ্চল হয়ে যেত, সঙ্কীর্ণ, কঠিন ও বদ্ধ হয়ে থাকত। অনন্ত অস্তিত্ব জীবের পক্ষে গুরুভার হত, মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভারকে লঘু ক'রে রেখেছে। মৃত্যুই নির্দেশ করে যে এই জগতের বাইরে এক অসীম জগৎ আছে। মানুষের সমস্ত কিছু কবিতা, গান, ধর্মতন্ত্র, বাসনা সেই অসীম জগতের দিকেই ধাবিত হয়।

সমীর বলল, মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে থাকার মধ্যে মর্যাদা আছে। ক্ষিতি বলল, মৃত্যু না থাকলে এই অসুবিধা হত যে জীবনে কোন কাজের মধ্যে কোন ছেদ পড়ত না, জীবনে কোন কিছু করার জন্য কোন তাড়াও থাকত না।

ব্যোম বলল, জগতের মধ্যে মৃত্যুই চিরস্থায়ী, তাই আমরা আমাদের সব চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে, আমাদের স্বর্গ, পুণ্য, অমরতা সব কিছুকে, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনাকে তারই মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের শিব শ্মশানবাসী।

সমীর বলল, মানুষ মৃত্যুর পারে যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্বাসিত করেছে, এই বাঁশীর সুর যেন সেগুলি আবার মানুষের জগতে ফিরিয়ে আনছে। সাহিত্যরস এবং কলারস এই পৃথিবীতেই অনন্ত সৌন্দর্যকে নিয়ে আসছে, অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের যোগ স্থাপন করছে। বর্তমান যুগে তাই প্রকৃত প্রেমের স্থান পরলোকে না ইহলোকে, এই নিয়ে প্রাচীন বৈরাগ্যধর্ম এবং আধুনিক সাহিত্য ও ললিতকলার সংঘাত বেধেছে।

তখন ক্ষিতি এই প্রসঙ্গের আলোকে রামায়ণের এক নতুন ব্যাখ্যা দিল। এই ব্যাখ্যা অনুসারে রামচন্দ্র মানুষের প্রতীক, সীতা প্রেমের প্রতীক। ধর্মশাস্ত্রের কলঙ্ক রটনায় এই প্রেম মৃত্যুতমসার তীরে নির্বাসিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে অনিত্য পদার্থের সঙ্গে বাস করেছে। নির্বাসিত প্রেম লবকুশকে অর্থাৎ কাব্য ও ললিতকলাকে প্রসব করেছে। তারা কবির কাছে রাগিণী শিখে তাই গেয়ে পিতার মন চঞ্চল ও চোখ অশ্রুসিক্ত করে তুলছে। এখন ত্যাগপ্রচারক প্রাচীন বৈরাগ্য-ধর্ম জয়ী হবে, না এই দুটি মঙ্গলগায়ক শিশু জয়লাভ করবে, সেইটিই দেখবার।

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' রচনার সারমর্ম এই।

একদিন ব্যোম ও ক্ষিতির মধ্যে বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি ও চরম লক্ষ্য নিয়ে মহা তর্ক বেধে গিয়েছিল। সেই উপলক্ষে ব্যোম বলল যে, আমাদের কৌতূহল একদিন নতুনের খোঁজে, নিয়মহীন অলৌকিক জগৎ আবিষ্কারের নেশায় বেরিয়ে পড়েছিল, বিজ্ঞান সৃষ্টি তার উদ্দেশ্য ছিল না, তবু সেই সন্ধান করতে গিয়ে সে লক্ষ্যবস্তু লাভ না ক'রে আকস্মিকভাবে নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। ব্যোম নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তুলল। তার মতে, নিয়মহীন জগৎকে খুঁজতে গিয়ে আমরা যে নিয়ম আবিষ্কার ক'রে আনন্দ করি, তা আমাদের কৃত্রিম অভ্যাস, আদিম প্রকৃতিগত ব্যাপার নয়।

সমীর ব্যোমের উক্তিকে সমর্থন করে বলল, কিন্তু এখনও লোকে বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে না, করে অবৈজ্ঞানিক অলৌকিক রহস্যকে। নিপুণ ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়ম

অনুসারে রোগীকে ভাল করছেন, এ কথায় তাই আমাদের তৃপ্তি হয় না, আমরা 'তাঁর হাতযশ আছে' বলে তাঁর উপর একটা অতিলৌকিক গুণ আরোপ করি।

ভূতনাথবাবু বললেন, তার কারণ, নিয়ম জিনিসটা অনন্তকাল ও অনন্ত দেশে প্রসারিত হলেও তা নিজের সীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাই তা মানুষের কল্পনাকে পীড়া দেয়। অবশ্য মানুষ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাবিক অনন্ত আশা এবং কৌতূহল-বৃত্তির স্বাভাবিক নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করে নিয়মকে ভক্তি করতে থাকে।

ব্যোম বলল, কিন্তু সে ভক্তি যথার্থ নয়, তা কাজ আদায়ের ভক্তি। যখন নিশ্চিত-ভাবে জানা যায়, জগৎ অপরিবর্তনীয় নিয়মে বদ্ধ, তখন প্রাণেব দায়ে তাকে ভক্তি করতে হয়। কিন্তু যখন আমবা জানতাম দৈবশক্তিব ইচ্ছামতেই সব ঘটছে, তখনই আমরা আন্তরিক তৃপ্তি পেতাম। তার কারণ, আমরা অনুভব করি যে আমাদের ইচ্ছা-শক্তি সব নিয়মের বাইরে, সে স্বাধীন। আমাদের অন্তরপ্রকৃতিগত সেই স্বাধীনতার সাদৃশ্য বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করতে স্বভাবতই আমাদের আনন্দ হয়।

ভূতনাথবাবু বললেন, আগে আমরা যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার কর্তৃত্ব আছে বলে ভেবেছিলাম, সেখানে নিয়মের অন্ধ শাসন দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান আলোচনা করলে জগৎকে আনন্দ ও ইচ্ছার সম্পর্কশূন্য বলে মনে হয়। কিন্তু অন্তরের ইচ্ছা ও আনন্দকে জগতের অন্তরে অনুভব না করেও আমরা তৃপ্তি পাই না। আমাদের মধ্যে বিশ্বনিয়মের যে ব্যতিক্রম আছে, তার একটা মূল আদর্শ যে জগতে কোথাও নেই, একথা আমাদের অন্তরাত্মা স্বীকার করতে পারে না। তাই আমাদের ইচ্ছা ও প্রেম বিশ্ব-ইচ্ছা ও বিশ্ব-প্রেমেব অপেক্ষা না রেখে বাঁচতে পারে না।

সমীর বলল, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিশ্বনিয়মের এই ব্যতিক্রম আমাদের এই বিশ্ব-নিয়মের অতীত এক জগৎকে আবিষ্কার করতে শিখিয়েছে। সেই জগৎ থেকে আমাদের জগতে সৌন্দর্য, স্বাধীনতা, প্রেম ও আনন্দ ভেসে আসছে। তাই সৌন্দর্য ও প্রেমকে কোন বিজ্ঞানের নিয়ম বাঁধতে পারে নি।

এমন সময় স্রোতস্বিনী ঘরে ঢুকে বলল যে দীপ্তির পিয়ানো বাজাবার স্বরলিপি বইটা ইঁদুরে রাত্রে কুটি কুটি করে কেটে পিয়ানোর তারের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে।

সমীর এই ব্যাপারটাকেই মানুষের আদিম কৌতূহল এবং তার ফলে বিজ্ঞান আবিষ্কারের রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করল। সে বলল ঐ ইঁদুরটি বোধ হয় বৈজ্ঞানিক,

বিস্তর গবেষণা করে সে বাজনার বইয়ের সঙ্গে বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছে। এই নিয়ে সে সারারাত্রি গবেষণা চালাচ্ছে, দাঁত দিয়ে বাজনার বইয়ের বিশ্লেষণ করছে এবং পিয়ানোর তারের সঙ্গে তাকে নানাভাবে একত্র করে দেখছে। এরপর বাজনার তার, কাঠ সব কেটে শতছিদ্র করে সে গবেষণা চালাবে। তার ফলে মাঝখান থেকে সঙ্গীত বন্ধ হয়ে যাবে। অবশেষে সুদীর্ঘকাল গবেষণার ফলে তার এবং কাগজের উপাদান সম্বন্ধে অনেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী, তা ধরা পড়বে না। অবশেষে পরবর্তী যুগের ইঁদুরেরা বলবে, কাগজ ও তারের মধ্যে সম্পর্ক থাকার ধারণাটা প্রাচীন ইঁদুরদের কুসংস্কার , তবে এই অলীক জিনিসের অনুসন্ধান করে একটা লাভ এই হয়েছে যে তার ও কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে ইঁদুরদের কানে সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ করে তাদের অন্তরকে মোহাবিষ্ট করে তুলবে, তারা মনে করবে এই ব্যাপারটা একটা রহস্য এবং তারা এই আশাই করবে যে কাগজ ও তারকে শতছিদ্র করে অনুসন্ধান চালাতে চালাতে তারা একদিন এই রহস্য ভেদ করতে পারবে। অর্থাৎ জগতের মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার আছে জেনে মানুষ তাকে আয়ত্ত করার জন্যে অনুসন্ধান চালিয়েছিল. কিন্তু তা করতে সে পারেনি, তার বদলে তার অনুসন্ধানেব ফলে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে, বহু বৈজ্ঞানিক সত্য সে আবিষ্কাব করেছে। এখন তার মনে হচ্ছে অলৌকিক ব্যাপারের কথাটা প্রাচীন মানুষদের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু এখনও মাঝে মাঝে সেই অলৌকিক রহস্যেব আভাস সে পায়, কিন্তু তাকে ধরবার জন্য গবেষণা চালালে বিজ্ঞানের আরও নতুন নতুন নিয়ম আবিষ্কার করা ছাড়া আর কোনই ফল হয় না।

'অপূর্ব রামায়ণ' রচনাটি সত্যিই অপূর্ব। এর মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু আছে বলা যায় না, কবি-মনের একটি বিশিষ্ট মুহূর্তের কতকগুলি রমণীয় চিন্তা-ভাবনা এতে কথোপকথনের আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত মধুরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। 'অপূর্ব রামায়ণ' আসলে কথোপকথনের আঙ্গিকে লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। মনে হয়, কোন এক সন্ধ্যায় নহবতের তান শুনে রবীন্দ্রনাথের মনে যে সমস্ত বিচিত্র ভাবনা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, সেইগুলিকেই তিনি এই রচনার মধ্যে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই চমৎকার রচনাটির একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই রচনাটির শেষে রামায়ণের যে অভিনব ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেটি ক্ষিতির মুখে দেওয়া উচিত

হয় নি বলে মনে হয়। কারণ এই ব্যাখ্যার মধ্যে ভাববাদেরই বেশী প্রাধান্য দেখা যায়। 'পঞ্চভূত'-এর অন্যান্য রচনাতে দেখি, অন্য কেউ এই জাতীয় কোন কথা বললে ক্ষিতি তা নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। গ্রন্থের সূচনায় ক্ষিতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। তাহার বাহিরেও যদি সত্য থাকে, সে সত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, এবং সে সত্যের সহিত তিনি কোনো সম্পর্ক রাখিতে চান না।" ক্ষিতির এই 'পরিচয়-'এর সঙ্গে তার দেওয়া রামায়ণের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য নেই। তাই এই ব্যাখ্যাটি সমীর বা ভূতনাথবাবুর মুখে দিলেই ভাল হত বলে আমরা মনে করি।

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' রচনাটিও উপভোগ্য। তবে রচনাটি একটু এলোমেলো ধরনের। যে কৌতূহলের প্রেরণায় মানুষ বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, তার সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় অনেকই আছে। রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটিতে সে সম্বন্ধে সব কথা বলেন নি এবং যেটুকু বলেছেন, তার মধ্যেও পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়। তবে তিনি যে ক'টি কথা বলেছেন, সেগুলি তাদের মৌলিকতা ও সরসতার জন্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

রচনাটির মধ্যে এই কথাটিই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে মানুষের কৌতূহল তাকে অলৌকিক জিনিসের সন্ধান করতে প্রেরণা দিয়েছিল, সেই সন্ধান করতে গিয়ে সে আকস্মিকভাবে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু যে ক'টি দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সেই ক'টি ছাড়া অন্যান্য দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে এর বিপরীত সিদ্ধান্তেই আসতে হয়, সে সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। সে যুগের আগুন আবিষ্কার, ঔষধ আবিষ্কার থেকে সুরু করে এ যুগের ইঞ্জিন আবিষ্কার, বেতার আবিষ্কার, পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার—সমস্ত আবিষ্কারের ইতিহাসই এই দিকে সাক্ষ্য দেয়। অথচ 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' রচনার মধ্যে এই দিকটি একেবারেই আলোচিত হয়নি। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই বিষয়টিকে যেভাবে দেখা সম্ভব, সেভাবে দেখবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটির মধ্যে আদৌ করেন নি, বাস্তববাদী ক্ষিতি সমগ্র আলোচনার মধ্যে নীরব থেকে ভাববাদী ব্যোম, সমীর ও ভূতনাথবাবুর একদেশদর্শী যুক্তিগুলি পরিপাক করে

গেছে। রচনাটির প্রথমেই বলা হয়েছে যে “বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরম লক্ষ্য লইয়া ব্যোম এবং ক্ষিতির মধ্যে মহা তর্ক” থেকেই এই আলোচনার সৃষ্টি হয়েছিল, তবু সারা রচনার মধ্যে ক্ষিতি একটিও কথা বলল না কেন, তা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।

এই রচনাটির শেষে সমীর যেভাবে ইঁদুরের স্বরলিপির বই কাটার ব্যাপারটিকে মানুষের বিজ্ঞান আবিষ্কারের রূপক হিসাবে দাঁড় করিয়েছে, তার মধ্যে উপভোগ্য মৌলিকতা এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় মেলে। এই রচনার শেষ অনুচ্ছেদটি অপূর্ব কাব্যমাধুর্যে মণ্ডিত।

“কিন্তু এক-এক দিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালনকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব সংগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং অন্তঃকরণকে ক্ষণকালের জন্য মোহাবিষ্ট করিয়া দেয়। সেটা ব্যাপারটা কী। সে একটা রহস্য বটে। কিন্তু সে রহস্য নিশ্চয়ই কাগজ এবং তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমশ শতছিদ্র আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।”

‘পল্লিগ্রামে’ নামক রচনাটিকে নিখুঁত বলা চলে। সূক্ষ্ম ও পরিশুদ্ধ চিন্তা এবং রচনাভঙ্গীর স্নিগ্ধতা ও উজ্জ্বলতার দিক দিয়ে রচনাটি তুলনারহিত। তবে ‘মন’ এবং ‘কৌতুকহাস্যের মাত্রা’র মত এই রচনাটিও ভূতনাথবাবুর নিজস্ব রচনা, পঞ্চভূত-সভার কথোপকথনের আঙ্গিক এর মধ্যে অনুসৃত হয়নি। ‘মন’ প্রবন্ধ পঞ্চভূত-সভার ‘অখণ্ডতা’ সংক্রান্ত আলোচনার উদ্বোধন করেছে এবং ‘কৌতুকহাস্যের মাত্রা’ ‘কৌতুকহাস্য’ সংক্রান্ত আলোচনার পরিশিষ্ট স্বরূপে রচিত। ‘পল্লিগ্রামে’র সঙ্গে পঞ্চভূত-সভার কোন আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই। ভূতনাথবাবু যখন পরম নিশ্চিন্তভাবে পল্লিগ্রামে বাস করে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা দর্শনে মুগ্ধ হচ্ছিলেন, সেই সময়ে পঞ্চভূত-সভার কোন এক সদস্য তাঁকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরো পাঠান। সেগুলি পড়ে ভূতনাথবাবুর মনে কতকগুলি নতুন চিন্তার উদয় হয়। সেই চিন্তাগুলিকেই তিনি এই রচনাটির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। এইভাবে ‘পল্লিগ্রামে’র সঙ্গে ‘পঞ্চভূত’ গ্রন্থের একটা ক্ষীণ যোগসূত্র রচনা করা হয়েছে।

এখন রচনাটির সারসংকলন করা যাক।

লেখক শহর থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশের এক প্রান্তের একটি গ্রামে বাস

করছিলেন। এখানকার মানুষগুলি অত্যন্ত সরল, বিশ্বাসপরায়ণ এবং অতিথিবৎসল। হঠাৎ একদিন পঞ্চভূত-সভার কোন এক সভ্য লেখকের কাছে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরো পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি জায়গার খবর লেখা ছিল। কাগজগুলি পড়ে তাঁর মনে হল গ্রামের এই লোকগুলি লণ্ডন-প্যারিসের তুলনায় কোথায় গিয়ে পড়ে। সে শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতির বিন্দুবাষ্পও তো এদের মধ্যে নেই। তা সত্ত্বেও তিনি এদের শুধু ভালবাসেন না, শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু কেন?

তার কারণ, এদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তা বহুমূল্য, মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন, লেখকের কাছে তার চেয়ে মনোহর আর কিছুই নেই। সরলতার মধ্যেই সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্য, সরলতাই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাস্থ্য।

সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করে স্বভাবের সঙ্গে একীভূত করে নেওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা। সেটা এই নির্বোধ গ্রামবাসীদের মধ্যেই পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়। অতিথি ঘরে এলে এরা আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে তার সেবা করে। লেখক নিজেও আতিথ্যকে ধর্ম বলে জানেন, কিন্তু তিনি জানেন জ্ঞানে, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে নানা তর্ক ও বিচার। আর এরা জানে বিশ্বাসে। সে বিশ্বাস এদের প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায় উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঘনিষ্ঠ ঐক্য দেখা যায়; তেমনি উন্নত মানবস্বভাবের জ্ঞান, বিশ্বাস ও কার্য নিম্নশ্রেণীর মানবস্বভাবের মত বিচ্ছিন্ন নয়; তার মধ্যে এই তিনটি উপাদানের অভেদ-সংযোগ ঘটে। অবশ্য যেখানে জ্ঞান, বিশ্বাস ও কার্যের বৈচিত্র্য নেই, সেখানেই এই ঐক্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতিতে জটিলতা বা বৃহত্ত্ব নেই, তাদের প্রয়োজনীয় আদিম পরিবারনীতি, গ্রামনীতি ও সমাজনীতি সহজেই তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে অখণ্ড জীবন্ত ভাব ধারণ করেছে, তাই তাদের প্রকৃতির মধ্যেও অনায়াসে ঐ তিন উপাদানের ঐক্য সাধিত হয়েছে। কিন্তু তার মাধুর্য অতুলনীয়। এই পল্লীটি ছোট ও তুচ্ছ হলেও সম্পূর্ণ ও সুন্দর। তার সৌন্দর্য সকলের জীবনের আদর্শ।

এ সৌন্দর্য কিসের? যার প্রকৃতি কোন একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করে থাকে, তার মুখে সেই ভাব ক্রমশ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করে। এই চাষাদের ক্ষেত্রে ঠিক তা'ই হয়েছে। বিশ্বাসকে প্রশ্ন করলে এবং নানা বিপরীত ভাবকে পরখ

করলে মুখে যে বুদ্ধির তীব্রতা ও সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়, এদের সৌন্দর্য তেমন নয়, এ সৌন্দর্য ভাবের গভীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য।

নব্য আমেরিকার মধ্যে ঔজ্জ্বল্য, চাঞ্চল্য ও কাঠিন্য থাকলেও প্রাচীন ইউরোপের মত তার মধ্যে বহু স্মৃতি, জনপ্রবাদ, বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা মানবজীবনের রং ধরে যায় নি। কিন্তু এই চাষাদের মুখে অন্তঃপ্রকৃতির সেই রং ধরে গেছে। তাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে সারল্যের পুরোনো শ্রী, কিন্তু সেই শ্রী অত্যন্ত সুকুমার, তা সকলের নজরে পড়ে না।

এদের মধ্যে রয়েছে স্বর্গীয় নম্রতা। এই সরল নম্র সৌন্দর্যই একদিন পৃথিবীকে অধিকার করবে। সভ্যতা যদি সরলতার সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে সে নিজের পরিপূর্ণতার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবে।

প্রাচীন সামগ্রীগুলি বহুকালের স্থায়িত্বের জন্য মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য লাভ করে, এই ঐক্যেই তাদের সৌন্দর্য। তেমনি যখন দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব আশ্রয় করে তর্ক, যুক্তি, জ্ঞান ক্রমশ সংস্কারে, বিশ্বাসে পরিণত হয়, তখন তার সৌন্দর্য ফুটতে থাকে। তখন সে স্থৈর্য লাভ করে এবং তার জীবনীশক্তি প্রকাশ পায়।

কিন্তু ইউরোপে এখন যে নতুন সভ্যতার যুগ আবির্ভূত হয়েছে, এ যুগে ক্রমাগত নতুন নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান, মতামত, যন্ত্রতন্ত্র স্তূপাকার হয়ে উঠছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরোনো হতে পারছে না। এই সব আয়োজনের মধ্যে ইউরোপবাসীদের হৃদয় থেকে, সাহিত্য থেকে আনন্দ ও শান্তি লোপ পেয়েছে; প্রমোদ বা নৈরাশ্য বা বিদ্রোহেরই সেখানে আতিশয্য। তার কারণ, এই বিপুল সভ্যতাস্তুপের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেই স্থায়ী সৌন্দর্য এখনো আসে নি। সেখানে জ্ঞান, বিশ্বাস ও কার্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে ব্রত।

সৌন্দর্য কেবল প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে নেই, নবীন আশার মধ্যেও আছে। নতুন ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে এখনো আশার সঞ্চার হয় নি। যে সমস্ত উপায়ের উপর তার গভীর বিশ্বাস ছিল, সে সবই সে ব্যর্থ হতে দেখেছে। সে তাই আশা বা বিশ্বাস করতে চায় না, কেবল পরীক্ষা করতে চায়।

এইসব কথা ভেবে লেখক এই পল্লীর ক্ষুদ্র সৌন্দর্য দ্বিগুণ আনন্দে উপভোগ করছেন।

অবশ্য, প্রভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই সৌন্দর্যের মূল কারণ। ইউরোপে এখন প্রভেদের যুগ পড়েছে তাই সেখানে বিচ্ছেদ ও বৈষম্য। ঐক্যের যুগ এলে এই বৃহৎ স্তূপের অনেকখানি ঝরে বা পরিপাক প্রাপ্ত হয়ে একটি সমগ্র সুন্দর সভ্যতা দাঁড়িয়ে যাবে। ক্ষুদ্র পরিণামে পরিসমাপ্তি লাভ করার ফলে যে সন্তোষ আসে তাতে আছে শান্তি, সৌন্দর্য ও নির্ভয়তা। মানুষকে এই ক্ষুদ্র ঐক্য থেকে মুক্তি দিয়ে বিপুল বিস্তারের দিকে নিয়ে যেতে গেলে অনেক অশান্তি ও বিঘ্ন-বিপদ, বিপ্লব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বীরত্ব। এই বীরত্ব ও সৌন্দর্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। ইউরোপে দুই উপাদান এখনও বিচ্ছিন্ন, তাই সে এখনও অর্ধসভ্য। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল উপাদানগুলি একদিন প্রতিভার প্রভাবে সুষম ঐক্য ও সৌন্দর্য লাভ করে এক মহৎ সভ্যতায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু এই পল্লিগ্রামের সরল ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা যতই সুন্দর হোক্, তাকে মহৎ করে তোলা প্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য।

'পল্লিগ্রামে' রচনাটি এতই সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ যে এর সম্বন্ধে সমালোচকের বলবার মত কথা প্রায় কিছুই নেই। গ্রামবাসীদের জীবনের যে "সুন্দর সুরসম্মিশ্রণের" কথা রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটিতে বলেছেন, তারই অনুরূপ সুন্দর সুরসম্মিশ্রণ এই রচনাটির মধ্যে দেখা যায়। বিষয়বস্তু, যুক্তি ও রচনাভঙ্গীর এমন পরিপূর্ণ সমন্বয় খুব অল্প লেখার মধ্যেই মেলে।

বিশ্লেষণ বা সমালোচনার মধ্য দিয়ে 'পঞ্চভূতে'র সৌন্দর্য ও অনন্যসাধারণত্বের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এই বইয়ের প্রধান ঐশ্বর্য এর রচনাভঙ্গী। এরকম স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ, সরল ও সরস, উজ্জ্বল ও গতিশীল ভাষা রবীন্দ্রনাথেরও অন্য কোন গদ্য-রচনায় দেখা যায় না। হাল্কা পান্‌সি যেমন অনুকূল স্রোতে তর্‌তর্‌ করে ভেসে চলে যায়, এই ভাষাও সেই রকম অনায়াস ভঙ্গীতে প্রবাহিত হয়েছে। এই সহজ মধুর ভাষার শক্তি কিন্তু অসাধারণ। এত অসাধারণ যে দুরূহ বিষয়বস্তুর গুরুভার সে অনায়াসেই বহন করেছে। এই ভাষার মধ্যে যেন একটা যাদু আছে, তাই এই সব গুরুভার বিষয়বস্তুকে সে যখন আমাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দেয়, তখন দেখি তাদের ভার বিস্ময়করভাবে লাঘব হয়ে গেছে।

'পঞ্চভূতে'র বিভিন্ন রচনার মূল বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা যে সমস্ত

নানামুখী যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু এইসব মূল বিষয় ও প্রধান প্রধান যুক্তি ছাড়া বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমন বহু প্রাসঙ্গিক উক্তি আছে, যেগুলি মণিখণ্ডেরই মত মহার্ঘ ও উজ্জ্বল এবং মৌলিকতা ও সরসতায় অনুপম। এ রকম কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করছি,

"ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কী করিয়া।

আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি তো আদালতে উপস্থিত হইতেছি-না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।"

"ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিক-পত্র সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না।

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই! ভাগ্যে ধুতুরা গাছ কামিনী গাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না 'তোমার ফুলের মধ্যে কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই,' এবং কুলফল কাঁঠালকে বলে না 'তুমি আপনাকে বড়ো মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই'। কদলী বলে না 'আমি সর্বাপেক্ষা অল্প মূল্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি', এবং কচু তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না!"

"লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক—তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে, আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোনো পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না। যেন খাপের সহিত তরবারি মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেই প্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহর-রূপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শ্রোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক, অসদৃশ।"

"আমাদের মনের মধ্যে যে বিশ্বকর্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজন-কক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশ-চেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য অধিক আছে। সেই তাঁহার প্রধান

গৌরব। অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লবমর্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।"

'পঞ্চভূতে'র চরিত্রগুলি যেভাবে ফুটেছে এবং তাদের সংলাপ যেরকম জীবন্ত হয়েছে, তাতে 'পঞ্চভূত' কিছু পরিমাণে উপন্যাসধর্মী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এবং যুক্তিমূলক আলোচনার দিক দিয়ে 'পঞ্চভূতে'র রচনাগুলি প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। 'পঞ্চভূতে'র মধ্যে উপন্যাস এবং প্রবন্ধের আঙ্গিকের সমন্বয় সাধিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানে একটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে জাগে। বিশুদ্ধ উপন্যাস এবং বিশুদ্ধ প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর উপন্যাসগুলি যেন উপন্যাস হতে হতেও উপন্যাস হয়ে ওঠে না, তাদের মধ্যে কাহিনীর সহজ স্বচ্ছন্দ প্রবাহ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে না, চরিত্রগুলির মধ্যে সব সময় হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায় না, তারা প্রায়ই কথা আর মতবাদের বাহন হয়ে ওঠে। তাঁর প্রবন্ধগুলিতেও অনেক সময় যুক্তির উপরে কবিত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিচিত্র ভঙ্গীতে বারবার একই কথার পুনরাবর্তন ঘটে বলে তারা প্রবন্ধ হিসাবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না। অথচ উপন্যাস ও প্রবন্ধ এই দুই শ্রেণীর রচনার ধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন 'পঞ্চভূত' লিখলেন, তখন তা একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠল। আমার মনে হয় গদ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনেব মিশ্র প্রকৃতির রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সার্থকতর ভাবে বিকশিত হয়েছে। তাঁর 'চতুরঙ্গ' ও 'শেষের কবিতা'র মধ্যে উপন্যাস ও কাব্যের ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে, 'লিপিকা'র মধ্যে ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কাব্য তিন শ্রেণীর রচনারই লক্ষণ অল্পবিস্তর পরিমাণে রয়েছে। এই বইগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম।

'পঞ্চভূতে' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন যেভাবে ঘটেছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। অনেকে মনে করেন যেহেতু ভূতনাথবাবুর জবানীতে বইখানি লেখা হয়েছে, অতএব ভূতনাথবাবুব কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথের মনের কথা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথই এই বইয়ে ভূতনাথবাবু নাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু যদিও ভূতনাথবাবু এই বইয়ে 'আমি' বলে উল্লিখিত এবং যদিও ভূতনাথবাবু রবীন্দ্রনাথের মতই 'কচ-দেবযানী-সংবাদ' নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাহলেও ভূতনাথবাবুর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, এ কথা বললে বিচারশক্তির অপূর্ণতা এবং দৃষ্টির অগভীরতার পরিচয় দেওয়া হয়। কেবল ভূতনাথবাবু নন, এই বইয়ের স

চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের সত্তার প্রতিনিধি। এই সমস্ত চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন না ; তিনি কোন কোন বিষয়কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছেন, আবার অন্যান্য বিষয়কে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। প্রকৃত সত্য সব সময় একটিমাত্র দৃষ্টি দিয়ে দেখলে উদ্‌ঘাটিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল সত্য আবিষ্কার, তাই বিষয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের সব চরিত্রেরই মতকে তিনি কোন না কোন সময় অন্যদের মতের তুলনায় প্রাধান্য দিয়েছেন ; কোন কোন ক্ষেত্রে ভূতনাথবাবুর যুক্তির তুলনায় তাঁর প্রতিবাদীর যুক্তিকে তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, যেমন 'নরনারী' প্রবন্ধের উপসংহারে ক্ষিতির যুক্তি গুরুত্ব লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা জটিল এবং নানামুখী, তাই তিনি বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কয়েকটি চরিত্রের পরিকল্পনা করে তাদের মুখ দিয়ে তাঁর চিন্তার বিভিন্ন দিককে অভিব্যক্তিদান করতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই অনুপ্রেরণার ফলেই 'পঞ্চভূতে'র সৃষ্টি। এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথেব প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন,

"Hegelএর মতে চিন্তাসূত্রের সকল synthesis-ই, thesis ও antithesisএর সমন্বয়ে ঘটে। একই মন thesis ও antithesis দুই-ই জোগায়—দুই-এর মিলনে যে synthesis তাহা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কাজ। তিনটি ব্যক্তিত্বকে পৃথক সত্তা দান করিয়া বাদানুবাদচ্ছলে চিন্তাকে সুশৃঙ্খলিত করা সত্যানুসন্ধানের একটা পদ্ধতি। অবিমিশ্র নৈয়ায়িক গোষ্ঠীতে রসিকের স্থান নাই। রসদৃষ্টিতেও যে সত্যের সন্ধান মিলে, কবি তাহা স্বীকার করেন। সেজন্য রসদৃষ্টিকেও তিনি চিন্তার গোষ্ঠীর মধ্যে আনিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞানদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টিরও thesis-antithesis সম্বন্ধ ঘটিয়া নূতন synthesis-এর প্রয়োজনের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে এক মনই বহুধা বিভক্ত হইয়া বহু ব্যক্তিত্ব রচনা করিতে পারে। কবি এই ভাবে আপনার চিত্তকে ছয়টি ব্যক্তিত্বে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন।

এই প্রথা অবলম্বন না করিলে অর্থাৎ ছয়টি principal কে ছয়টি জীবনময় ব্যক্তিত্ব কল্পনা না করিলে পঞ্চভূতের কবির বক্তব্য হয়ত সুসম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারার শৃঙ্খলার

একটা আদর্শ মাত্র হইত অর্থাৎ হয়ত ইহার একটা epistemological মূল্য থাকিত—literary মূল্য থাকিত না—সত্যের সন্ধান হয়ত পাওয়া যাইত—সন্ধানের আনন্দটুকু পাওয়া যাইত না। চিন্তাগতির ধারাবাহিকতার প্রবন্ধে বিবৃতির মধ্যে কল্পনা-লীলা বা রসসৃষ্টির অবকাশ নাই। বন্ধুগোষ্ঠীর স্বাধীন মধুর উদার আবহাওয়ায় পরস্পরের খোলা প্রাণের কথাবার্তায় তাহা সম্ভব হইয়াছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোলোকে যে চিন্তাবৈচিত্র্যের নাট্যাভিনয় চলিতেছে, তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশদান করিবার জন্য মনোলোকের চিন্ময় পাত্র-পাত্রীগুলিকেই কবি পঞ্চভূতের রূপ দান করিয়াছেন। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের রসানুভূতি, অভিজ্ঞতা, প্রাণের উষ্ণতা ও উদ্দীপনা, তত্ত্বের মনোবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অভিনব বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে।"

এই আঙ্গিক অনুসরণ করার ফলে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থ এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে, তা সাধারণ প্রবন্ধের মধ্যে স্ফূর্ত হতে পারত না। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখেছেন,

"যে কবিত্ব, আলঙ্কারিকতা, নাটকীয়তা, কৌতুক-রসিকতা প্রবন্ধের যুক্তিপরম্পরায় ক্রমভঙ্গ ঘটাইয়া দূষণস্বরূপ হইত, এ পদ্ধতিতে সেগুলি ভূষণস্বরূপ হইয়াছে।

এ প্রথাও সম্পূর্ণ নূতন নহে। কবির 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' নামক গ্রন্থদ্বয়েও এ-পদ্ধতি প্রকারান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে।

...বাদানুবাদের দ্বারা সত্যের আবিষ্কার হয়ত হয় নাই—কোন তর্কেরই হয়ত চরম সিদ্ধান্তও হয় নাই। কিন্তু কবি নিজে বহু স্থলে রসাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন—সেই রসাবিষ্ট অবস্থায় তিনি নিজের প্রাণের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সেইসকল প্রাণের কথায় অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে সত্যের উদ্বোধন হইয়াছে।"

পঞ্চভূতের আলোচনা-সভা সম্বন্ধে ভূতনাথবাবু লিখেছেন, "গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচ জনের গড়ের মাঠ; এখানে সত্যের শস্য-লাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দ-লাভ করিতে মিলি।" গড়ের মাঠের এই রূপকটি অত্যন্ত সুন্দর। 'পঞ্চভূতে'র আলোচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভূতনাথবাবু তথা তাঁর স্রষ্টা বিনয়বশত

কিছু বলেন নি। 'পঞ্চভূতে'র সাহিত্যিক উৎকর্ষ গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের মত আকাশ স্পর্শ করেছে, নীচে থেকে তার দিকে চেয়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। এই গড়ের মাঠের হাওয়া খেয়ে পাঠকেরা যুগে যুগে কৃতার্থ হবে এবং এই হাওয়া তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করে তুলবে।

অতঃপর, জনৈক লেখক 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে যে অভিনব কথা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। তিনি লিখেছেন যে পঞ্চভূতের "ডায়ারির 'লেখক ভূতনাথবাবু' রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং"। একথা বলা যে ঠিক নয়, তা আমরা আগেই আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যা হোক্, এর পরে উক্ত লেখক লিখেছেন, "অপর পাত্রপাত্রী অর্থাৎ পঞ্চভূত—ক্ষিতি, সমীরণ (সমীর), ব্যোম, দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী —তাঁহারি আত্মীয়-বন্ধুর প্রতিচ্ছবি। সাধনায় ডায়ারি যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে মানুষগুলিকে আবছাভাবে দেখা যাইত, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সংস্করণে ব্যক্তিক ছায়াটুকু একেবারে মুছিয়া ফেলায় রচনাটির অন্তরঙ্গতা কিছু যেন কমিয়াছে।" উক্ত লেখক কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করে এই কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে তিনি পাদটীকায় লিখেছেন, "সাধনা মাঘ ১২৯৯ পৃ ২০১ দ্রষ্টব্য"।

'সাধনা'র ১২৯৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের সংখ্যার ২০১ পৃষ্ঠা আমি দেখেছি। তাতে ঐ লেখকের উক্তির সমর্থক কিছুই আমি পাই নি। শুধু তাই নয়, 'সাধনা'য় পঞ্চভূতের ডায়ারি ("পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি") যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তার সবটা আগাগোড়া পড়েও আমি এমন কিছু পাইনি, যার থেকে মনে হতে পারে ক্ষিতি, সমীর, ব্যোম, দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী রবীন্দ্রনাথের কোন "আত্মীয়-বন্ধুর প্রতিচ্ছবি"। উক্ত লেখক কোন্ অতীন্দ্রিয় শক্তির বলে সাধনায় প্রকাশিত রচনায় "মানুষগুলিকে আবছাভাবে" দেখতে পেলেন জানি না।

'সাধনা'য় পঞ্চভূতের ডায়ারি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তার বহু অংশই 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে। এগুলি বর্জন করায় 'পঞ্চভূতে'র উৎকর্ষ একটুকু কমে নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধনায় প্রকাশিত "ডায়ারি"তে ভূতসভার সদস্যদের কথায় ও আচরণে বহু আতিশয্য ও অসঙ্গতি রয়ে গেছে; তাদের আলোচনার মধ্যে অহেতুক উচ্ছ্বাস ও প্রগল্‌ভজনোচিত বাগাড়ম্বরের অভাব নেই; ডায়ারির অনেক অংশ অপ্রাসঙ্গিক

সংযোজন বা অপরিণত রচনা। এই সমস্ত ত্রুটি 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে সম্পূর্ণ সংশোধিত হয়েছে। তাতে সাধনায় প্রকাশিত "ডায়ারি"র অপরিণত, অবান্তর ও আতিশয্যদুষ্ট অংশগুলি বর্জিত হয়েছে এবং অনেক অংশ পুনর্লিখিত হয়েছে। তার ফলে বইটি সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়েছে এবং তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ বহুগুণ বেড়ে গেছে। 'সাধনা'র প্রকাশিত "ডায়ারি" যেন খনি থেকে সদ্য-তোলা আকাটা হীরা আর 'পঞ্চভূত' কাটা-ছাঁটা পালিশ-করা হীরা, তার দ্যুতি অসামান্য, মূল্যও অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুরা 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে যে খাতাটিতে নিজেদের মন্তব্য লিখতেন, তারই মধ্যে 'পঞ্চভূত' ভ্রূণের আকারে দেখা দেয়,* তারপর সে 'সাধনা'র পৃষ্ঠার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় এবং গ্রন্থের মধ্যে সে পরিপূর্ণ যৌবন লাভ করেছে।

'সাধনা'য় প্রকাশিত "ডায়ারি"র তুলনায় 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের চরিত্রগুলি অনেক উন্নত ধরনের। 'সাধনা'য় দেখি, স্রোতস্বিনী ভূতনাথবাবুর মাথার মধ্যে আঙুল চালিয়ে পাকা চুল খোঁজে এবং ব্যোম অযথা "হর হর বোম্ বোম্" বলে চীৎকার করে ওঠে। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে এদের এই সমস্ত ছেলেমানুষী কার্যকলাপ বাদ দেওয়া হয়েছে, তার ফলে চরিত্রগুলি প্রশান্ত গাম্ভীর্য লাভ করে পরিপূর্ণ মর্যাদায় মণ্ডিত হয়েছে। সবচেয়ে উন্নতি হয়েছে সমীরের। 'সাধনা'য় প্রকাশিত ডায়ারিতে সমীরের নাম সমীরণ, সেখানে তার মধ্যে ভাবের আতিশয্য এবং উচ্ছ্বাসের বাহুল্য দেখা যায়, সে অনেক সময়ে

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে (১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৪২) লিখেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথের (ঠাকুর) বাড়িতে জমে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সাহিত্যিকদের মজলিস। 'পারিবারিক স্মৃতি' নামে এক খাতায় সাহিত্যিকরা লেখেন নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য। একই বিষয়ে বহুজনের বহু মত হইতে পারে—পক্ষে ও বিপক্ষে ; বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই, অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই লেখকদের মধ্যে প্রধান—তাঁহার হাতে কোনো সাময়িক পত্রিকা নাই। নানা কথা নানা ভাবে মনে জাগে, এই খাতায় লিখিয়া যান আপন মনে ; কেহ বা তার মধ্যে খুঁত ধরে, টিপ্পনী করে—তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ হয়, লেখার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আছেন জ্যেষ্ঠদের মধ্যে ; তা ছাড়া আসেন আশুতোষ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র, কবি অক্ষয় চৌধুরী, সিভিলিয়ান লোকেন পালিত ; ছোটদের মধ্যে আছেন সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ। এই পাণ্ডুলিপিখানি ভালো করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' নামে যে-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা মুখ্যত এই পাণ্ডুলিপির উপাদান ও আইডিয়া হইতে গৃহীত।"

পাগলের মত অনর্গল বকে গেছে, সমীরণ নিজেই বলেছে, "আমি কেবল চারদিকে হাহা হু হু করিয়াই মরি। বন্ধুরা সর্ব্বদা তাগিদ করেন, একটা কিছু কাজ কর না কেন, আমি বলি আমার এত বেশী ভাবের প্রাবল্য যে কোন একটা বিশেষ কাজ করা আমার পক্ষে অসাধ্য।" (সাধনা, মাঘ, ১২৯৯, পৃ: ২১১)

'সাধনা'র 'সমীরণ'-এর নাম 'পঞ্চভূতে' 'সমীর' হয়েছে। তার নামই শুধু সংক্ষিপ্ত হয়নি, কথাও সংক্ষিপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ তার উক্তিব যে সব অংশে অহেতুক এবং অসংলগ্ন উচ্ছ্বাস ছিল, সেগুলি বর্জিত হয়েছে। বাতাস কেবল "হাহা হু হু" কবে না, স্নিগ্ধ মন্দ পবন আমাদেব প্রাণ জুড়োয়। তাছাডা আমাদের জীবনই রক্ষা করে বায়ু। তাই সমীরকে মানবচরিত্র রূপে কল্পনা কবলে তাব মধ্যে শুধু বায়বীয় উচ্ছ্বাস দেখালে চলবে না, তাকে স্নিগ্ধ, প্রাণবন্ত এবং বাস্তব-সচেতন করে তুলতে হবে। 'পঞ্চভূত' গন্থেব সমীরের মধ্যে আমবা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই। সে উচ্ছল অথচ স্নিগ্ধ, ভাববাদী অথচ বাস্তব-সচেতন, কল্পনাপ্রবণ অথচ যুক্তিনিষ্ঠ।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের কয়েকটি ছোটখাট ক্রটি আমাদের নজরে পড়েছে। এগুলি উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব। 'অখণ্ডতা' প্রবন্ধে দেখি ক্ষিতি সমীরকে বলছে, "দেখো ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক"। এই বাক্যটি 'সাধনা' থেকে অপরিবর্তিতভাবে বইয়ে নেওয়া হয়েছে বলে এখানে একটু ক্রটি ঘটে গেছে। বলা বাহুল্য, এখানে 'সমীরণ'-এর জায়গায় 'সমীর' হওয়া উচিত ছিল।

তারপর, 'গন্থ ও পদ্য' রচনায় দেখি ব্যোম বলছে,

"পদ্যটা না কি আধুনিক সৃষ্টি, সেই জন্য সে হঠাৎ-নবাবের মতো সবদাই পেখম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেডায়—আমি তাহাকে দু চক্ষে দেখিতে পারি না।"

এবং 'কৌতুকহাস্যেব মাত্রা'র এক জায়গায় লেখা আছে,

"জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামতো কিছু হয় না, এই জন্য জড়ের পক্ষে কিছুই অসংগত কৌতুকাবহ হইতে পারে না।"

এই দুই জায়গায় 'নাকি' কথাটির ব্যবহারের কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

'প্রাঞ্জলতা'র মধ্যে এক জায়গায় ভূতনাথবাবু বলেছেন,

"তরঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে।"

এই বাক্যটির শেষাংশের তাৎপর্য স্পষ্ট হয় নি, কারণ পরিপূর্ণতার অভাবের সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গের লোককে বিচলিত করার কোন কার্যকারণ-সম্পর্ক নেই।

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' রচনায় এক জায়গায় সমীর কথামালার একটি গল্প সম্বন্ধে বলেছে,

"বালকপ্রকৃতি বালক-মাত্রেরই এ গল্পটি পড়িয়া কষ্ট বোধ হইয়া থাকে।"

এই বাক্যটি পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট।

পরিশিষ্ট

'লিপিকা'র একটি রচনা

এই বইয়ে 'লিপিকা' সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে 'লিপিকা'র একটি অনন্যসাধারণ রচনার উল্লেখ করা হয় নি। রচনাটির নাম 'অস্পষ্ট'। এরকম অপূর্ব রচনা যে-কোন দেশের সাহিত্যেই বোধ করি বিরল। এই রচনাটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রূপকের ছলে 'লিপিকা'র সব রচনারই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণীয়তার মূল উপাদানটি ব্যাখ্যা করেছেন বলে মনে হয়। রচনাটিতে বনমালী নামে যে ছেলেটির দেখা পাওয়া যায়, সে তার প্রতিবেশিনীর জীবনের টুকরো টুকরো ছবি দূর থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই জানতে পারে নি। অবশেষে বনমালী একদিন মেয়েটিকে একটি চিঠি লিখল। চিঠি ডাকে দিয়ে লজ্জিত হয়ে সে মধুপুরে চলে গেল। ফিরে এসে দেখে "সামনের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার" আর তার ডেস্কের উপরের একরাশ চিঠির নীচে রয়েছে একটি চিঠি, তার "শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট আপিসের ছাপ।" বনমালী আলোর সামনে খামটি তুলে ধরে তার "অস্পষ্ট অক্ষর" দেখল, তারপর চিঠিটি বাক্সে তালাবন্ধ করে রেখে শপথ করল, "এ চিঠি কোনো দিন খুলব না।" কিন্তু কেন সে এই শপথ করল? তার কারণ তার প্রতিবেশিনীর জীবনের যে অস্পষ্ট পরিচয় সে পেয়েছে, তাকেই সে মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে, তারই মূল্য তার কাছে বেশী বলে মনে হয়েছে। এই অস্পষ্ট ছবিটিকে অবলম্বন করে তার মন নিত্য নতুন কল্পনার জাল বুনে চলবে, ছবিটি চিরদিন থাকবে সজীব হয়ে, চিঠিগুলি পড়ার ফলে যদি তার এই অস্পষ্টতা ঘুচে গিয়ে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেত, তাহলে তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যও আর থাকত না, তখন দেখা যেত ব্যাপারটা জীবনের আর পাঁচটা ব্যাপারের মতই গতানুগতিক। 'লিপিকা'র রচনাগুলির মধ্যেও ঠিক এইরকম ভাবে দেখি ভাব কতক স্পষ্ট হয়েছে কতক হয়নি। কিন্তু তাদের মধ্যে আছে সেই অম্লান চির-সজীবতা, আমাদের মন তাদের কেন্দ্র করে নিত্য নতুন ভাবনা ও কল্পনার আলপনা রচনা করে। এইখানেই তাদের আকর্ষণীয়তা। ভাবগুলি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠলে রচনাগুলি ছাঁচে-ঢালা গতানুগতিক রচনার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যেত।

গ্রন্থপঞ্জী

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ'-এ যে সমস্ত বিষয়ের সমালোচনা করা হয়েছে, সেগুলির সম্বন্ধে অন্য যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়, তাদের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। এই তালিকার মধ্যে কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি, এ রকম কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃতও করা হল, আশা করি তাদের মধ্য থেকেই লেখকদের মূল বক্তব্যের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং একই বিষয়কে যে কত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা সম্ভব, সে সম্বন্ধেও সকলে একটা ধারণা পাবেন। তবে এমন কোন কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ আছে, যাদের কোন একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করলে মূল বক্তব্যের পরিচয় মেলে না, সে পরিচয় পেতে হলে সমগ্র আলোচনাটিই পড়তে হয়। এইসব বই বা প্রবন্ধ থেকে কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হল না।

বিসর্জন

একরামুদ্দীন—রবীন্দ্র-প্রতিভা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ

সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)

প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ (প্রথম খণ্ড)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবি-রশ্মি (পূর্ব ভাগ)

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)

অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস

সাধনকুমার ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা
মনোরঞ্জন জানা—রবীন্দ্র-নাটকের ভাবধারা
অশোক সেন—রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা
সুশীলকুমার গুপ্ত—রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গ : কাব্যনাটক
আবদুল ওদুদ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
ভবতোষ দত্ত—রবীন্দ্রনাটকের নায়ক

(বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮তে প্রকাশিত)

Edward Thompson—Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist
V. Lesny′—Rabindranath Tagore : his personality and work.

এইসব বই ও প্রবন্ধের মধ্যে মৌলবী একরামদ্দীনের 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়—১৩২১ বঙ্গাব্দে। "রবীন্দ্রনাথের কোনো একখানি মাত্র রচনা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা-গ্রন্থ এই সময় দেখা দেওয়াটা নিশ্চয় বিস্ময়কর। মৌলবী একরামদ্দীন প্রণীত 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' এমনই বিস্ময়কর প্রচেষ্টা।" একরামদ্দীন নিজেই লিখেছেন "এই পুস্তক প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'বিসর্জনে'র সমালোচনা"। তবে এই বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণভাবেও কিছু কিছু কথা বলা হয়েছে বলে লেখক বইয়ের নাম 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' রেখেছেন।

মৌলবী একরামদ্দীন 'বিসর্জন'-এর যে সমালোচনা করেছেন, তার কতকাংশ নীচে উদ্ধৃত করলাম,

"রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' পবিত্র ভাবমূলক নাট্যকাব্য হইলেও ইহাতে কবির ভাব-প্রবণতার পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। একটি প্রধান ভাবকে অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে কবির নিজের ভাবাবেশ ঘটে নাই এবং পাঠকেরও ঘটে না। 'বলিদান অধর্ম্ম'—এই পবিত্র ভাব তাঁহার গ্রন্থের মূলমন্ত্র হইলেও, ইহাতে সহানুভূতিমূলক করুণ ক্রন্দনের সুর নাই। রবীন্দ্রবাবুর সমগ্র কাব্যগ্রন্থেই এই ভাব। তাঁহার বিষয় মনোবিজ্ঞান, পদ্ধতি ন্যায়শাস্ত্রের বিচার অথবা রাসায়নিক পণ্ডিতের বিশ্লেষণ।

... ...

রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জ্জন'এ হিংসাশূন্য নব সত্যধর্ম্মের দেব-শক্তিকে হিংসাপ্রিয় প্রচলিত মিথ্যা ধর্ম্মের পিশাচশক্তির সহিত সংগ্রামে নিয়োজিত করিয়া, সত্য ধর্ম্মের সারত্ব ও মিথ্যা ধর্ম্মের অসারত্ব প্রমাণে ব্রতী হইয়াছেন, কাঁদিতে বা কাঁদাইতে লেখনী ধারণ করেন নাই। আমরা 'বিসর্জ্জন'এ দেব শক্তি ও পিশাচ শক্তির বল সঞ্চয়রূপ উদ্যোগ পর্ব্বে আরম্ভ করিয়া, উভয় শক্তির সংগ্রাম ও অবশেষে পিশাচ শক্তির পরাজয়ে পরিসমাপ্তি দেখিতে পাই।"

এর পরে 'বিসর্জন' সম্বন্ধে বহু সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সমগ্রভাবে আলোচনা করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আলোচনা প্রথমে 'জয়ন্তী-উৎসর্গ'তে প্রকাশিত হয় (১৯৩১) ও পরে তাঁর 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তার মধ্যে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিসর্জন' সম্বন্ধে লিখেছেন,

"নাটকীয় উপাদান ও প্রচেষ্টা ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু তথাপি নাটক হিসাবে ইহা খুব উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নাটকোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর উক্তিগুলি অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ ও বাহুল্য-দুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাটকোচিত সংযম ও অর্থপূর্ণতার অভাব। জয়সিংহের স্বগতোক্তিগুলিতে বিশেষভাবে এই দোষ লক্ষিত হয়। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের শান্ত, অটল তেজস্বিতা ও স্নেহসিক্ত ন্যায়নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন, নাটকে ততটা ফুটিয়া ওঠে নাই। রাজা ও নক্ষত্ররায়ের মধ্যে তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে যে কথোপ-কথন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান ছিল; কিন্তু লেখক সেই উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তারপর নাটকের ঘটনা-বিন্যাস মোটের উপর খুব উপযোগী হয় নাই। কোন কোন দৃশ্য অযথা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, আবার কোথাও বা শূন্যগর্ভ গীতিকাব্যোচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস। অপর্ণা 'প্রকৃতির পরিশোধে'র অনাথা বালিকার আর একটু উন্নততর সংস্করণ; কিন্তু তাহার অবিমিশ্র, একটানা খেদবাণী নাটকের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় নাই। লেখকের ভাষা গীতিকাব্যের দিক দিয়া বেশ কবিত্বপূর্ণ হইলেও নাটকের দমকা হাওয়ায় ও মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল নাটকের

দাবী মিটাইবার পক্ষে যেন যথেষ্ট লঘু ও স্বচ্ছন্দগতি নয়। রবীন্দ্রনাথের যে নাটকের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না, তাহা বুঝিতে গেলে তাঁহার 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সহিত 'বিসর্জন' নাটকটির তুলনা করিলেই চলিবে। উপন্যাসে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত মাধুর্য ও কোমলতা ঢালিয়া দিয়াছেন; নাটকের অপরিচিত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা যেন অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া খণ্ডিত ও প্রতিহত হইয়াছে। রাজার যে অবিচল মূর্তিটি উপন্যাসে জ্বলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নাটকে যেন তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও হীনপ্রভ। উপন্যাসটি তাঁহার ডান হাতের লেখা ও নাটকটি যেন বাঁ হাতের লেখা বলিয়া মনে হয়।"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে 'বিসর্জন' সম্বন্ধে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'তে (১৯৫৯) 'বিসর্জন' সম্বন্ধে পূর্ব-মত পরিবর্তন করে লিখেছেন,

" 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক—ইহা 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ। 'রাজা ও রাণী'তে প্রকৃত নাটকীয় সংঘর্ষের যে অভাব ছিল, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য সক্রিয়তার দিক দিয়া রঘুপতির সমতুল্য নহেন; কিন্তু তিনি যে ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক, তাহা কর্মে ব্যর্থ হইলেও সূক্ষ্মতর নীতিবিধানের মাধ্যমে রঘুপতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। এক অমোঘ ন্যায়বিধির ফলে রঘুপতির নিজের অস্ত্র ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকেই নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধ ও রক্তপাতে উত্তেজনা গোবিন্দমাণিক্যের যতটা পরাভব ঘটাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রঘুপতির ক্ষেত্রে আরও মর্মভেদী পরাজয়ের হেতু হইয়াছে।...জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রঘুপতির শোকোচ্ছ্বাস নাটকীয় তীব্রতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, যদিও বর্ণনারীতি নাট্যধর্মী অপেক্ষা বেশী কাব্যধর্মী।"

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বিসর্জন' সম্বন্ধে লিখেছেন,

" 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য, ইহারা প্রত্যেকেই বিরাট মানব। রঘুপতির মধ্যে রহিয়াছে সংস্কারের অপরিসীম তেজ, আর গোবিন্দমাণিক্যে নবজাগ্রত অনুভূতি আজন্মার্জিত সংস্কারের মতই বেগবান্; এই দুই

বিরাট মানবের সংঘর্ষ এই ট্র্যাজেডির প্রধান উপাদান। বিষয়গৌরবে এই নাটক কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। গোবিন্দমাণিক্য শুধু যে রঘুপতি ও প্রজাদের বিরুদ্ধেই নিজের মত দৃঢ় রাখিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে আরও নিকটতর, প্রিয়তর লোকের বিরুদ্ধে। তাঁহার স্ত্রী নিঃসন্তান। হিন্দুরমণীর স্বাভাবিক সংস্কার তো তাঁহার আছেই, তারপর বলির সাহায্যে রাণী দেবতার বর লাভ করিতে চাহেন, যে বর তাঁহাকে সন্তান দিয়া তাঁহার জীবনের অভিশাপ ঘুচাইয়া দিবে।

... ...

গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির মনের দৃঢ়তা অনমনীয়, তাই ইহাদের সংঘর্ষে একটি মহত্ত্ব আছে, যাহা সামান্য নরনারীর কাহিনীতে পাওয়া কঠিন। তবে একটি বিষয়ে ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়। 'বিসর্জন' নাটকে পরস্পরবিরোধী দুইটি নায়কের মনে কোন দ্বন্দ্ব নাই।...

মানসিক দ্বন্দ্বের কঠিন নিপীড়ন দেখিতে পাই জয়সিংহে। রঘুপতি ও গোবিন্দ-মাণিক্যের সংঘর্ষ যে কত কঠোর তাহার জীবন্ত প্রমাণ জয়সিংহ।...

এই নাটকের আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি অপর্ণা।...অপর্ণার মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে—বিশ্বাসের নিঃসঙ্কোচ তেজ। সে শুধু খেদ করে নাই, নালিশ করিয়াছে, অপর পক্ষকে ঘৃণার দ্বারা নতশির করিতে চেষ্টা করিয়াছে।...সে রহিয়াছে নাটকের দ্বন্দ্বের বাহিরে এবং বাহির হইতে তাহার আহ্বান আসিয়া জয়সিংহকে উদ্বেলিত করিয়াছে।"

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,

"বিসর্জনে নাট্যরস জমিয়াছে অন্ধ সংস্কার, মূঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রান্ত অধিকারবোধের সঙ্গে গভীর হৃদয়বৃত্তি, উদার জ্ঞান ও নিরাসক্ত জীবনবোধের সংঘর্ষে। এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা সবচেয়ে প্রকট নায়ক জয়সিংহের মনে। অন্যথা একপক্ষে রঘুপতি ও গুণবতী অপরপক্ষে গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণা। গোবিন্দমাণিক্যের ও অপর্ণার মনে সংশয় নাই, তাহারা গভীর ইমোশনের মধ্য দিয়া সত্যের আলোক পাইয়াছে। রঘুপতির চরিত্রদৃঢ়তার প্রতিষ্ঠা তাহার নিষ্ঠায়। গুণবতীর চিত্ত বারে বারে দোল খাইয়াছে প্রেম ও সংস্কারের মধ্যে। সে সন্তানবিহীন, স্বামীর উপর কর্তৃত্বহানির আশঙ্কায়

অভিমানিনী। তাহার এই অত্যন্ত স্বাভাবিক দৌর্বল্যের ছিদ্রপথেই কাহিনীটি নাটকীয় পরিণতির দিকে উৎসারিত হইয়াছে।”

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ’ প্রথম খণ্ডে ‘বিসর্জন’ সম্বন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

“বিসর্জন বর্ষাকালের নাটক—কেবল তাহার নাটকীয়তার চূড়ান্ত শ্রাবণের শেষরাত্রে, বর্ষাকালের শেষরাত্রে ঘটিয়াছে ; পরের দিন অর্থাৎ শরতের প্রথমে ইহার অবসান।

বিসর্জনের মতো মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ নাটকে বর্ষার লীলা প্রকাশের অবসর অত্যন্ত অল্প—যেটুকু বা আছে তাহাও যেন কবি তেমনভাবে গ্রহণ করেন নাই। জয়সিংহের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বর্ষার মেঘাড়ম্বরে, অবিশ্রাম বর্ষণে, বিদ্যুৎ চমকে, বজ্রাঘাতে ও গর্জনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ ছিল। জয়সিংহের হৃদয়ের সরলতা ও আবেগ বর্ষার স্নিগ্ধতা ও শ্যামশ্রীর দোসর। বিসর্জন নাটকে কবি এই সুযোগ গ্রহণ না করিলেও রাজর্ষি উপন্যাসে করিয়াছেন :

... ...

শরতের প্রথম দিবসটি নাটকের শেষ দিন। গুণবতী দেবী বলি লইয়া প্রবেশ করিলেন, তিনি দেবীকে পাইলেন না, কিন্তু স্বামীকে নূতন করিয়া লাভ করিলেন, গোবিন্দমাণিক্যও সেই সময়ে পূজার্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঘুপতির জয়সিংহকে আর পাইবার উপায় নাই বটে, তিনি অপর্ণার মধ্যে নূতন করিয়া জয়সিংহকে পাইলেন। যে-শরতের প্রথম প্রত্যূষে রঘুপতির অভিশপ্ত দগ্ধরাজ্য ছাড়িয় যাইবার কথা ছিল সেই রক্তপিপাসু দেবীই এই রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। শরৎকাল দেবীর, যিনি সকলের মাতা, আগমনের সময়, কবি শরতের প্রথম প্রত্যূষটির উপর জোর দিয়া, এই দিনটিকেই নাটকের চূড়ান্ত করিয়া, ইহাই যেন বলিতে চান যে, এতদিন পরে জীবজননীর আগমন হইল, এবং তাঁহার আগমনের পূর্বেই শ্রাবণের শেষ দুর্যোগের মধ্যে জীবরক্তপায়ী যে পাষাণকে লোকে মাতা বলিয়া মনে করিত, সে ত্রস্তভাবে পলায়ন করিল।”

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিসর্জন' সম্বন্ধে লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ বিসর্জ্জন নাটকে দেখাইয়াছেন যে, প্রথা প্রেমকে বিনাশ করিতে চাহিলে, প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অপর্ণা এতটুকু মেয়ে, কিন্তু তাহার শক্তি অপবিমেয়—সে জয়সিংহকে মন্দিব ছাড়িয়া যাইতে ডাকিতেছে, রঘুপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, বাজাকে সত্যদৃষ্টি দিয়া সত্যপথে তাঁহাকে অটল দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। রঘুপতিব ভয় গোবিন্দমাণিক্যকে নহে, রাজার সৈন্যসামন্তকেও নহে, তাহার ভয় ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে। যতক্ষণ প্রথা মিথ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীকে, ভাই ভাইকে, প্রজা রাজাকে, পিতা (রঘুপতি) পুত্রকে (জয়-সিংহকে) পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু একটু ছোট্ট প্রাণের প্রীতি ও করুণার স্পর্শে বাজার যেই সত্যদর্শন ঘটিল, অমনি মিথ্যা প্রথা ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং সকলে সত্যেব অমৃত স্পর্শ লাভ করিয়া বাঁচিয়া গেল।"

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যেব মধ্যে 'বিসর্জন' আখ্যানবস্তুব সুনিপুণ বিন্যাসকৌশলে, ঘটনার দ্রুত প্রবাহে, নাটকীয় চমৎকাবিত্বে, পাত্র-পাত্রীর অন্তরস্থিত ভাব ও বাহিরের কর্মের সম্মিলিত দ্বন্দ্বসংঘাতময়, বেগবান রূপেব প্রকাশে, মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতায়, একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবিয়া আছে। ইহা তাঁহাব বহু-পঠিত ও বহু-প্রশংসিত নাটক। রূপক-সাংকেতিক গণ্ডীব বাহিরে যে সমস্ত নাটক আছে, তাহাদের মধ্যে সকল দিক দিয়াই 'বিসর্জন' শ্রেষ্ঠ।

এই নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি হইতেছে—ধর্মের অর্থহীন, অন্ধ সংস্কার ও চিরাচরিত যুক্তিহীন প্রথাব সঙ্গে নিত্যসত্য মানবধর্ম বা হৃদযধর্মের, মিথ্যা ধর্মবোধের সঙ্গে উদার মনুষ্যত্বের ; মানুষের বচিত আচার-বিধির সঙ্গে হৃদয়েব পরম সত্য প্রেমের ; হিংসার সঙ্গে অহিংসার।"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,

"সমস্ত নাটকটির উপর দিয়া একটা ক্রুদ্ধ বাতাস যেন হুহু করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুপতির জ্বালাময়ী কথাগুলি যেন তাহার এক একটা ঝাপটা,

সে-বাতাসের গতি থাকিয়া থাকিয়া বাড়িয়া চলে, তাহার মুখে জয়সিংহের দ্বিধা সংশয় বারবার উড়িয়া যায়, বারবার অপর্ণা আসিয়া বিদ্যুতের মত তাহার চিত্তকে আলোড়িত করে। শুধু গোবিন্দমাণিক্য ঝড়ের মুখে বিরাট মহীরূহের মত দাঁড়াইয়া থাকেন। কিন্তু গতি সংহত করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? জয়সিংহ যেখানে বুক পাতিয়া দিয়া ঝড়ের বেগ থামাইল সেইখানে নাটকের গতিবেগও সংহত হইল, তাহার পর ধীরে ধীরে শান্তিও নামিয়া আসিল।...দুই বিরোধী সমস্যাই নাটকের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বকে আগাগোড়া জীয়াইয়া রাখিয়া উহাকে স্পন্দিত ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কি মনের, কি বাহিরের, এতখানি দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাট্যেই এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, এই হিসাবে 'বিসর্জন' অতুলনীয়। জয়সিংহের মনের মধ্যে যে সংশয়ের নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, খুব কম নাট্যেই তাহার তুলনা আছে। আর, কি জয়সিংহ কি রঘুপতি, কি গোবিন্দমাণিক্য, কি অপর্ণা, ইহাদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাহা মনের মধ্যেই শুধু লীলায়িত হয় নাই, বাহিরের কথায় ও গতিভঙ্গিমার মধ্যেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিত্তের ও কর্মের দ্বন্দ্বগতির এমন অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাটকেই এতটা সম্ভব হয় নাই।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"নাটক হিসাবে 'বিসর্জন'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রচনা। তাঁহার অন্যান্য নাটকের তুলনায় ইহার মধ্যেই সর্বাধিক নাট্যিক গুণেরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ একটি সমসাময়িক অতি জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক বোধের বাহন ছিল বলিয়া ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অতি সহজেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হয়।...

অতিনাট্যিক ঘটনার সমাবেশে এই বিয়োগান্তক নাট্যকাহিনীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যে সকল নাট্যকাব্য রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এই প্রকার অতিনাট্যিক পরিবেশের অভাব না থাকিলেও 'বিসর্জন'-এ তাহা আরও ঘন এবং নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়।...নিবিড় ঘটনা-প্রবাহের ক্ষিপ্র ও স্বচ্ছন্দ গতি এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দৃশ্যের প

দৃশ্যে ঘটনা-স্রোত এত দ্রুত সঞ্চরণ করিয়াছে যে, ইহার মধ্যে কোথাও কোন গভীর বিচ্ছেদ-রেখা পড়িবার অবকাশ পায় নাই। একমাত্র জয়সিংহ ও গুণবতীর দীর্ঘ স্বগত খেদোক্তিগুলি ইহার কোন কোন স্থানে কাহিনীর প্রবাহ আড়ষ্ট করিয়া দিলেও, সমগ্রভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই ত্রুটি এই নাটকের পক্ষে সামান্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। কাহিনী-পরিকল্পনায় এই নাটকের ত্রুটি সর্বাপেক্ষা অল্প। ইহার মধ্যে অনাবশ্যক চরিত্র, প্রয়োজনাতিরিক্ত দৃশ্যসমাবেশ ও বাগ্‌বাহুল্য প্রায় নাই বলিলেও চলে।"

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,

" 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের অন্যতম। হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধর্মাচার কখনো ধর্মের প্রকৃত অংগ হইতে পারে না ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব।...নাট্যকার তাঁহার তত্ত্ব বিকাশ করিয়া তুলিলেন যেমন একদিকে দুঃখাবহ ট্র্যাজেডির করুণ রসের মধ্য দিয়া, তেমনি আবার ইতর লোকের নির্বোধ বিশ্বাসকে পরিহাসের স্নিগ্ধ আঘাতের দ্বারা।

'বিসর্জন' নাটকের নাটকীয় গুণ এবং মঞ্চ-সাফল্যের কারণ ইহার অসাধারণ আবেগময় বিরুদ্ধ শক্তির প্রবল সংঘর্ষ। নাটকের মধ্যে যেন মুহুর্মুহুঃ দ্রুত-ধাবমান মেঘের পরস্পর-ঘর্ষণে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।...কবি গোবিন্দমাণিক্যকে জয়যুক্ত করিলেও তাঁহার বিপরীত শক্তিকেও হীন এবং খর্ব না করাতে নাটকের চিত্তচাঞ্চল্যকারী আবেগময় ভাব যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"(বিসর্জনের) ট্র্যাজেডির 'আইডিয়া' বা ভাব যত মহিমময়ই হোক, রূপটি তত অনবদ্য হয়ে উঠেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর 'লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি'র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরিষ্টটলের ভাষায় বলা যেতে পারে এখানে জীবনের রূপ যে উপস্থাপিত হয়েছে তারা 'as they are' না হয়ে 'as they ought to be' হয়ে গেছে এবং অধিকমাত্রায়ই তা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পই 'idealized imitation' বটে, কিন্তু 'idealization'-এর মাত্রা বেশী বেড়ে গেলে 'বাস্তবিকতার

মায়া' নষ্ট হয়ে যায় এবং উপস্থাপনা ভাবতান্ত্রিকতার (Idealism) এবং সাংকেতিকতার (Symbolism) সীমারেখায় পৌঁছে যায়। নাটকের পক্ষে "জীবনের মায়া" অপেক্ষিত ব'লেই ভাবতান্ত্রিকতার আধিক্য বা অতিসাংকেতিকতা দোষ বলেই স্বীকার্য। নাটকে পাত্রপাত্রীর পক্ষে ভাবের বাহন হওয়াই যথেষ্ট নয়, শ্রেণী-সত্তার এবং ব্যক্তি-সত্তার দিক দিয়েও তাঁদের স্বাভাবিক তথা বাস্তবিককল্প হয়ে উঠা চাই। বাস্তবিককল্প হ'য়ে ওঠার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি অপরিস্ফুট বা অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। ভাবের বাহন হিসাবে তারা যত সুন্দর, রক্তমাংসের গোটা মানুষ হিসাবে তত অভিব্যক্ত বা সুন্দর নয়। এই কারণে নাটকে যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে তা যতটা ভাবের দ্বন্দ্ব হয়েছে, ততটা বাস্তবকল্প জীবনের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠতে পারেনি—বক্তমাংসের মানুষের দ্বন্দ্ব হ'তে পারেনি।"

শ্রীযুক্ত অশোক সেন লিখেছেন,

"বিসর্জনে ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে যে ঠাসবুনানি দেখা যায় তাহা জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে তুলনীয়। যে চরিত্রের মুখে যেটুকু সংলাপের প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত কিছু বলাইয়া নাটকের গতিকে শ্লথ করা হয় নাই। কাব্যনাট্যে অনেক সময়ই দেখা যায় যে কাব্যস্রোতের প্লাবনে নাটকের নাট্যবস্তু গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। বিসর্জন এই lyrical abandon দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।"

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেন,

"('বিসর্জন'-এর) চরিত্রগুলি ভাবধর্মী হযে উঠলেও এবং লিরিকের আতিশয্যে জীবনের বাস্তবরূপ কতকটা আচ্ছন্ন হলেও এই নাটকে মানসিক দূরত্ব অনেকটা বজায় আছে বলে এটি দর্শকের মনে অভিপ্রেত রসনিষ্পত্তিতে অনেকাংশে সমর্থ। তাঁর কাব্য-নাট্যগুলির মধ্যে নাটকীয়তার গুণে 'বিসর্জন'ই সবচেয়ে সার্থক।"

কাজী আবদুল ওদুদ 'বিসর্জন' নাটকের চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,

"সহজেই মনে হতে পারে কবির অপর্ণা একটি বাস্তব মানুষের চরিত্র ঠিক হয়নি, হয়েছে বরং একটি idea-র, ভাবের, প্রতীক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই ব্যাপারটি

ঘটেনি। কবির সৃষ্ট অপর্ণার অন্তরে প্রেম ও করুণার শক্তি এতখানি প্রাণবন্ত হয়েছে যে তার সেই অনাড়ম্বর কিন্তু অব্যর্থ শক্তির সামনে প্রাচীন সংস্কারের সব বাধা সহজেই ভেঙে পড়েছে। অপর্ণা যে একটি মহৎ চিন্তার প্রতীক মাত্র না হয়ে একটি প্রাণবন্ত সত্য হয়েছে এই জন্যই 'বিসর্জন' কবির একটি মহৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি হতে পেরেছে। গ্যেটের ইফিগেনিয়ার সঙ্গে এর তুলনা চলে। অবশ্য 'বিসর্জনে'র শেষের অংশে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি এই দুইটি বড় চরিত্রেই ভাবালুতা প্রশ্রয় পেয়েছে— জয়সিংহে তো পেয়েছেই। বোঝা যাচ্ছে ভাববিভোরতার কাল কবির কেটে যায় নি। কিন্তু অপর্ণার উপলব্ধির সত্যতা এর সর্বত্র যথেষ্ট প্রাণসম্পদ ছড়িয়ে দিয়ে একে ভাবাতিশয্য থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।"

শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের লেখা 'রবীন্দ্রনাটকের নায়ক' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৮, পৃঃ ৫৫-৬৩) প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বিসর্জন' সম্বন্ধে এই বইয়ে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে দেখাবার চেষ্টা করেছি (পৃঃ ৩৩-৩৬ দ্রষ্টব্য) যে প্রকৃতপক্ষে কোন চরিত্রই 'বিসর্জন'-এর নায়ক বলে গণ্য হতে পারে না। এদের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহ কেন 'বিসর্জন'-এর নায়কপদবাচ্য হতে পারে না, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যুক্তিসহযোগে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি এবং সে সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু রঘুপতিকেও কেন 'বিসর্জন'-এর নায়ক বলা চলবে না, সে সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি, তা যথেষ্ট নয়। শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে রঘুপতিও 'বিসর্জন'-এর নায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

"রঘুপতির চরিত্রে শক্তি শেষপর্যন্ত শ্রদ্ধা জাগায় না, কারণ সে যেসব মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তা তার আদর্শকে কলুষিত করেছে। পাঠকের সম্ভ্রম শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করতে পারে না। রঘুপতি দুর্বৃত্ত-নায়কও নয়। তার দুর্বৃত্ততার মধ্যে নায়কোচিত শক্তির বলিষ্ঠ অনাবৃত দুঃসাহসিকতা নেই যা বরং আমরা তপতীর বিক্রমদেবের মধ্যে দেখি। আবার পুরোপুরি নায়কগৌরবও সে পায় না তার চরিত্রগত হীনতার জন্য।"

ভবতোষবাবুর এই সিদ্ধান্ত আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি।

বাংলাভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও 'বিসর্জন' সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করেছেন। অনেক বিদেশী সমালোচকও এই নাটক সম্বন্ধে লিখেছেন। এইসব সমালোচনার অধিকাংশই 'বিসর্জন'-এর অনুবাদ পড়ে লেখা। যে সব পাশ্চাত্ত্য সমালোচক মূল বই পড়ে এই নাটকের সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ এডওয়ার্ড টমসন ও অধ্যাপক ভি. লেসনির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের ভিতরে টমসনের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

টমসন 'বিসর্জন' সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার কতকাংশ নীচে উদ্ধৃত করছি,

"His early plays reach their highest dramatic point in *Sacrifice* (বিসর্জন).…

Its technique is very faulty. ……The Shakespearean drama has bequeathed some conventions of very doubtful value, which Rabindranath took over. Thus, *Sacrifice* has two under-plots... One underplot is talk of villagers, and is supposed to supply the 'humour' and 'comic relief' that tragedy is held to require. Bucolic chatter can be very dull. The other under-plot introduces a new motive, the Queen's desire to remove Druba, the King's adopted son. This might have been built most powerfully into the plot. But it comes far too late, more than half-way through, is made little of and handled very half-heartedly ; and such a motive, so powerful, if at all genuine—is not suited for a secondary part. But the chief fault of *Sacrifice* is excessive declamation. ...

The characters in *Sacrifice* are irresponsible, waifs swayed by the strong wind of their creator's emotion, puppets in the grip of a fiercely-felt idea. Aparna, the beggar-girl, on whose deeds the whole play turns, does not interest. ...If we are referred to *Pippa Passes*, the answer is that Browning's poem is a string of episodes, and not connected drama. Pippa is hardly an actor, she is a symbol,

kept in a symbol's position. It is not so with Aparna. She is not in the background. Then, the conversions are not worked out psychologically, in the case of either Jaisingh or Raghupati. ...... In *As you Like It*, one reluctantly forgives the usurping Duke's conversion. But then, the play is a comedy ; and its title, *As you Like It.* Raghupati's change—which is a later addition, no part of the first edition—is sudden and unreasonable. The play's finish is sketchy, hastily compressed, as if the poet's invention were flagging and so dropped abruptly to a fore-ordained conclusion. Yet *Sacrifice* has not only value as emotion and poetry, it has stage qualities, and can be made popular."

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বৎসরে 'বিসর্জন' নাটকের দুটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমটি সত্যিই অভিনব—একবার শান্তিনিকেতনের বালকদের অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন'-এর একটি নারী-ভূমিকা-বর্জিত রূপ দাঁড় করিয়েছিলেন—এই সংস্করণটি তারই মুদ্রণ। দ্বিতীয়টি প্রচলিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হলেও তার একটি বিশেষত্ব আছে ; এতে একটি নতুন ও মূল্যবান 'গ্রন্থপরিচয়' সংযোজিত হয়েছে, তার মধ্যে 'বিসর্জন'-এর বিভিন্ন সংস্করণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এই গ্রন্থপরিচয় থেকে কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করছি,

"রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত বিসর্জন ১২৯৭ সালে (২ জ্যৈষ্ঠে ?) প্রথম প্রকাশিত, ইহাতে পাঁচটি অঙ্ক ও প্রথমাদিক্রমে বিভিন্ন অঙ্কে তিন, সাত, চার, সাত ও আট (মোট উনত্রিশ) দৃশ্য দেখা যায়। উহাতে প্রচলিত নাটকে যে-সকল পাত্রপাত্রী দেখা যায় তাহা ছাড়া, বালক 'তাতা' বা 'ধ্রুব'র দিদি হাসি এবং অপর্ণার বৃদ্ধ অন্ধ পিতা এই দুটি বিশেষ চরিত্র অধিক ছিল।

প্রথম প্রচারিত বিসর্জনে বহুবিধ সংস্কার সাধন করিয়া ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে গৃহীত হয় ; ইহাতে পূর্বোক্ত পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে 'অন্ধ বৃদ্ধ'

ও 'হাসি' এই দুইটি চরিত্র বাদ দেওয়া হয়, এবং পাঁচটি অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যাও হয় একুশটি মাত্র। মোটের উপর এই 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণের অনুসরণ করিয়া '১ আষাঢ, ১৩০৬ সাল' অঙ্কিত 'দ্বিতীয় সংস্করণ' পরে প্রচারিত হয়। পূর্বোক্ত সংস্করণ হইতে ইহার বিশেষ পার্থক্য এই যে, কাব্যগ্রন্থাবলী-ধৃত পঞ্চম অঙ্কের চারিটি দৃশ্যকে এ স্থলে দুইটি মাত্র দৃশ্যে সংহত করার প্রয়োজন হইয়াছে এবং এজন্য উহার দ্বিতীয়-তৃতীয়-যোগে ইহার প্রথম দৃশ্যের, তেমনি প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যের যোগে দ্বিতীয় দৃশ্যের রচনা—উপরন্তু এই দ্বিতীয় বা শেষ দৃশ্যের শেষে 'পুষ্প-অর্ঘ লইয়া রাজার প্রবেশ', গুণবতীর পুনঃপ্রবেশ এবং অপর্ণার 'পিতা চলে এস।' বাক্যে নাটকের সমাপ্তি—এটুকু একেবারেই নূতন।

বিশ্বভারতী কর্তৃক বিসর্জন নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে, ইহাতে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের বহুলাংশ নানা-পরিবর্তন-সহ পুনরায় গৃহীত হয় এবং 'তাতা'র দিদি 'হাসি'কেও পুনরায় দেখিতে পাই।...পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, কাব্যগ্রন্থাবলা ও দ্বিতীয় সংস্করণের আধারে, নূতন একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন—উহাই বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে।...বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে এক দিকে পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য-বিভাগে বা সন্নিবেশে কাব্যগ্রন্থাবলীর অনুসরণ করা হইয়াছে আর অন্য দিকে দ্বিতীয় সংস্করণে শেষ দৃশ্যেরও যে শেষটুকু কাব্যগ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত তাহাও যথাস্থানে অর্থাৎ সব শেষে সন্নিবিষ্ট আছে।

... ...

দ্বিতীয় সংস্করণে ঝড়ের মধ্যে... শেষ দৃশ্যের অবতারণা। জয়সিংহের প্রবেশ ও আত্মদান, অপর্ণার মূর্ছা, রঘুপতির প্রতিমার পদতলে 'ফিরে দে' 'ফিরে দে' বলিয়া ব্যর্থ কাতরতা—ইহাতেই এই দৃশ্যের উপর সাময়িক যবনিকাপাত হয় নাই; অল্প পরেই, রঘুপতি উঠিয়া, রোষে ক্ষোভে বলেন—

দেখ, দেখ, কি করে দাঁড়ায়ে আছে জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মত।

এবং তাহার পর প্রতিমা নদীস্রোতে নিক্ষেপ হইতে গুণবতীর প্রবেশ ও প্রস্থান, অপর্ণার 'প্রবেশ' (মূর্ছাপগম? মূর্ছাভঙ্গ বা প্রস্থানের কথা পূর্বে বলা হয় নাই) ও রঘুপতিকে 'পিতা'-সম্বোধন, রাজার প্রবেশ, গুণবতীর পুনঃপ্রবেশ—এ সবই

অবিচ্ছেদে চলিতে থাকে। অপর্ণার মূর্ছা ও রঘুপতির শোক এক দিকে আর অন্য দিকে অপর্ণার মূর্ছাভঙ্গে রঘুপতিকে পিতৃসম্বোধন, উভয়ের মধ্যে প্রাসাদের বিভিন্ন দৃশ্য আনা হয় নাই।"

শারদোৎসব

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ
সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)
প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবি-রশ্মি (পশ্চিম ভাগ)
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা
নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)
আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)
অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস
সাধনকুমার ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা
মনোরঞ্জন জানা—রবীন্দ্র-নাটকের ভাবধারা
অশোক সেন—রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা
সমীরণ চট্টোপাধ্যায়—শারদোৎসব-দর্শন
শান্তিকুমার দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য
Edward Thompson—Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist
V Lesný—Rabindranath Tagore : his personality and work.

'শারদোৎসব'-এর উৎকর্ষ সম্বন্ধে সমালোচকেরা একমত হতে পারেন নি। এই নাটিকাটির ভাগ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল—দু' রকমেরই অভিমত জুটেছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' ও 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা'তে সঙ্কলিত 'রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য' প্রবন্ধে 'শারদোৎসব' সম্বন্ধে লিখেছেন,

" 'শারদোৎসব' বালক-মনের আনন্দোচ্ছল, আত্মবিহ্বল ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়া শরতের দিগন্তবিস্তৃত আনন্দ-রসের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের চেষ্টা। এই মত্ত প্লাবনের নিকট নাটকের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভাগীরথী-তরঙ্গে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। যে দুই একটি ক্ষীণ বিদ্রোহের সুর মাথা তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহারাও এই দুর্বার আনন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। লক্ষেশ্বরের সমস্ত অর্থতৃষ্ণা ও সতর্কতার মর্ম ভেদ করিয়া এই আনন্দ একটা অতৃপ্ত বেদনার কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছে। বালক উপনন্দের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উপর শরতের এক ঝলক সোনালি রৌদ্র পড়িয়া তাহার অন্তস্তল পর্যন্ত আনন্দের রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে। ঠাকুরদাদা,...সম্রাট্ বিজয়াদিত্য সকলেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আহ্বানে শরৎ-প্রকৃতির আনন্দ নির্ঝর হইতে আপন মন ভরিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। চারিদিকে কি পুলকপ্লাবন, কি গানের ফোয়ারা, কি আলো-ঝলমল নীল আকাশ! প্রকৃতির যে অদৃশ্য শক্তি হইতে শেফালির শুভ্র হাসি দিকে দিকে পুঞ্জীভূত হয়, পদ্মের অম্লান শ্রী শ্বেতছত্রের মত বিস্তারিত হয়, নির্ঝর আনন্দ-নৃত্যে ছুটিতে থাকে, সেই গূঢ় প্রাণরসের কিয়দংশ কবির মনে সঞ্চারিত হইয়া এই নাটকে অপূর্ব শোভা-সম্পদে বিকশিত হইয়াছে—নাটকের এক একটি গান যেন তাহার এক একটি পাপড়ি। এই আনন্দ-প্লাবনের আত্মবিস্মৃতিতে নাটক তাহার বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে—শেলির Prometheus Unbound-এর চতুর্থ অঙ্কের ন্যায় ইহা একটি rhapsodyতে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টিরহস্যের একটা দিক কবির নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আনন্দ-কুঠারির চাবিটি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। 'শারদোৎসব' নাটক নহে, কিন্তু বহির্জগতের আনন্দ মনের গূঢ় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অন্তর-জগতে চোয়াইয়া লওয়ার মধ্যে যদি কোন নাটকীয় গুণ থাকে, তবে সে-গুণের ইহা পূর্ণমাত্রায় অধিকারী।

'শারদোৎসব'-এর মধ্যে বিশেষ কোন রূপক নাই। যে হিসাবে মানব-জীবন অনন্ত জীবনের ইঙ্গিত করে, বা প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের রূপের কিঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, সেই হিসাবে 'শারদোৎসব'-এর শরৎ-শ্রীর মধ্যে আনন্দময়ের স্পর্শ

অনুভব করা যায়। শরতের সমস্ত আলো, হাসি, গান যে এক অফুরন্ত আনন্দধারার উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহারই সঙ্কেত মিলে বলিয়া নাটকখানিকে সাঙ্কেতিক বলা যাইতে পারে।"

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' তে 'শারদোৎসব' সম্বন্ধে লিখেছেন,

" 'শারদোৎসব'-এ শরতের দিগন্ত-প্রসারিত, আলোকোজ্জ্বল আনন্দ যেন গানে, সংলাপে, পাত্র-পাত্রীর আত্মহারা হর্ষচাঞ্চল্যে, গীতিকবিতার অপেক্ষা আরও নিবিড়, বস্তু-ও-ভাবময় রূপ পাইয়াছে। এখানে নাটকীয় সংঘাত সূক্ষ্মতম ও স্বল্পতম আয়তনে সঙ্কুচিত হইয়াছে। যেমন শরতের অম্লান আলোক বদ্ধ গুহায় ও তরুলতাহীন গিরিশৃঙ্গে অনুপ্রবেশ করিয়া বিরোধী পদার্থেরও উপর উহার জয়পতাকা উড়ায়, তেমনি এই নিখিলব্যাপ্ত আনন্দ কৃপণ ধনীর অন্ধকার কোষাগারে ও কর্তব্যনিষ্ঠ বালকের পুঁথিপত্র-ঘেরা সাধনকক্ষেও উহার সর্বজয়ী হর্ষহিল্লোল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। লক্ষেশ্বর বা উপনন্দ সত্যই আনন্দ-বিমুখ শক্তির প্রতীক নহে, বরং ইহারা আনন্দরস-শোষণের তৃষ্ণার্ত পাত্র, ইহাদের মধ্যেই আনন্দের চরম শক্তির বিকাশ হইয়াছে। রাজা, ঠাকুরদাদা, বালকগণ—ইহারা মানব নহে, আলোক-রস-মত্ত, বাতাসে গা-ভাসান, বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি। এই বিশুদ্ধ ভাব-রসপুষ্ট, আত্মার দ্যুতিতে জ্যোতির্ময় নাটকটি লঘুতম বস্তু-উপাদানে গঠিত।"

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'শারদোৎসব' সম্বন্ধে লিখেছেন,

" 'শারদোৎসব' নাটকে কোন রূপক নাই, শরতের উজ্জ্বল প্রভাতে প্রকৃতি মানবমনের উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, এই কাব্যে তাহারই বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বালক উপনন্দের প্রভুভক্তি ও লক্ষেশ্বরের কাছে প্রভুর ঋণ শোধের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'শারদোৎসব' নাটকের আর্ট খুবই অপকৃষ্ট। প্রকৃতি যে নিগূঢ় অনির্দেশ্য উপায়ে মানবমনের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করে, তাহার কোন চিত্রই নাই।...

এই নাটকের আর একটি প্রধান দোষ এই যে, প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই অতিশয়

সচেতন।...নাটকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে লক্ষেশ্বর ও রাজা সোমপাল। ...তাহাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে। কিন্তু তথাকথিত শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি অতিশয় অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।"

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,

" *শারদোৎসবে রবীন্দ্রনাথের নাট্যশিল্পে ধারাপরিবর্তন ঘটিল। রাজা-ও-রাণী বিসর্জন* মালিনী প্রভৃতি নাটক-নাটিকায় ছিল মানুষের ব্যক্তিক হৃদয়দ্বন্দ্ব, তাহার জীবনের বিশেষ সমস্যা,—সংস্কারের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির সংঘর্ষ, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে অহংকার-অভিমানের বিরোধ। গোড়ায়-গলদ ও বৈকুণ্ঠের-খাতা প্রভৃতি প্রহসনে পাইয়াছিলাম সংলাপাশ্রয়ী বিশ্রব্ধ কৌতুকরসদীপ্তি। শারদোৎসব হইতে দেখি যে কবিদৃষ্টি মানুষের হৃদয়বৃত্তি ছাড়াইয়া তাহার অনুভাবের সামর্থ্যের উপর পড়িয়াছে। এখানে ভূমিকাগুলি মানুষের অন্নময় শারীরসত্তার ছায়াবহ ততটা নয় যতটা তাহার আনন্দময় রসসত্ত্বের। এইভাবে দেখিলে শারদোৎসবে ও পরবর্তী অধিকাংশ নাট্যরচনায় আধ্যাত্মিক রূপকের ঝলক লাগে।"

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' প্রথম খণ্ডে 'শারদোৎসব' সম্বন্ধে লিখেছেন,

"শারদোৎসব ও তাহার রূপান্তর ঋণশোধ শরৎকালের নাটক। সে শরৎও আবার শরতের প্রারম্ভ, শেষ নয়। শরৎ একসঙ্গে আগমনী ও বিজয়ার কাল, আনন্দের ও বিষাদের। এই দুইখানি নাটকে শরৎপ্রারম্ভের আগমনীর আনন্দের সুর—শরৎশেষের বিজয়ার সুর আছে ডাকঘর নাটকে, যদিচ ইহাও শরৎকালেরই নাটক।

শারদোৎসব-ঋণশোধে কবির প্রধান বক্তব্য এই যে, জগতের কাছে আমরা সর্বদা প্রেমের ঋণ বহন করিতেছি, শরৎকালে সেই ঋণশোধের পালা, শরতের প্রকৃতির মধ্যে কবি ঋণশোধের সেই ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। অন্তরে এই ঋণশোধের ভাবটি জাগ্রত করিতে হইলে আগে বাহিরে শরতের সঙ্গে রঙে ও ভাবে এক হইতে হইবে—তবেই ভিতরে বাহিরে সত্য একাত্মকতা স্থাপিত হইবে।"

'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতায় ও তত্ত্বনাট্যে একটা ছায়াসম গুণ আছে, যেন সবটা ধরা ছোঁয়া যায় না, ধরিয়াছি মনে করিতেই দেখা যায়, হাতের মধ্যে কিছুই নাই।...

শারদোৎসব নাটকে এই 'ছায়াসম' গুণের সূচনামাত্র, ইহার পরিপূর্ণ রূপ পরবর্তী নাটকে আছে। ইহার সম্রাট বিজয়াদিত্য রাজসন্ন্যাসীর শ্রেণীরূপ, সোমপাল ঈর্ষা-জর্জরিত ক্ষুদ্র সামন্তরাজের শ্রেণীরূপ, মানুষের অমায়িক উদারতা যেন দেহের সব গুণ বর্জন করিয়া ঠাকুরদাদারূপে বিচরণ করিতেছে। ঋণশোধের দুঃখ ও আনন্দকে একত্র ঢালাই করিয়া যেন উপনন্দ চরিত্র সৃষ্ট। ঠিক এই ঋণশোধের ভাবটি প্রকাশের জন্য যেটুকু গুণ অত্যাবশ্যক, উপনন্দ চরিত্রে মাত্র তাহাই দেওয়া হইয়াছে, তদতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয় নাই। সাধারণতঃ এভাবে বিধাতাপুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু কবি তো বিধাতার সৃষ্ট জগতের কথা লিখিতেছেন না, তিনি বিধাতার জগতের পাশে, আর একটা নূতন জগৎ গড়িতেছেন, সেই জগতের প্রয়োজন অনুসারে চরিত্রগুলির সৃষ্টি করিয়া সব লোককে বিচার করিতে হইবে।

একমাত্র লক্ষেশ্বর চরিত্রে কিছু বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু চরিত্রটিতে নাটকীয় গুণের অসীম সম্ভাবনা ছিল, কবি ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহার কৃপণ রূপটিকে প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদা-চরিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন,

"শারদোৎসব নাটিকায় এক অপূর্ব সৃষ্টি ঠাকুরদাদার চরিত্র। ইনি যেন রবীন্দ্রনাথেরই মনের রূপক। সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া সত্যের সাধনা করা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-জীবনের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের অন্তর চিরনবীন। এই ঠাকুরদাদা লোকটিও ঠিক তেমনি সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী চিরনবান রসিক। তিনি কখনও বেতসিনী নদীর তীরে তীরে ছেলের দল লইয়া গান গাহিয়া শারদোৎসব করিয়া ফিরেন, কখনো বা অচলায়তনের বাহিরে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শোণপাংশুর দলে ভিড়িয়া যান, কখনো বা রুগ্ন অবরুদ্ধ অমলের শয্যায় পার্শ্বে রাজার ডাকঘরের চিঠির খবর

লইয়া আসেন, আবার তিনিই ভোল ফিরাইয়া গুরু বাউল-সর্দার রূপে ফাল্গুনী বসন্তোৎসবে মাতেন, তিনিই আবার ধনঞ্জয় বৈরাগী নাম লইয়া অত্যাচারের অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ করেন, তিনি রাজদ্বারের নির্ভীক, দরিদ্র মূক প্রজার মুখপাত্র বন্ধু হইয়া অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন নিজে দুঃখ ভোগ করিয়া। তিনি শিশুদের খেলার সাথী, বিপদে সাহস ও সহায়, সদানন্দ সত্যসন্ধ নির্ভীক বলিষ্ঠ সর্বংসহ। তাঁহার চরিত্র শরতের মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায়ই নির্মল স্বচ্ছ সুন্দর। এই ঠাকুরদাদাই রাজার সহিত মিলনে পথে অনুতাপিনী সুদর্শনার সহযাত্রী, এবং ইনিই ছিলেন বৌ ঠাকুরাণীর হাটে এবং প্রায়শ্চিত্তে ও পরিত্রাণ নাটকে রাজা বসন্ত রায়ের অন্তরে এবং বিভা সুরমা ও উদয়াদিত্যের সঙ্গে রস-মধুর স্নেহ-সম্পর্কের মধ্যে। শোণপাংশুদের সঙ্গে আমরাও জানি—'এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর।' "

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'শারদোৎসব' সম্বন্ধে লিখেছেন,

" 'শারদোৎসব'-এর পূর্বে আসিয়া কবির কাব্যসাধনা একটা স্থির, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। মন হইয়াছে পরিণত, রচনা-শৈলী পরিপক্ক। তাই 'শারদোৎসব'-এর মধ্যে যে কবি-মানসের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে পরিণত রবীন্দ্র-কবিমানসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। যে ভাবসত্য তাঁহার কাব্যরচনার মূলে সক্রিয়, যে তত্ত্বোপলব্ধির রূপ তাঁহার বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রকটিত, তাহাদেরি একটা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ইহার মধ্যে।

... ...

ঋতুনাট্য হিসাবে 'শারদোৎসব' চমৎকার সৃষ্টি। শরতের ধরণী-গগনে যে এক অপূর্ব আনন্দরসের প্লাবন, সেই প্লাবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবার জন্য ছেলের দল, ঠাকুরদাদা, সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছে। সংসারের ক্ষতি-লাভ-গণনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সব পিছনে পড়িয়া আছে—ছুটির আনন্দে, মুক্তির তৃপ্তিতে সকলে আজ ভরপুর। গলিত কাঁচা সোনার মতো রৌদ্রে, নীল আকাশে লঘু মেঘের সন্তরণে, শিশির-ভেজা শিউলী ফুলের রাশিতে, নদীতীরের শুভ্র কাশগুচ্ছে, কাঁচা ধানের ক্ষেতে, শরৎ-সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর অপরূপ নয়নভুলানো বিলাস। সমস্ত নাটকখানির মধ্যে একটা খেলার অহেতুকী উল্লাস, ছুটির মুক্ত-আনন্দের ঘন আবহাওয়া।

... ...

রূপক-সাংকেতিক-নাট্যশিল্প এখনও রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, 'শারদোৎসব'-এর মধ্যে কতকটা ঋতুনাট্য এবং রূপক-সাংকেতিক-নাট্যের মিশ্রণ হইয়াছে। লক্ষেশ্বর চরিত্রটিকে বৃহত্তর ভাবজীবনের আবেদনে সাড়াহীন, একটি অর্থপিশাচ, স্বার্থপর, হৃদয়হীন, সাংসারিক লোকের টাইপ-সিম্বল বলিয়া ধরিতে পারি। ইহাও রূপকের সীমানার মধ্যে পড়ে। প্রকৃত সংকেতের আভাস পাওয়া যায় রাজ-সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার চরিত্রে। তাহারা শারদোৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছে, প্রকৃতির অনুরূপ মানবজীবনের মধ্যেও একটা সত্যের লীলা অনুভব করিতেছে। উপনন্দ-চরিত্র ঋণশোধের আনন্দ, দুঃখ ও মুক্তির প্রতীক।"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,

" 'শারদোৎসব' রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঋতু-প্রশস্তির নাটিকা। প্রথম শান্তিনিকেতনে এবং পরে নানাস্থানে এই নাটিকা বারংবার অভিনীত হইয়াছে। ইহার স্বচ্ছ ও সতেজ অনাবিল গতি, নিরলংকার সারল্য এবং রূপকবর্জিত ভাবরহস্যের আবেদন পাঠক অথবা দর্শকের সহজ রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে। কবির পরবর্তী নাটকগুলির সংকেত ও রূপকরহস্য 'শারদোৎসবে' নাই। আছে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যে মানুষ যে উৎসবানন্দ অনুভব করে, উপভোগ করে, তাহার প্রতি কবিমানসের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কবি মনে করেন আনন্দকে সত্যভাবে উপভোগ করা যায় ছুটির মধ্যে, অবসরের মুক্তির মধ্যে ; এই ছুটি ও মুক্তি মানুষ অর্জন করে কর্মের ভিতর দিয়া, দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়া ; দুঃখই বস্তুত মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে, কর্ম এবং কর্তব্যের ঋণশোধেই মানুষের যথার্থ ছুটি ও মুক্তি।

এই দৃষ্টিভঙ্গি কবিজনোচিত এবং রোমান্টিক, সন্দেহ নাই। এবং এই বিশেষ ভাবরহস্যকে কবি রসোত্তীর্ণ করিয়া পাঠক ও দর্শকের অধিগম্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, গান ও ভাষণের এবং ইহার পরিবেশের সাহায্যে। এই ভাবরহস্যকে রসোত্তীর্ণ করিতে সাহায্য করিয়াছে ইহার সহজ নিরলংকার ভাষণ, ইহার সুর ও ইঙ্গিত, এবং উপনন্দ ও ঠাকুরদাদার চরিত্র।

... ...

'শারদোৎসব' উপভোগ্য তাহার তত্ত্ব বা 'আইডিয়া'র জন্য নয়; উপভোগ্য ইহার কবিজনোচিত রোমান্টিক পরিবেশের জন্য, ইহার সরল ও সহজ রূপক-বর্জিত ভাষণের জন্য, সর্বোপরি ইহার গীতিমাধুর্যের জন্য।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"এই নাটকের বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-ভঙ্গি যদিও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাঙ্কেতিক ও রূপকনাট্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ, তাহা হইলেও ইহা মুখ্যতঃ সকল প্রকার রূপক ও সঙ্কেত-বর্জিত নাটক।...

তত্ত্বের কথা বাদ দিয়া কেবল যদি ইহা বহিঃসৌন্দর্যের দিক হইতেও বিচার করা যায়, তাহা হইলেও এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি চোখে পড়ে। ইহাতে বহিঃ-প্রকৃতি নাট্যোক্ত কোন চরিত্রেরই মনের উপর গভীর ভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; ইহাতে উৎসবের তাগিদটি মানবের অন্তর হইতে আসে নাই, সম্পূর্ণ বাহির হইতে আসিয়াছে।...

উৎসবের বর্ণনাও ইহার মধ্যে প্রধান কোন অংশ অধিকার করিয়া নাই; প্রারম্ভেই সুসজ্জিত উৎসব-মণ্ডপে আসিয়া আমরা প্রবেশ করি, কিন্তু তাহার পর মুহূর্তেই আমাদিগকে এই উৎসব-ক্ষেত্র হইতে বহুক্ষণের জন্য সরিয়া দাঁড়াইতে হয়; তারপর এই নাটকের একেবারে শেষ অংশে আবার উৎসবের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয়ের পরই নাটকের যবনিকা-পাত হইয়া যায়। ইহার মধ্যবর্তী অংশে কোন কোন স্থানে কাহারো কাহারো মুখে এই উৎসব সম্পর্কে দুই একবার উল্লেখ থাকিলেও তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠানের কোন পরিচয় নাই।"

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,

"শরৎঋতুর বাহ্য আনন্দোৎসব বর্ণনাই এই নাটিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ইহার মধ্যে গুহাহিত তত্ত্বের সমাবেশও রহিয়াছে, বিশেষত উপনন্দের ঋণশোধের মধ্যে রহস্যঘন সাঙ্কেতিকতার স্পর্শ আছে।... ঋতু-প্রশস্তি নাটিকা অথবা সাঙ্কেতিক নাটিকা কোন রূপেই ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইবে না। প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণে কবি সাড়া দিতে চাহিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতির সহিত একময়তা আমরা এই

নাটিকায় যথার্থরূপে দেখিতে পাইয়াছি কি? শরৎপ্রকৃতির আবেগিত বর্ণনা মাঝে মাঝে আমরা সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি কিন্তু ইহা কোথাও অবিচ্ছেদ্য প্রভাবরূপে কোন চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া যায় নাই। উপনন্দের সহিত প্রকৃতির যোগ তো একেবারেই নাই। অভিজিৎ কিংবা পঞ্চক হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রকৃতির যে দুর্দম আনন্দ-নৃত্য অনুভব করিয়াছে উপনন্দ তাহার কণামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই নাটিকার ঠাকুর্দা চরিত্রের সহিতও প্রকৃতির কোন গভীর আনন্দ-সম্পর্ক নাই। ..

...উপনন্দের ব্যক্তিগত সত্যবোধ একটি সর্বময় জগৎসত্যে রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু নাটিকার এই মর্মবাণী ইহার ঘটনা ও চরিত্রায়ণে মোটেই পরিস্ফুট হয় নাই।”

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন,

“শারদোৎসব নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র প্রকৃতির স্পন্দনের কাছে চিত্তকে মেলে ধরার গণ্ডীর মধ্যেই—ছুটি ও খেলার গণ্ডীর মধ্যেই—সীমাবদ্ধ থাকতে পারেননি। ছুটির ও খেলার যে মাতামাতি নিয়ে সুরু—‘বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকাল বেলা’—যে ভাবের সঙ্কল্প নিয়ে উৎসবের আরম্ভ, সেই মাতামাতির আবেগ বা সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ থাকেনি। ছুটোছুটি করাতেই খেলাতেই ছুটির স্ফূর্তি নয়, ছুটি যে আসলে অন্তরের বস্তু, মুক্তির আনন্দ, কষ্ট করার মাঝেও যে ছুটির আনন্দ আছে—এই কথাগুলোই নাটকে ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

শ্রীযুক্ত অশোক সেন লিখেছেন,

“প্রকৃতির বুকে স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া ওঠা ফুলে ফলে লতায় পাতায় সজ্জিত কাননের ন্যায় এ নাটকটিও গড়িয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির আলো বাতাসের মাঝে। মাঝে মাঝে রহিয়াছে অপূর্ব সংগীতঝঙ্কার।...

ইহা গদ্যে লিখিত কাব্য। পরিবেশের সর্বত্র এই কাব্যভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চরিত্রগুলির মধ্যে রহিয়াছে সন্ন্যাসিবেশী চক্রবর্তী সম্রাট, রাজা, কৃপণ লক্ষেশ্বর, বালক উপনন্দ, জ্ঞানী বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ও বালকের দল। সম্রাট এবং রাজা দুইজনেই বিদ্রোহী—কিন্তু কি বিভিন্ন ধরণের বিদ্রোহ এই উভয়ের। রাজা শক্তির

উপাসক—তাঁহার বিদ্রোহ ন্যায়ের বিরুদ্ধে, জ্ঞানের এবং বুদ্ধির অনুমোদিত পন্থার বিরুদ্ধে। আর সম্রাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন বাস্তব জীবনের বন্ধনাদির বিরুদ্ধে, কুপ্রথার এবং কুসংস্কার ধ্বংসের মানসে। ঠাকুরদাদা জ্ঞানের প্রতীক—ইহা সেই ধরণের জ্ঞান যাহা প্রকৃতির বুক হইতেই আহরণ করা যায়, যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে ইংরাজ কবি Wordsworth মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন এবং এই জ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্যের মাধুরীব দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। উপনন্দ অপরিণত কিন্তু অতিশয় উদার।"

শ্রীযুক্ত সমীরণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

"ফুলের তোড়ায়, নানা জাতির ফুল আছে, পাতা আছে, নানা রঙ, নানা গন্ধ, গন্ধহীন ফুলপাতাও আছে। তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির অমিল আছে, প্রত্যেকটি অন্যগুলি থেকে স্বতন্ত্র। অথচ এই স্বাতন্ত্র্যেরই নিপুণ ব্যবহারে শিল্পী তাদের মিলিত করেছেন অপূর্ব শোভায়। তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার করেই তাদের সংগত করেছেন পরস্পরের সঙ্গে, আর সেই সংগতির জন্যই সৃষ্টি হয়ে উঠেছে তোড়ার নিজস্বতা, তোড়ার নিজস্ব সৌন্দর্য।...মনে হয়, শারদোৎসবে যে কথাটা বারবার মনের সামনে সত্যের মত উদ্‌ভাসিত হচ্ছে সেটা এই জাতীয়। স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেকেরই রক্ষা পাচ্ছে, অথচ কোনো অত্যাশ্চর্য শক্তির প্রভাবে জগৎ জুড়ে একটি মহাসংগতির সাধনা চলছে।...স্বাতন্ত্র্য ঘোচাবার কোনো উদ্দেশ্যই বোধ হয় সেই অদৃশ্য শিল্পীর নেই। সম্ভাবনা আছে কেবল স্বাতন্ত্র্যের বৈচিত্র্যেই সকলকে মিলিত করার।...এইটিই সমাজে বাস্তব জীবনে সম্ভব ও শ্রেয়। শারদোৎসবের মূল কথাটি হয়তো সমাজ-জীবনেরই এই পরিচিত অথচ উপেক্ষিত তত্ত্বটুকু।

... ...

মানুষের জীবনে প্রতি ক্ষণে যে অসংগতির সৃষ্টি হচ্ছে, একে অপরের থেকে এবং পরিমণ্ডল থেকে যে বিচ্ছেদ ব্যবধান সৃষ্টি করছে বা বহুর মধ্যে সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তাব তিনটি বাহ্যরূপ যেন শারদোৎসবে বলে দেওয়া হয়েছে। ধনসঞ্চয়ে, ধনাড়ম্বরে, গ্রন্থাভ্যাসে মানুষ মানুষে এবং মানুষের সঙ্গে পরিমণ্ডলের বিচ্ছেদ-ব্যবধান রচনা হচ্ছে, অপরের থেকে মিলতে মেলাতে পারছে না মানুষ এই আড়ালের জন্যে। এর সঙ্গে

থাকতে পারে শাসন-পীড়নের শক্তি'। এই রাজশক্তি বা সমাজের শক্তি কোথাও হস্তগত হয়ে পড়লে শক্তির ব্যবধান রচিত হয়, সৃষ্টি হয় শাসিত-শাসক, পীড়িত-পীড়ক। তৃতীয় অন্তরায় হল বিদ্যার বদ্ধতা। যে-বিদ্যা নিজেকে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তা-ই হল বদ্ধ বিদ্যা, সন্ন্যাসীর ভাষায় পুঁথির বিদ্যা, পুঁথিব বিদ্যা বা বদ্ধ বিদ্যার অন্তরায় কম নয়, নিরীহ মহত্ত্বের ছদ্মবেশে এর পীড়নশক্তিও অল্প নয়।"

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঋতু উৎসবের নাটক শারদোৎসব।...রবীন্দ্রনাথের যে ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদাদা, দাদাঠাকুরের সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন নাটকে তাহারই সূত্রপাত শারদোৎসব-এ। কিন্তু এই নাটকের ঠাকুরদাদা পূর্ণতা পান নাই। ইঁহারা অসীমের মাধ্যম রূপে অসীম অনন্তকে সহজ স্বাভাবিকভাবে সঙ্কেত করিয়াছেন। কিন্তু শারদোৎসব বা ঋণশোধ নাটকের ঠাকুরদাদা সেই মর্যাদা পান নাই। তিনি অনন্তের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই : অহং বোধকে লুপ্ত করিয়া মনকে উদার করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন মাত্র।...এখানে সন্ন্যাসীই (ছদ্মবেশী চক্রবর্তী সম্রাট বিজয়াদিত্য) পরবর্তী নাটকগুলির ঠাকুরদাদা জাতীয় চরিত্রের কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন : তিনিই অসীম অনন্ত সত্তার সন্ধান জানেন, প্রকৃতি জগৎ ও মনুষ্য জগতের অভিব্যক্তির অর্থ বোঝেন।...

...শারদোৎসব-এ বিজয়াদিত্যের পরীক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না। যেখানে সংশয় সেখানেই জিজ্ঞাসার এবং পরীক্ষার প্রয়োজন। বিজয়াদিত্যের মনে সে-সংশয়ের পরিচয় কোথাও নাই।...

শারদোৎসব নাটকের দ্বন্দ্ব তাহার প্রথম দৃশ্যেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এই দ্বন্দ্ব সংকীর্ণ নীরস জীবনের সঙ্গে উন্মুক্ত প্রাণের আনন্দ বোধের।...

এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ ভারতবর্ষের পুরাতন ধারার সহিত নূতন যুগ চেতনার।"

সবশেষে, 'শারদোৎসব' সম্বন্ধে ডঃ এডওয়ার্ড টমসনের সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি,

"*Autumn-Festival* (শারদোৎসব) is the first of a group of plays

all in prose, with songs interspersed. Its stage is as simple as *Chitrangada's* being just the open air, where wind and sunlight are almost actors, and are certainly the pervading life. ...*Autumn-Festival*, like *Phalguni* later, is almost a mask, in the sense of the word as Milton left it. ...

The mask is as sunny as *As you Like It*. As with that drama, it is hard to point to passages of definite poetry ; the poetry is in the atmosphere, suffuses rather than shines. Its writing must have given the poet singular pleasure."

রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—রবি-দীপিতা
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ
সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা
নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (প্রথম খণ্ড)
জগদীশ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-কাব্য গোধূলি
ক্ষুদিরাম দাস—রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়
বিমলচন্দ্র সিংহ—সমাজ ও সাহিত্য
প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্র-সরণী
শিশিরকুমার ঘোষ—The Later Poems of Tagore
রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য
মনোরঞ্জন জানা—রবীন্দ্রনাথ : কবি ও দার্শনিক
নীলরতন সেন—বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ

এই বইগুলির মধ্যে কতকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে, অন্যগুলিতে কেবলমাত্র তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত শ্রেণীর বইগুলিতেই 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে' সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গতর ও সার্থকতর আলোচনা পাওয়া যায়।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা'তে কাব্যত্রয়ী সম্বন্ধে লিখেছেন,

"এই রচনাসমূহ একটি বিশেষ ও অসাধারণ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কবি কাব্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা—গুরুতর পীড়ার আক্রমণ ও রোগ-মুক্তির কাব্য-কাহিনী অভিব্যক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন কবির রচনায় আমরা ঠিক এই বিষয়টি পাই না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়ত সাময়িক অনিদ্রার প্রভাবে তাঁহার স্বাভাবিক স্থির প্রশান্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কোলরিজের কবিতা আগাগোড়া অসুস্থ মনোবিকার ও আফিং-এর নেশায় অর্ধ-অসাড় ও অবাস্তব রঙে রঞ্জিত কল্পনার চিহ্নাঙ্কিত। শেলির অতি-উত্তেজিত কল্পনা ও অবাস্তব-প্রবণতা অনেকাংশে মানসিক অসুস্থতা হইতে উদ্ভূত। ব্রাউনিং অর্ধ উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ নর-নারীর চিন্তাধারার অসংলগ্নতা ও আচরণ-বিকৃতি নাটকীয় পদ্ধতিতে ফুটাইয়াছেন। ব্রাউনিং-জায়া মরণের বিলম্বিত আবির্ভাবের প্রতীক্ষাচ্ছায়া-তলে তাঁহার অপরূপ হৃদয় মাধুর্যকে প্রেম গাথার রন্ধ্রপথে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগের প্রভাব ঠিক প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না—মানসিক অবসাদ, জীবনচ্ছন্দের অনিয়মিত গতিবেগ, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি লক্ষণগুলি শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মানস-সংস্থিতির অসাধারণত্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের কতকগুলি কবিতার মধ্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দেহ-মনের বিক্ষোভ, উত্তপ্ত, জ্বরাতুর স্পর্শ, বিকারের আবিল দৃষ্টি যেমন ভয়াবহভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার অন্য কোথাও তুলনা মিলে না। অবশ্য কবির শিল্পোৎকর্ষ এই রোগগ্রস্ত অবস্থার উপর জয়ী হইয়া ইহার বিকারের খণ্ডদৃশ্যগুলিকে অনবদ্য কাব্যরূপ দিয়াছে, কিন্তু সমস্ত সচেতন শিল্প-দৃষ্টির ভিতর দিয়া রোগ-যন্ত্রণার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, ব্যাধি-জর্জর কল্পনার ক্ষীণতা

ও বিকারগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এই অভিভূত অবস্থায় কবির দার্শনিকতা,—জীবনের সত্যরূপে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস, চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছনার মধ্যে অপরাজিত মানবাত্মাব জয়গান, মৃত্যুর স্বরূপের প্রশান্ত উপলব্ধি—অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অকৃত্রিম আন্তবিকতা ও সহজ গৌরবের পরিচয় দিয়াছে। একদিকে ব্যাধির অভিভব ও পীড়নের স্বীকার, অন্যদিকে ইহাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার বিজয়-ঘোষণা—এই দুই সুরের সম্মিলন এই কবিতাগুলিকে এক অতুলনীয় গাম্ভীর্য ও মহিমা দিয়াছে। 'আরোগ্য'-এর কবিতাগুলিতে জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সহজ রূপটি সদ্যরোগমুক্ত কবির চক্ষুতে আবার প্রথম অনুভবের বিস্ময়মণ্ডিত হইয়া অপরূপ, নবীন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুভূতির এই উত্তেজিত বিস্ময়, সৌন্দর্যের এই অভিনব আবিষ্কার, কৌতূহলের এই সতেজ, নবীন উন্মেষ ক্ষুদ্র কবিতা-গুলির মধ্যে এক হর্ষোদ্বেলতার শিহরণ রাখিয়া গিয়াছে। কবিতাগুলির ক্ষুদ্র আয়তন, উহাদের আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ততা, রোগাভিভবমুক্ত কল্পনার সীমাবদ্ধ সক্রিয়তার, ইহার পক্ষবিস্তারেব সঙ্কুচিত পবিধির বহিঃনিদর্শন। পূর্ববর্তী পর্যায়ের অতিভাষণ-প্রবণতা এখানে সমস্ত বাহুল্য পরিহাব করিয়া একটি অপরূপ কৃশতা ও স্বচ্ছ দীপ্তি অর্জন করিয়াছে, এক একটি কবিতাতে যেন মন্ত্রের স্বল্পাক্ষরত্ব ও নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তি নিহিত হইয়াছে।

... ...

অস্তাচল-চূড়ায় দাঁড়াইয়া রবি যে শেষ রশ্মি বিকীরণ করিয়াছেন তাহাতে স্বর্গমর্ত্যের সুবর্ণময় সংযোগসেতু রচিত হইয়াছে, তাহা মবণোত্তর রহস্যের মর্মভেদ কবিয়া এপার-ওপারের পরিচয়-সূত্রটিকে অখণ্ড ও বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে। রোগের আবিল আচ্ছন্নতার পিছনে কবির দিব্যদৃষ্টি অসাধারণ স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভেদী শক্তি লাভ করিয়াছে।"

'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'তে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

" 'প্রান্তিক', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে' কবিপ্রতিভার স্বর্ণপ্রদীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে এক নূতন, উর্ধ্বারোহী শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রোগজীর্ণ কবি তাঁহার রোগযন্ত্রণার মধ্য দিয়া জীবনকে এক দুঃখময়, বিকার-আবিল দৃষ্টিতে

দেখিয়াছেন, জীবনের মধ্যে ব্যাধিক্লিষ্ট-চেতনা-কল্পিত ব্যর্থ সৃষ্টি-প্রয়াসের প্রতিরূপ বিকলাঙ্গ বস্তুপিণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, রোগকক্ষের জীবনবেগহীন, একদিকে উদ্বিগ্ন শুশ্রূষা অপর দিকে অলস কল্পনার সমবায়ে রচিত, বদ্ধ আবহাওয়া অনুভব করিয়াছেন ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত অভিভব-উৎপীড়নের উপর আত্মমহিমায় স্থির মানবাত্মার জয় ঘোষণা করিয়াছেন। ব্যাধি-বিকারের এরূপ সূক্ষ্ম ও সত্য কাব্যরূপায়ণ, উহার বিভীষিকা, অসংলগ্ন চিন্তা, অসুস্থ মনের উদ্ভট, দুঃস্বপ্ন-ক্লিষ্ট অনুভূতির এরূপ আবেগময় ও শিল্প-সুমিত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্তির স্বস্তি ও আনন্দোচ্ছ্বাস, জীবনের অতি-পরিচিত বিষয়ের মধ্যেও অপরূপত্বের আবিষ্কার, সদ্যোনিরাময় কল্পনার ক্লান্ত-করুণ, স্বল্প-পরিসরে নিঃশেষিত বিকাশ-প্রেরণা, দুর্বল মননের বাধা সত্ত্বেও কাব্যানুভূতির অল্প কয়েক পা হাঁটিবার প্রয়াস কয়েকটি কবিতায় চমৎকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রোগ ও আরোগ্য উভয় অবস্থারই এরূপ স্পষ্ট ও কৌতূহলোদ্দীপক ছাপ কাব্যসাহিত্যে আর কোথায়ও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এই পর্যায়ের কবিতার বিশিষ্ট গৌরব ইহার জীবনমৃত্যুরহস্যের স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময় অনুভূতি ও প্রকাশে, ইহার অধ্যাত্মবোধের স্থির দীপ্তিতে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আসন্ন বিদায়ের ছায়া দেহ-মনে অনুভব করিয়া মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে এত দৃঢ় প্রত্যয়, এরূপ প্রত্যক্ষবৎ সুস্পষ্ট, সংশয়লেশহীন উপলব্ধি হয়ত আর কোন কবিরই নাই। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-পুষ্ট মন নিজের ক্ষেত্রেও সেই উপনিষদিক তত্ত্ব-প্রতীতিকে প্রয়োগ করিয়াছে ও উহাকে কবিচিত্তের গভীর রসবোধ ও অসীমের সহজ অনুভূতির সহিত সংযুক্ত করিয়া ঋষির ধ্যানদৃষ্টি ও কবির ভাবতন্ময়তাকে এক সঙ্গে মিলাইয়াছে। অধ্যাত্মসত্য কবির ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া এক অপরূপ রসপরিণতি ও অর্থনিগূঢ়তা লাভ করিয়াছে; কবি যেন এখানে উপনিষদের এক নূতন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যসমূহে এক প্রশান্ত, নিরাসক্ত মন লইয়া সমস্ত মোহবন্ধন ও মায়াবিভ্রম ছিন্ন করিয়া, তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ, এমন কি অহংবোধকে বিসর্জন দিয়া অস্তিত্বের পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; সমস্ত পরিচয়-ও বিশিষ্ট-চিহ্নবর্জিত এক চেতনাবিন্দুরূপে জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মহাসঙ্গমতীর্থে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহণীয় ভাবচেতনার সঙ্গে কবি-কল্পনার উদাত্ত গাম্ভীর্য, নিবিড় সংহতি ও বিজয়গৌরব-শাসিত বাক্‌-সংযম মিশিয়া

এই কবিতাগুলিকে কেবল কাব্যকৃতির উর্ধ্বে এক-একটি নিগূঢ় ধ্যানমন্ত্রের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবজীবনের সমগ্র বিচিত্র কর্মজাল ও বহুবিস্তৃত প্রয়াস যেমন মৃত্যুর আকর্ষণে একটিমাত্র পরিণামমুখী প্রবাহে সংহত হয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সমস্ত লীলাবৈচিত্র্য, তাঁহার কল্পনার নানাবর্ণরঞ্জিত উচ্ছ্বাস ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিচিত্রায়িত বিস্তার অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হইয়া পরম-রহস্যাভিমুখী একটিমাত্র অনুভূতি-ধারার অচঞ্চলতায় আসিয়া মিশিয়াছে। বিচিত্ররূপিণীর অনুসরণে দূরাভিযানে বহির্গত, চিরপথিক কবি-আত্মা বৈচিত্র্যের অন্তরশায়ী একের সহিত একাত্ম-মিলনে নিজ চিরচঞ্চল গতিবেগে মহাবিরতির সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। মহাকবির কাব্য-সাধনার ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর ও সার্থকতর পরিসমাপ্তি কল্পনাও করা যায় না।"

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে' সম্বন্ধে লিখেছেন,

"রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কল্পনার বিস্তৃতি। শেষ বয়সে তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিয়াছেন কালের অবিরাম গতি ও আকাশের নিঃসীমতার উপরে। তিনি চল্‌তি ছবির চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু সেই চিত্রের পটভূমিকায় রহিয়াছে নক্ষত্রলোকের বিপুলতা। এই সময়ে তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর সিংহদ্বারে উপনীত হইতেছেন। তাই তাঁহার মনে বিশেষ করিয়া দোলা দিয়াছে জন্মমৃত্যুর পরিক্রমণ ও সৃষ্টির রহস্য এবং এই পরিক্রমণ ও রহস্যকে তিনি দেখিয়াছেন এক বিরাট পরিবেশের মধ্যে। সৃষ্টি ও বিলয়ের প্রশ্ন তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে; কবির জিজ্ঞাসা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে জড়িত হইয়া বিচিত্র অভিব্যক্তি পাইয়াছে।"

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"একেবারে শেষে এই কবিতাগুলির একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহাদের মধ্যে কল্পনার সেই জলস্থলসঞ্চারী লীলা নাই, প্রকাশের সচেতন শিল্পনৈপুণ্য নাই, ভাবের নানা বৈচিত্র্যের সমারোহ নাই,—আভাস-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার মোহসৃষ্টি নাই,—এখানে কবির দৃষ্টি একেবারে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, অনুভূতির প্রকাশ একেবারে প্রত্যক্ষ। ভাষা বাহুল্যবর্জিত, নিরাভরণ রূপ ধারণ করিয়াছে, সেই অলংকারের চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য

আর নাই, পূর্বের অনিয়মিত মুক্ত ছন্দই ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু চরণের দীর্ঘতা ও নানা বৈচিত্র্য কমিয়া গিয়াছে, অন্তমিল অনেকস্থলে অনুপস্থিত। কবির কাব্য তাঁহার চিরদিনের বহুমূল্য রাজবেশ ছাড়িয়া যেন রোগীর (যোগীর ?) নির্মল, পবিত্র, তপোজ্যোতিবিচ্ছুরিত গৈরিক পরিধান করিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই, এ যুগের কাব্য তাহাব অন্তর্নিহিত শক্তি হারায় নাই। কাব্যের শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় মানুষের হৃদয়জয়ে। আমরা এতদিন রবীন্দ্র-কাব্যের ইন্দ্রজালের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ মুগ্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেছিলাম, আজ চিরবিদায়ের গোধূলি-লগ্নে, সে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া কবি তাঁহার কাব্যের এক নূতন মূর্তি আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করিলেন। এই উদাসীন, প্রশান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন, অশ্রু-ছলছল মূর্তি আমাদেব হৃদয়ে নূতন আনন্দ-বেদনার রেখাঙ্কন করিতেছে। এ তো ভাব-কল্পনার লীলা-বিলাস নয়, এ যে দৃষ্ট-সত্যের নিরাভরণ বাণীরূপ , এ তো বিচিত্র ছন্দের মনোহর নৃত্য নয়, এ যে স্বল্পাক্ষর মন্ত্রের উচ্চাবণ ধ্বনি , ইহার আবেদন তো চিত্তবিনোদনে নয়,—নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতিব স্বরূপ-প্রদর্শনে।

এই কবিতাগুলি আর এক দিক দিয়াও আমাদিগকে আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথেব অন্তর্জীবনের একটা পরিচয় পাই। অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ কবি দারুণ রোগ-যন্ত্রণাকে জয় কবিয়া কী গভীব ও অবিচলিত বিশ্বাসে আত্মার জয় ঘোষণা করিয়াছেন , 'দেহ-দুঃখ-হোমানলে' পুড়িয়া তাঁহার অন্তরতম সত্তার অপরাজেয় বীর্যের প্রমাণ দিয়াছেন।"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,

" 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' সর্বত্র...অস্তিত্বের মাধুর্যই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সূক্ষ্মতম ধ্বনিতে ধরা পড়িল। কতবার যে বলিলেন, এই প্রাণ লীলার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়াই আমি ধন্য আমি আনন্দিত ; এবং এই কথা এক এক সময় মিশিয়া গিয়াছে উপনিষদের ঋষি কবির শ্লোকের সঙ্গে। সত্তার আনন্দময় আকৃতি একেবারে যেন দ্রষ্টা ঋষিদের আনন্দস্তর স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু কবির আনন্দ দেখার আনন্দ, তাঁহার বাণীও দেখারই বাণী। এই দেখাই কবির ধ্যান। এবং সেই ধ্যানের দৃষ্টিই সমগ্র সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনদৃশ্যের উপর প্রসারিত হইয়া আছে। এই

ধ্যানের দৃষ্টি শুভ্র স্বচ্ছ; সেই শুভ্র স্বচ্ছ দৃষ্টির তলে জাগিয়া আছে মানব-সংসার, মাটির ঘর আর সেই মাটির মানুষ। সেই ঘর আর সেই মানুষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কবির তৃপ্তির শেষ নাই, বিস্ময়ের অবধি নাই, আনন্দ ও বেদনার সীমা নাই। বিরল অলংকারে, স্বল্পতম ভাষণে দেখার একটি সর্বব্যাপী আকাশ যেন এই চারিটি কাব্যের ভিতরে বাহিরে বিস্তৃত হইয়া আছে। শেষ অধ্যায়ের শেষতম এই কাব্যমণ্ডলটি যেন একেবারেই বাক্য ও চিন্তার অতীত, যেন একেবারেই অবাঙ্‌মানসগোচর, গোচর শুধু দৃষ্টির।"

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"শেষ বয়সের রচনায় দেখা গেল, পৃথিবীর কবি যে-স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া একদিন আসিয়াছিলেন সে-স্বর্গে আর ফিরিয়া যান নাই। এই সুন্দর ধরণীর 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এবং মানুষের 'জীবন্ত হৃদয়'কেই তিনি একান্ত করিয়া ভালোবাসিয়াছেন। বরং, পৃথিবীকে আড়াল করিয়া জীবনদিনান্তে মানবের প্রেমই তাঁহার হৃদয়ের অনেকখানি স্থান দখল করিয়া আছে। মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথই কবি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সব চাইতে বড় পরিচয়।"

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন,

" 'রোগশয্যায়' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত চারিটি কাব্য (অর্থাৎ 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা') এদের প্রকাশভঙ্গির সারল্যে ও সংযমে পাঠকের মনকে প্রথমেই বশীভূত করে ফেলে, আর সেই সঙ্গে বিদায়গ্রহণোৎসুক কবিমানসের স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, এবং সঙ্কোচহীন-আত্মবিচারণায় অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এই ক'টি কাব্যে পূর্বেকার কল্পনার বিশালতা, অজ্ঞাত রহস্যের তীব্র অনুসন্ধানস্পৃহা, অসম্পূর্ণতার প্রবল আক্ষেপ বা নবতর জীবনকে গ্রহণ করার দার্শনিক অভিলাষ কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয় নি এমন নয়, যাত্রার ক্ষুধাও হয়ত কয়েকটি কবিতায় লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ সকল এমন নিরলংকার সহজ রূপে মণ্ডিত হয়েছে যে কবির সঙ্গে পাঠকের মিলন হতে মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। আর, একাধারে কবির ঐকান্তিক মানবানুরাগ, তুচ্ছতম বস্তু বা দীনতম মানুষের প্রতি

অকুণ্ঠিত সহানুভূতি এবং বারংবার পৃথিবী ত্যাগ করার কথা পাঠককে বিদায়ী কবির প্রতি মমত্বে পূর্ণ করে তোলে। বস্তুতঃ একেবারে শেষের এই লেখাগুলিতে আমরা একজন সত্যনিষ্ঠ ও সমবেদনাপূর্ণ স্বভাবকবিকে পেয়েছি।"

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্র-সরণী' বইয়ে এই তিনটি কাব্য সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করলাম,

"প্রান্তিক কাব্য পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে কবিকে অনুসরণ করিয়া পাঠক মৃত্যুর রহস্যময় গহন গভীর গুহাটার মধ্য দিয়া চলিয়াছে, চারিদিক গম্‌গম থমথমে ভাব। রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যে মৃত্যু বেশ 'সহজ সরল'। প্রান্তিক কাব্যে কবি মৃত্যুকে দেখিয়াছেন তাহার অন্ধকার গুহাটার মধ্যে নামিয়া, একান্তে বিচ্ছিন্ন ভাবে; শেষোক্ত কাব্যদ্বয়ে কবি মৃত্যুকে দেখিয়াছেন, জীবনের অঙ্গীভূতরূপে, জগতের আর দশটা বস্তুর দিগন্তের উপরে; শেষের কাব্যে মৃত্যু স্বাভাবিক জীবনের সহচর।"

... ...

"পূরবী কাব্যে যাহা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত, সেঁজুতি কাব্য তথা জন্মদিনে কাব্যে তাহা ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি ডিঙাইয়া একটি বিশ্বজনীনতা লাভ করিয়াছে। শেষ জীবনের জন্মদিনগুলিতে কবি ব্যক্তিগত জীবনের নবায়মানতার মধ্যে নবায়মান সর্বমানবকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র প্রবাহ বিশ্বজনীন জীবনের বৃহৎ প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

... ...

"শেষ জীবনে কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বিরাট মানবপ্রবাহের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া দুয়ের ঐক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছে নিজের জীবনকে বিরাট জীবনপ্রবাহের অংশরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে অমরত্বের স্বাদ যেন পাওয়া সম্ভব। এই জন্যেই শেষ জীবনের কাব্যে নিজের কথা, নিজের সুখ-দুঃখ বিবৃত করিতে বারংবার তিনি বিশ্বজীবনকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য' বইয়ে লিখেছেন,

" 'গহন রজনী মাঝে রোগীর আবিল শয্যাতলে' উত্তরকাব্য-পর্যায়যুক্ত রোগশয্যায়,

আরোগ্য, জন্মদিনে ও শেষ লেখা রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তিম ও অন্তরতম মানবীয় স্বাক্ষর। এখানকার তেজোদৃপ্ত বিরল ভাষণ, 'অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস' সব সত্ত্বেও অশীতিপর কবির তা এক আশ্চর্য কীর্তি। দৈহিক অসুস্থতাকে এই কাব্য-চতুষ্টয়ের একমাত্র হেতু বা উপাদান মনে করা ভুল হবে, কেন না মুমূর্ষ অনুভূতির সঙ্গে মিশেছে নানা নিগম ও তটস্থ অনুভব, ব্যক্তিসত্তার বিলোপের সঙ্গে জারিত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক সংকটের বিবিধ বিভাবন। স্বল্প-ভাষণের বহুবিস্তৃত ব্যঞ্জনা কাব্য ও কবিমানসের ভবিষ্যৎ প্রস্থানের ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ। সাম্প্রতিক সাহিত্যে এই প্রৈতি ও প্রয়াসের অন্তররহস্য অদ্যাবধি একটি অনাবিষ্কৃত মহাদেশ।"

ডঃ মনোরঞ্জন জানা লিখেছেন,

"কবি আপনার জীবনের দুর্লভ মুহূর্ত্তের কথা ইতিপূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছেন। দুর্লভ মুহূর্ত্ত বলিতে তিনি সেই সকল মুহূর্ত্তের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যে সকল মুহূর্ত্তে কোন একটি রূপকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করিয়াছে। এই সকল মুহূর্ত্ত যেন এক একটি রক্ত পদ্মের বীজ, প্রাণ-সূত্রে গাঁথা হইয়া যাইতেছে, জীবন শেষে তাহা একটি মাল্যের আকার ধারণ করিবে। মৃত্যুতে পরমের কণ্ঠে সেই মাল্যখানি তিনি দুলাইয়া দিবেন।

আজ কবি জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। কবির সেই প্রত্যাশা আজ সার্থক হইয়াছে। মৃত্যু আর কিছু নয়, জীবনের যে সব সুন্দর অসীম বা অরূপের আভাস দান করিয়াছে, তাহারই সম্মিলিত প্রকাশ। মৃত্যু কী অপরূপ রূপ লইয়াই না কবির দৃষ্টি সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে।"

ডঃ নীলরতন সেন লিখেছেন,

"শেষ পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতাতেই কবির আত্মকথাই লেখা হয়েছে।—আর সে বক্তব্যটিও একান্ত ব্যক্তিগত বার্ধক্যজনিত মৃত্যু-পদধ্বনি মুখরিত। তার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে এ যুগের কবিতার রসোপলব্ধিতে বাধা ঘটবারই কথা ছিল। অথচ কোথাও তেমনটি ঘটেনি। ব্যক্তিক মৃত্যুচিন্তাকেও কবি দর্শনের এক সার্বজনীন

সত্য-জিজ্ঞাসার স্তরে তুলে এনেছেন। ব্যক্তিক অনুভূতি শাশ্বত কাব্য-সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর এযুগের কবিতাগুচ্ছের ভেতর দিয়ে সার্বজনীন এক সত্যের রসমূর্তিতে নবজীবন লাভ করেছেন।—এমন রূপান্তর একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল।"

কালান্তর

রথীন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্য-বিচিত্রা

অরবিন্দ পোদ্দার—রবীন্দ্র-মানস

Sachin Sen—The Political thought of Tagore.

'কালান্তর' গ্রন্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে সব মত ব্যক্ত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে আলোচনা এই তিনটি বইতেই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'সাহিত্য-বিচিত্রা'র অন্তর্গত 'কালান্তরের কবি' নামক প্রবন্ধে 'কালান্তর' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা'ই এ সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা। এই প্রবন্ধটি থেকে কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করছি,

" 'কালান্তর' গ্রন্থটিকে রাজনৈতিক প্রবন্ধের সঙ্কলন বলা হলেও যেন সবটুকু বলা হয় না। "কালান্তর" গ্রন্থের মূল ভূমিকা দুটি। কবি ও তাঁর দেশকাল—রাজনীতি তার একটি প্রধান দিকমাত্র। মানবেতিহাসের এক মহা সন্ধিলগ্নে বসে কবি সুদূর অতীত, সংঘর্ষ-সচেতন বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎকে এক প্রসারিত চেতনার সূত্রে গেঁথে তুলেছেন। প্রায় এক শতাব্দীর রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতির নানা বিচিত্রমুখী রূপান্তর-লীলার মহাদর্শক কবি স্বয়ং। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের যে মহৎ রূপটি শিক্ষিত বাঙালীর মানস-জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার মর্ম-মূলে ছিল ইংরেজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন চিন্তা ও সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা। ...... উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই মোহভঙ্গের ইতিহাসও সুরু হল। উনিশ শতকের এই আপাত বিরোধ ভাবদ্বন্দ্বের জটিল আবর্ত কবির শৈশব ও বাল্যকালের যুগলক্ষণ।

ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিরূপতার একবৃন্তাশ্রয়ী অর্ধ-নারীশ্বর স্বরূপটিকে কবি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

... ...

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী কাল থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি গভীর পরিবর্তন ঘটে। স্বাজাত্যাভিমানের উগ্রতার আড়ালে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিনাশের যে-ইঙ্গিত তিনি পেয়েছিলেন তাতেই তাঁর চিন্তাজগতে নূতন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইউরেশিয়ার মুক্ত আকাশে যে কবি-বিহঙ্গের প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী পক্ষ বিস্তার, তার প্রকৃত জন্ম এইখানেই। স্বাজাত্যের অহমিকার আত্মরুদ্ধ অন্তঃপ্রকৃতির মুক্তি ঘটল—মানবতন্ত্রী কবি কালান্তরের প্রেক্ষাপটে মানবেতিহাসের আর এক নূতন রূপ দেখলেন। উত্তর-রবীন্দ্রের প্রসারিত চেতনার অসাধারণ উত্তরণ 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলিতে ধরা পড়েছে।"

জাভা-যাত্রীর পত্র

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—দ্বীপময় ভারত

'জাভা-যাত্রীর পত্র' সম্বন্ধে আমাদের আগে আর কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথের জাভা-ভ্রমণ সম্বন্ধে এবং তাঁর চিঠিগুলিতে বর্ণিত বিষয় গুলি সম্বন্ধে পূর্ণতর তথ্য সুনীতিবাবুর বইখানিতে পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপের যে সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সব জায়গাতেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু হিন্দুধর্ম একমাত্র বালী দ্বীপেই এখনও বর্তমান আছে, যদিও তার মধ্যে স্থানীয় প্রভাব পড়ার ফলে ভারতবর্ষের বর্তমান হিন্দুধর্মের তুলনায় তা খানিকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র কালিদাস এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর প্রভাব

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য ('জয়ন্তী-উৎসর্গ'তে প্রকাশিত)
শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ত্রয়ী
মেঘদূত ও রবীন্দ্রনাথ ('বাণীবিতান', রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত)
বিমলকান্তি সমদ্দার—রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব
প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
প্রবোধচন্দ্র সেন—ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ
আদিত্য ওহদেদার—সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের আগে আর কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমরা জানি না। 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ'—এই প্রসঙ্গের একটি বিশেষ দিক নিয়ে আমরা এই প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করেছি। উপরে যে সমস্ত বই ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হল, তাদের মধ্যে প্রসঙ্গটির অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের আলোচনার সঙ্গে এই আলোচনাগুলি মিলিয়ে পড়লে পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের কালিদাসচর্চা ও তাঁর উপরে কালিদাসের প্রভাবের বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো

নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন (চতুর্থ ভাগ)
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—বাংলা ছোট গল্প

'রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো'—এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আগে আর কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমরা জানি না। কিন্তু এই দুই সাহিত্যস্রষ্টার সাধর্ম্যের

প্রতি আমাদের আগেও যে কারো কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, উপরে উল্লিখিত বই দুটি থেকে তারই প্রমাণ মেলে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একদল শিক্ষিত বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে 'বাংলার এডগার পো' বলতেন। এই কথা জানা যায় নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' (চতুর্থ ভাগ—রচনাকাল '৮৯৬ থেকে ১৯০৫ খ্রীঃর মধ্যে) থেকে। ঐ বইতে নবীনচন্দ্র লিখেছেন, "রবিবাবু বাঙ্গালার 'শেলি', 'কিট্‌স ', 'এডগাব পো' কত কিছু বলিয়া পরিচিত।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ প্রকাশিত নবীনচন্দ্র-বচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৯) পো-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্যের দিকে তখনকার দিনেব অনেক লোকের দৃষ্টি যে আকৃষ্ট হয়েছিল, তা এর থেকে বোঝা যায়।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা ছোট গল্প' বইয়ে (পৃঃ ৬৫) রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি সম্বন্ধে লিখেছেন,

"এই দীর্ঘ গল্পটিতে ঘটনাবাহুল্য নাই, তথাপি ইহাতে পাঠকেব আগ্রহ ও কৌতূহল বরাবর বজায় রাখা হইয়াছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'মিষ্টিক' উপাদানে পরিপূর্ণ এবং ইহাই গল্পটিতে প্রাণবেগ সঞ্চার করিয়াছে। এই কারণটির জন্যই 'ক্ষুধিত পাষাণ' Edgar Allen Poe র 'Under the Ragged Mountains' এর সহিত তুলনীয়।"

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর সঙ্গে পো-র Under the Ragged Mountains-এর সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকষণ করে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে'র সঙ্গে পো-র Legeia-র ও অংশত The Tell-Tale Heart-এর সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমরা এই বইয়েব মধ্যে (পৃঃ ৭৫-৮৫) আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রাকৃত-উপাদান-মূলক গল্পগুলির জন্যে এডগার অ্যালান পো-র কাছে অনেকখানি ঋণী, একথা এখন প্রায় নিঃসংশয়েই বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ এডগার অ্যালান পো-র রচনার সঙ্গে যাঁর পরিচয় কারিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ইন্দিরা দেবী পরিণত বয়সে এডগার অ্যালান পো সম্বন্ধে বলেছিলেন,

"তাঁর গন্তপস্তের বিশেষত্ব এখনো মনে লেগে রয়েছে। তাঁর গল্পের মধ্যে

কি-একটা রহস্যময়তা ছিল ! বিশেষত তাঁর The Raven নামের অপূর্ব কবিতাটি ছন্দ মিল ও ভাবের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও স্মৃতির দুয়ারে মাঝে মাঝে আঘাত করে—" (রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃঃ ৪৬)।" এর পরে ইন্দিরা দেবী The Raven-এর থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে কবিতাটির ভাব, ছন্দ, সুর ও মিলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

The Raven কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের মনেও স্থায়ী আসন লাভ করেছিল, তার প্রমাণ আছে। প্রবীণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক জে. ডি. এন্ডারসনকে বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত হয়েছে। এন্ডারসনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ The Raven কবিতা থেকে "Ah distinctly I remember it was in the bleak December" চরণটি উদ্ধৃত করে তার থেকে ইংরেজী ছন্দের স্বকীয় বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং চরণটিকে নানাভাবে বাংলায় অনুবাদ করে ও তার অনুরূপ ছন্দে বাংলা শ্লোক রচনা করে ইংরেজী ছন্দ ও বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"একটি ইংরাজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

Ah distinctly | I remember
It was in the | bleak December

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক।

১	২	৩	৪
Ah	dis	tinct	ly
I	re	mem	ber

ইহার এক-একটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা, কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের এক্‌সেণ্টের সড়কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধু বাংলায় হইবে—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতরো নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না, কারণ তাঁহাদের শব্দগুলি কোণওয়ালা।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ঐ শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দারুণ অঘ্রান মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরেজির চেয়ে বেশি। কিন্তু...সেটা কেবল সাধু ভাষায়, বাংলার চলতি ভাষায় ঠিক ইহার উলটা। চলতি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না, ইংরেজি শব্দেরই মতো চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

...বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাতধ্বনি, এইজন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চলতি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা-প্রাকৃতের একটা চৌপদী নিচে লিখিলাম।—

কই পালঙ্ক, কই রে কম্বল,
কপ্ নি টুক্‌রো রইল সম্বল,
এক্‌লা পাগ্‌লা ফির্‌বে জঙ্গল,
মিট্‌বে সংকট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ধ্বনির বিশেষ কোন তফাত নাই।" ('ছন্দ,' রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড পৃঃ ৪০৫-৪০৬ দ্রষ্টব্য)।

এর থেকে বোঝা যায়, এডগার অ্যালান পো-র প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে বরাবরই ছিল।

লিপিকা

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ
শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাঙলা সাহিত্যের একদিক
নীলরতন সেন—বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ
ধীরানন্দ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা
আবদুল আজীজ আল-আমান—সাহিত্য-সঙ্গ

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'লিপিকা' সম্বন্ধে লিখেছেন,

" 'লিপিকা' কতকগুলি গদ্যকাব্যের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে ছোট আখ্যায়িকা লুক্কায়িত থাকিলেও কাব্যপ্রাণতাই ইহাদের প্রধান লক্ষণ।.........

'লিপিকা'য় কবি যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ইংরেজি গীতাঞ্জলি হইতে বিভিন্ন। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে যে সমস্ত কবিতা আছে তাহার জন্য কবির কল্পনা অতি ঐশ্বর্য্যবান্ কাব্যজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে যাহা সর্ব্বতোভাবে গদ্যময় দৈনন্দিন জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু 'লিপিকা'য় যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনি দৈনন্দিন জগৎ ও কল্পলোকের মধ্যে সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কাব্যের জন্য গদ্য বিশেষ ভাবে উপযোগী, কারণ অনুভূতির মূলদেশে যে গদ্য রহিয়াছে এই সকল কবিতায় তাহাকে পরিহার করা যায় নাই। যে সকল রচনাখণ্ডে কবি একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের ক্ষুদ্রত্ব বজায় রাখিয়া সহজভাবে তাহার বৃহত্তর প্রসারের আভাস দিতে পারিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এক অভিনব কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে।"

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন,

" 'লিপিকা'র কতকগুলি লেখা গদ্য-রচনার সীমা অনেকখানি অতিক্রম করিয়া স্পষ্ট কবিতা হইয়া উঠিয়াছে, এগুলি সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। এগুলির ভিতরে একটু সূক্ষ্ম হইলেও কবিতার ন্যায় স্পষ্ট ছন্দ রহিয়াছে, কবিতার ঢঙে না সাজাইয়া ওগুলিকে যে গদ্যের ঢঙে সাজান হইয়াছে তাহা একান্তই বাহ্য।......

আকৃতির কথা বাদ দিয়া প্রকৃতির কথা বিচার করিলেও 'লিপিকা'র অনেকগুলি

লেখার ভিতরেই বেশ একটা জটিলতা দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে ভাবস্থ অতি সহজ মনেব স্পন্দন আছে,—কোথাও কোথাও একটা গল্পের আমেজ আছে—কোথাও প্রচ্ছন্ন হইলেও একটা বিশেষ বক্তব্য রহিয়াছে, সে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে রহিয়াছে সাহিত্যিক কৌশল। লেখাগুলি যে কোথায় গদ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় গল্প হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় রচনা হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্ট বিশ্লেষণ করিয়া দেখান শক্ত।

চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেব যাহা বৈশিষ্ট্য লিপিকার এই লেখাগুলির মধ্যেও দেখি সেই বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রচলিত চিত্রাঙ্কনের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই, বেখা বা রঙের ভিতব দিয়া যে রূপটি শিল্পী ফুটাইয়া তুলিতে চান সে বিষয়ে তাঁহার একটা দৃঢ় সংস্কার থাকে। রূপসৃষ্টি কবিতে হইলেই আমরা মনকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি কবিবার সুযোগ দিতে পারি না, রূপের সংস্কারে মনকে বাধিয়া ফেলি। এই রূপ বা আকৃতির সংস্কার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। এই সংস্কাববদ্ধ রূপেব বাহিরেও যে চিত্রশিল্পের কত অফুরন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে ববীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের ভিতরে দেখিতে পাই তাহারই আভাস। 'লিপিকা'র লেখাগুলির ভিতবেও দেখিতে পাই রূপ-সংস্কার হইতে বিমুক্ত—নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা। ঠিক প্রবন্ধও নয়, ঠিক লিরিক কবিতাও নয়, ঠিক ছোট গল্পও নয়—অথচ তাহাদের মিশ্রণে একটা স্বাধীন রূপ।"

ডঃ নীলরতন সেন লিখেছেন,

"লিরিক কাব্যধর্মী রচনায় কবির......একটি দিক ফুটে উঠেছে। 'লিপিকা'র রচনাগুলি এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। কখনও গল্পের রূপকে, কখনও সহজ বর্ণনায় কবি তাঁর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন, ভাষা স্বচ্ছ সহজ, ভাব তির্যকভঙ্গীর গূঢ় হৃদয়ানুভূতির রঙে বঙীন। লিবিক কবিতার আমেজ পেলেও এগুলি পুরোপুরি কবিতা হয়ে ওঠেনি, যেন কবি তাঁর অন্তবঙ্গ শ্রোতাদেব মাঝে বসে, আপন কাব্যিক উপলব্ধির বর্ণনা দিচ্ছেন, সে বর্ণনার ভাষায় ছন্দের ছোঁয়া লেগেছে, বস্তুচেতনার ওপরকার এক কাব্য-তন্ময় চেতনা-লোক থেকে কবি যেন কথা বলছেন।—ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সহৃদয় গোষ্ঠী ছাড়া যেন তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে না। 'পায়ে চলার পথ', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'মেঘদূত' প্রভৃতি এ শ্রেণীর রচনা-নিদর্শন।"

শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ ঠাকুর লিখেছেন,

" 'লিপিকা'র কোন-কোন রচনায় গদ্য কবিতার আঁচ থাকলেও তাকে ঠিক গদ্য-কবিতার গ্রন্থ বলতে পারিনে। কোন-কোন রচনার কোন-কোন বাক্যে হয়তো-বা কিছু ছন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে, কিন্তু তা লেগেছে বাক্যের বা বাক্যাংশের বিরতি বা ছেদের ঘনিষ্ঠ প্রয়োগের ফলে।......

কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে এই গ্রন্থের রচনাসমূহে গদ্যকবিতার স্ফুটতর রূপ না থাকলেও তার পূর্বাভাস আছে। এতে এক-একটা রচনায় গদ্যকবিতার ছন্দ এবং পদক্রমের নতুনতা একটানা না থাকলেও আছে দূরবিন্যস্ত হয়ে।......

'লিপিকা'-গ্রন্থের...তিনটি অংশের রচনাগুলির মধ্যে ছন্দের আধিক্য ও অল্পতা নিয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে স-ছন্দ গদ্যের নিদর্শন সবচেয়ে বেশি। তার পরে আছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় অংশে সবচেয়ে কম। আয়তনে সবচেয়ে বড়ো তিনের অংশটি, সবচেয়ে ছোটো প্রথমটি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আয়তনে প্রায় সমান-সমান। তৃতীয়টি এ-দুটির প্রায় তিনগুণ।"

জনাব আবদুল আজীজ আল-আমান লিখেছেন,

"ভাব এবং আঙ্গিকের বিবিধ বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ দেখি লিপিকা গ্রন্থে। রূপ এবং অরূপ এখানে এক হ'য়ে মিশেছে। গদ্য এবং কবিতা যেন একই মহা সঙ্গম-তীর্থের যাত্রী। সবার মিলনে বেজে উঠেছে এক নিবিড় ঐকতান। কখন নিপুণতায় কাহিনী প্রবেশ করেছে কাব্যের রূপলোকে, আর কাব্য-নন্দিনী কলা-বিলাসীর মত উছল ভংগীতে নেচে নেচে চলে গেছে কাহিনীর অন্দর মহলে। গল্প ছুটেছে রূপকথার সীমাহীন দিগন্তে আর রূপকথা আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নেমে এসেছে মর্তের রসলোকে। এমনি করে সবার থেকে দেনাপাওনার সম্বন্ধ ঘুচে গিয়ে স্থাপিত হয়েছে এক প্রীতির সম্পর্ক। ভাব ও আঙ্গিকের বহু বিচিত্র রূপের মাঝে দূরাগত ব্যবধান কী অদ্ভুত ভাবেই না মিলিয়ে গেছে! লিপিকা গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এখানেই।"

পঞ্চভূত

শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাঙলা সাহিত্যের একদিক
কালিদাস রায়—রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত" ('জয়ন্তী-উৎসর্গ'তে প্রকাশিত)
আবদুল ওদুদ—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
রথীন্দ্রনাথ রায়—রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' (প্রবন্ধ পত্রিকা, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮)
মৈত্রেয়ী দেবী—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে লিখেছেন,

" 'পঞ্চভূত' একটি অভিনব কলাকৌশলে প্রকাশিত রচনা। প্রতিভা নিত্য নূতন প্রকাশভঙ্গি গড়িয়া লইতে চায়, তাহার ভিতরে রহিয়াছে যে নব নব উন্মেষণী শক্তি। 'পঞ্চভূতে'র যাহা আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাহার সব না হইলেও অনেক কথা প্রবন্ধাকারে বা অন্যরূপে অন্যত্র বলিয়াছেন, কিন্তু ..কবি বলিয়াছেন, সাহিত্যের বিষয়টাই সব চেয়ে বড় নয়, ভঙ্গিটাই নিত্যনূতন রহস্যের স্রষ্টা। তাই 'বহু পুরাতন কথা'ও নূতন ভঙ্গিতে 'নব আবিষ্কারে'র ভিতর দিয়া নূতন সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে।

... ...

পাঁচটি কল্পিত চরিত্রকে লেখক যথাসম্ভব ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র এবং আচার-ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায় জীবন্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গল্প-উপন্যাসের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের বিশদ বর্ণনায়—সমস্ত খুঁটিনাটিতে রচনার প্রবন্ধ-গন্ধ ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক এই কৌশলে যে সর্বত্রই সফলতা লাভ করিয়াছেন একথা বলা যায় না,—নেপথ্যের যবনিকা অনেকস্থানে পাতলা হইয়া গিয়াছে, অনেকস্থানে খসিয়া পড়িয়াছে। রস-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া পঞ্চভূতের যেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই সেখানে তাহাদের আগমন কৃত্রিম এবং অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে হইয়াছে। এই সব স্থলে মনে হইয়াছে, পঞ্চভূতের এই পাতলা যবনিকার অন্তরাল হইতে কথা না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ অকৃত্রিমভাবে আত্ম-প্রকাশ করিলে বোধ হয় আরও ভাল হইত। কতগুলি লেখা এইরূপ পঞ্চভূতের দুর্বল কোলাহল বর্জিত;

যেমন 'পল্লিগ্রামে', 'মন' প্রভৃতি, এখানে লেখাগুলি আত্মনিষ্ঠ সরস রচনারূপে জমিয়াছে ভাল।"

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে লিখেছেন,

"যে-সকল ধারণা ও চিন্তা মনে বেশ স্পষ্ট রূপ ধরে নাই অথবা জটিল, সংশয়াচ্ছন্ন ও গ্রন্থিল হইয়া আছে, তাহাদের মূল্য মর্য্যাদা নির্ণীত হইতে পারে বিশ্লেষণে। পাঁচটি চরিত্রের বাদানুবাদে এ-বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে। অভ্রান্তভাবে কোন চিন্তার মূল্য-মর্য্যাদা নির্ণীত হউক বা না-হউক তাহাতে আসে যায় না—কারণ বিশ্লেষণের আনন্দটাই হয় পরম লাভ।

এ প্রথায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা নৈয়ায়িকের যে দায়িত্ব সে-দায়িত্ব আদৌ নাই—একটা অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার প্রয়োজনই নাই। সত্যানুসন্ধানের ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিলেই ঐ বিশ্লেষণই সাহিত্য-রূপ ধরিবে। পাঁচটি বিভিন্ন প্রকৃতির 'আত্মজের' দ্বারা কবির এই বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে।

তাহা ছাড়া, সত্যের আবিষ্কার বা তত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসাটাই খুব বড় কথা নহে—সত্যের আনন্দ লাভটাই পরম লাভ। এই আনন্দলাভ করিতে গিয়া যে মানসিক ব্যায়াম হয় তাহাতে মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও বুদ্ধির স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া যায়—মন সতেজ হইয়া উঠে। পঞ্চভূতের আলোচনার মত বাদানুবাদ সেই সত্যের আনন্দ ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য।"

কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন,

"পঞ্চভূতের এক একটি 'ভূত' এক একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। আর সেইসব দৃষ্টিভঙ্গি কবির বন্ধু ও পরিচিতদের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, অশেষ বৈচিত্র্যে যার সুগভীর আনন্দ সেই কবিরও সে-সবের প্রতি সহানুভূতি কম নয়।

... ...

সাহিত্যিক রচনার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তা হৃদয়গ্রাহী হয়—গদ্যসাহিত্যে একই সঙ্গে থাকা চাই হৃদয়গ্রাহিতা আর বিচারের শক্তি। হৃদয়গ্রাহিতার সঙ্গে

বিচারের ক্ষমতার যত সুষ্ঠু যোগ ঘটে ততই গদ্যসাহিত্যের মর্যাদা বাড়ে। পঞ্চভূতে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহিতা আর অসাধারণ বিচারের শক্তি।

এই কালে Amiel's Journal কবি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়েন। Amiel গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, সেই সঙ্গে প্রকাশসামর্থ্যও তাঁর অনন্যসাধারণ। হতে পারে চিন্তার ব্যাপকতা ও পরিচ্ছন্নতা-লাভের ক্ষেত্রে Amiel থেকে কবি বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন। তবে, মোটের উপরে Amiel দার্শনিক ও মরমী আর রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণচেতনাসম্পন্ন মানবদরদী সাহিত্যকার—চিত্তের সচেতনতার সঙ্গে প্রকাশেব লালিত্য তাঁব রচনার, বিশেষ করে এই রচনাটির ভূষণ।"

'পঞ্চভূত'-এর 'পরিচয়' নামক রচনাটিতে পঞ্চভূত-সভার সদস্যেরা ডায়ারি লেখার দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এঁদের ভিতরে ভূতনাথবাবু ও স্রোতস্বিনীর উক্তির মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভূতনাথবাবু এবং স্রোতস্বিনীর মত রবীন্দ্রনাথও ডায়ারি লেখা পছন্দ করতেন না। এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি পঠনীয়। তার এক জায়গায় (পরিবর্ধিত সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ১৫৭-১৫৮) মৈত্রেয়ী দেবী ও রবীন্দ্রনাথেব এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে।

"আপনি কখনো ডায়েবি লিখেছেন ?"

"কখনও নয়—ও আমার সাহসই হয় না—তা ছাড়া যা ভেসে চলে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। দিনগুলো কি ধরে রাখা যায় ?"

"কিন্তু অনেক পরে এই দিনগুলো যখন জীবনের আবছায়া স্মৃতি মাত্র হবে, তখন তো আবার ফিরে আসা যায় সেই experience-এর মধ্যে।"

"দেখ, আমি কখনো তা চেষ্টা করিনে, আমি চিরদিন ভেসে চলেছি। যে পথে এসেছি আবার তারি পুনরাবর্তন করতে ইচ্ছা হয় না আর তা ছাড়া ভালবাসার একটা প্রাইভেসি আছে, তা সকলের সামনে চেঁচিয়ে বলবার নয়। ডায়েরি লিখতে গেলেই এমন অনেক কিছু লিখতে হয় যা সকলেব জন্য নয়, যা একমাত্র আমারই কথা। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি লিখছ, সে তোমার হাতের বাইরে চলে গেল। কি ক'রে জানা যায়

যে কালই মৃত্যু হবে না এবং যা কাউকে জানাতে ইচ্ছে করে না তাই অনেক অবাঞ্ছিত লোকের হাতে পড়বে না ?"

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর আর এক জায়গায় (ঐ, পৃঃ ২৫৯) দেখি রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"ঐ ডায়েরি , সে আমার দ্বারা কোনো কালে লেখা হল না , emotion এর একটি গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয় ।"

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইয়ের প্রামাণিকতা বিতর্কের অতীত। শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাকে বলেছেন যে এই বইতে যা লেখা আছে, তার ষোল আনাই সম্পূর্ণ সত্য। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত উক্তি যে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে দেখি রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে ডায়ারি লেখা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না এবং তিনি কখনও ডায়ারি লেখেনও নি। এ কথা খুবই সত্য। কয়েকবার বিদেশে ভ্রমণের সময় তিনি অবশ্য "ডায়ারি" নামধেয় লেখা লিখেছেন, যেমন 'যুরোপ যাত্রীর ডায়াবি', 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' প্রভৃতি। কিন্তু এই লেখাগুলি আসলে ডায়ারিব ছদ্মবেশধারী প্রবন্ধ-সাহিত্য, ডায়ারিতে লেখকেব যে একান্ত ব্যক্তিগত কথা, ঘরোয়া অন্তরঙ্গ স্বর থাকে, তা এদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

অথচ সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকাব ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় (পৃঃ ৩৫১) "অভয়ঙ্কর" ছদ্মনামধারী জনৈক লেখক মন্তব্য কবেছেন, "আমাদের দেশে ডায়েরী-লেখক হিসাবে সর্বাগ্রে নাম কবতে হয় রবীন্দ্রনাথের।" আজকাল কোন কোন লেখক এই-রকমভাবে রবীন্দ্রনাথ যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই তাঁকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে সন্তুষ্ট থাকছেন না, তিনি যাতে হাত দেননি, তাতেও তাঁকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে ছাড়ছেন! এতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না, নিজেদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করা হয়। "অভয়ঙ্কর" বিনা দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', 'চিঠিপত্র', 'য়ুরোপের চিঠি' (?), 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপান-যাত্রী', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'পত্রধারা' (এই বইয়ের তিনটি খণ্ডের নাম করার পরে এর স্বতন্ত্রভাবে নাম উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' প্রভৃতি পত্রসঙ্কলনগ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথের "ডায়েরী-ধর্মী রচনা"-র অন্তর্ভুক্ত করে ছেড়েছেন! কিন্তু ডায়ারি আর চিঠি কি একই জিনিস? ডায়ারির

মধ্যে একটি মানুষের অন্তরের কথা প্রকাশ পায় কেবলমাত্র তার নিজের কাছে, আর চিঠিতে মানুষ তার অন্তরের কথা জানায় আর একজন মানুষকে; চিঠি দু'জন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সেতু রচনা করে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি ডায়ারির চেয়ে প্রবন্ধসাহিত্যেরই বেশী কাছাকাছি। অতএব রবীন্দ্রনাথের পত্রসঙ্কলনগ্রন্থ-গুলিকে কোনমতেই 'ডায়ারি' আখ্যায় চিহ্নিত করা যায় না।

[এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী রইলাম।]

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

উ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

ইংরেজী শব্দ

[এই নির্ঘণ্ট রচনায় আমার একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী—শ্রীমান বসন্তকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীমতী নবনীতা মজুমদার—আমার বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে আমি ঋণী রইলাম।]